চট্টগ্রামে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে মাওলানা হাফেজ আহমদ (র:)-এর অবদান

(Contribution of Maulana Hafez Ahmad (R) in spreading Arabic and Islamic Teachings in Chittagong)

(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ)



তত্ত্বাবধায়ক

ড. আ জ ম কুতুবুল ইসলাম নোমানী

অধ্যাপক

আরবী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

গবেষক

মুহাম্মদ বদরুদ্দীন সাদী

এম.ফিল গবেষক

আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

শিক্ষাবর্ষ: ২০১৮-২০১৯

রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ১১/২০১৮-২০১৯

ফেব্রুয়ারি ২০২৬ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের এম.ফিল গবেষক জনাব মুহাম্মদ বদরুদ্দীন সাদী কর্তৃক এম.ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত "চট্টগ্রামে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে মাওলানা হাফেজ আহমদ (র:)-এর অবদান" (Contribution of Maulana Hafez Ahmad (R) in spreading Arabic and Islamic Teachings in Chittagong) শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভ (থিসিস) টি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচনা করা হয়েছে। এটি একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানা মতে, গবেষকের উপস্থিাপিত অভিসন্দর্ভের (থিসিসের) সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়েয বা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার ডিগ্রি / ডিপ্লোমা লাভের জন্য কিংবা প্রকাশের জন্য উপস্থাপন করা হয়নি। আমি এ অভিসন্দর্ভ (থিসিস)টি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি এবং এটি আরবী বিষয়ে এম.ফিল ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিল করার জন্য চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করছি।

আরো প্রত্যায়ন করা যচ্ছে যে, গবেষকের অভিসন্দর্ভে (থিসিসে) কোনো প্রকার plagiarism (অন্যের লেখা নিজের বলে চালানো) নেই।

তত্ত্বাবধায়ক

ফেব্রুয়ারি-২০২৬ খ্রি.

09-02-26

ড. আ জ ম কুতুবুল ইসলাম নোমানী
অধ্যাপক
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিষয়ে এম.ফিল ডিগ্রি অর্জনের নিমিত্তে উপস্থাপিত "চট্টগ্রামে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে মাওলানা হাফেজ আহমদ (র:)-এর অবদান" (Contribution of Maulana Hafez Ahmad (R) in spreading Arabic and Islamic Teachings in Chittagong) শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভ (থিসিস)টি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষাক ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর ড. আ জ ম কুতুবুল ইসলাম নোমানী-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচনা করেছি। এটি আমার একক একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা অন্য কোনা উদ্দেশ্যে অভিসন্দর্ভ (থিসিস)টির সম্পূর্ণ বা এর অংশ বিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি এই মর্মে আরো অঙ্গীকার করছি যে, আমার দাখিলকৃত অভিসন্দর্ভে (থিসিসে) কোনো plagiarism (অন্যের লেখা আমার নিজের বলে চালানো) নেই।

(মুহাম্মদ বদরুদ্দীন সাদী)
এম. ফিল গবেষক
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৮-২০১৯
রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ১১/২০১৮-২০১৯

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على محمد اشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله وأصحابه أجمعين، اما بعد .

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তা'আলার যিনি সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা। অগণিত দরূদ ও সালাম বিশ্বনবী হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি যিনি আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব এবং বিশ্ব জাহানের করুণাকামী সর্বশেষ রাসূল ও সাহাবায়ে কিরাম (রা:) উপর।

আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভের শিরোনাম হলো "চট্টগ্রামে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে মাওলানা হাফেজ আহমদ (র:) এর অবদান" (Contribution of Maulana Hafez Ahmad (R.) in spreading Arabic and Islamic Teachings in Chittagong) আমি সর্বপ্রথম মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে হযরত শাহ মাওলানা হাফেজ আহমদ (র:) ওরফে শাহ সাহেব চুনতী-এর রফয়ে' দারাজাত কামনা করছি। যিনি চট্টগ্রামে 'আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে নিজেকে উৎসর্গ করে আমৃত্যু নিয়োজিত রেখেছেন।

"চট্টগ্রামে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে মাওলানা হাফেজ আহমদ (র:) এর অবদান" শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি প্রণয়েনে আমি বিশেষভাবে এ অভিসন্দর্ভের সম্মানিত তত্ত্বাবধায়ক আরবী বিভাগের সুযোগ্য শিক্ষক অধ্যাপক ড. আজম কুতুবুল ইসলাম নোমানী-এর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে বিভিন্ন সময় প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা, মূল্যবান উপদেশ ও তাঁর ব্যস্ততার মাঝেও তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন। তাঁর এই সহানুভূতি ও স্নেহঋণ শুকরিয়া আদায় করে কোনদিনই পরিশোধ করা যাবে না।

গভীর ভক্তি শ্রদ্ধা ও অন্তরের অন্তস্থল থেকে আন্তরিকতার সাথে কৃতজ্ঞতা ও মোবারকবাদ জানাই এই অভিসন্দর্ভের মহান বুযুর্গ শাহ সাহেব চুনতী (রহ:)-এর খাদেম ও আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতা হযরত আলহাজ্ব কাজী মাওলানা অধ্যক্ষ মুহাম্মদ নাছির উদ্দীন-এর প্রতি। আমি তাঁর দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করছি। আমার তত্ত্বাবধায়ক নির্বাচনসহ এম.ফিল প্রোগ্রামে ভর্তি

Dhaka University Institutional Repository

হওয়া এবং এই গবেষণাকর্ম সমাপ্ত করা তাঁর ঐকান্তিক ইচ্ছা, অনুপ্রেরণা, উৎসাহ-উদ্দীপনা ও প্রচেষ্টায় সম্ভব হয়েছে। তাঁর নিকট আমি আপদমস্তক ঋণী। যিনি না হলে আমার গবেষণাকর্ম কিছুতেই সম্পন্ন হতো না।

আমার গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করার জন্য উৎসাহ, উদ্দীপনাসহ সাহস জুগিয়েছেন এবং জায়নামাযে বসে দু'আ করেছেন, আমার শ্রদ্ধেয়া আম্মাজান আলহাজ্বা সোলতানা রাজিয়া ও বড় মামা জনাব মাহমুদুল হাসান।

আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই আমার স্নেহের হাফেজ মাওলানা মুছা তুরাইন ও মাওলানা আবু নোমান মুহাম্মদ হাফিজুল্লাহ-এর প্রতি। যাদের পরামর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমি গবেষণার জন্য হযরত শাহ সাহেব (র:)-এর জীবন ও কর্মকে নির্বাচন করেছিলাম।

আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান ড. যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক এর প্রতি যিনি তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের ব্যাপারে মূলবান পরামর্শ ও উৎসাহ প্রদান করেছেন। এছাড়াও আরবী বিভাগের মান্যবর শিক্ষকবৃন্দ, কর্মকর্তা-কর্মচারী সকলের প্রতি যাঁরা আমার এম.ফিল ডিগ্রি অর্জনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার অভিসন্দর্ভের মহান সাধক শাহ সাহেব চুনতী (র:)-এর চাচাত ভাই ও চুনতী সরকারি মহিলা কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ দীন মুহাম্মদ মানিক, শাহ সাহেব (র:)-এর খাদেম মুহাম্মদ জসিম উদ্দীন এবং শাহ সাহেব (র:)-এর ভক্তবৃন্দের মধ্যে আলহাজ্জ আবু তাহের ও মিয়া গোলাম কবির প্রমুখের প্রতি। তাঁরা আমাকে তথ্য সংগ্রহে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সম্মানিত অধ্যাপক ড. নুরুল ইসলাম ও অধ্যাপক ড. আ.ক.ম আব্দুল কাদের স্যারের প্রতি এবং চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদরাসার সম্মানিত অধ্যক্ষ মাওলানা ফারুক হুসাইন ও অধ্যাপক নুরুল আবছার স্যারের প্রতি। তাঁরা আমাকে নির্ভুল থিসিস তৈরিতে প্রুফ দেখাসহ প্রয়োজনীয় পরামর্শ, দিকনির্দেশনা ও খোঁজ-খবর রাখতেন। এছাড়াও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সাতকানিয়ার মাওলানা এনামুল হক, বন্ধুবর বাঁশখালী ডলমপীর আলীম মাদরাসার সম্মানিত শিক্ষক মাওলানা হুমায়ুন কবির নিজামী, সাতকানিয়া বাজালিয়া ফাযিল মাদরাসার সম্মানিত সহকারী

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যাপক মওলানা ফজলুল কাদের, চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদরাসার মুহাদ্দিস মাওলানা নিজাম উদ্দীন প্রমূখ। তারা আমাকে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সহযোগিতা করেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এর কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, চট্টগ্রাম বিভাগীয় ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরী বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান, চট্টগ্রাম দারুল উলুম কামিল মাদরাসা লাইব্রেরী, চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদরাসা লাইব্রেরী, চট্টগ্রাম পাবলিক লাইব্রেরী, বায়তুশ শরফ আর্দশ কামিল মাদরাসা লাইব্রেরী, শাহ আব্দুল জব্বার ফাউন্ডেশ লাইব্রেরি ইত্যাদি গ্রন্থাগারের পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

গবেষণাকর্মটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়-এর কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, চট্টগ্রাম বিভাগীয় ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরি, বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা লাইব্রেরি, চট্টগ্রাম দারুল ‘উলূম কামিল মাদরাসা লাইব্রেরি, চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদরসার লাইব্রেরি, চট্টগ্রাম পাবলিক লাইব্রেরি, বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল মাদরাসা লাইব্রেরি, শাহ আব্দুল জব্বার ফাউন্ডেশন লাইব্রেরিসহ বহু পরিচিতি-অপরিচিত গ্রন্থকারবৃন্দের গ্রন্থ থেকে সহায়তা গ্রহণ করেছি; তাদের প্রতি রইল আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি চট্টগ্রাম দারুল ‘উলূম কামিল মাদরাসা’র সহকারী অধ্যাপক ড. মাহবুবুর রহমান, চট্টগ্রাম বায়তুশ মরফ আদর্শ কামিল মাদরাসা’র সাবেক অধ্যক্ষ ড. সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আবু নোমান, বাঁশখালী পুইছড়ি কামিল মাদরাসা’র অধ্যক্ষ মাওলানা মুশাররফ হুসাইন, আধুনগর ইসলামিয়া কামিল মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা আবু মূছা মুহাম্মদ খালেদ জামীল ও সহকারী অধ্যাপক মাওলানা জুবাইর হোসাইন ছিদ্দিকী, পদুয়া আইনুল উলূম কামিল মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা আ.ন.ম নোমান, চট্টগ্রাম বাঁশখালীর আহমদুল ইসলাম চৌধুরী, চুনতী এলাকার মাওলানা আব্দুন নূর ছিদ্দিকী প্রমুখ বিভিন্ন গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও পত্র-পত্রিকা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন।

আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই আমার ভগ্নিপতি আলহাজ্ব শরিফ উল্লাহ, আমার স্নেহের ছোট ভাই তকিউদ্দীন সাজেদ ও সাদ উদ্দীন আনাসসহ আমার অত্যন্ত আদরের ছোট বোন উম্মুল খাইর হাওলা’কে। যারা আমার গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে সহযোগিতা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

আমি বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি কলিম উল্লাহ, আধুনগর ইসলামিয়া লাইব্রেরির মিশকাত, সাজিদ, আবদুল আজিজ, হৃদয় ও শফিক ভাইকে। যারা অত্যন্ত ধৈর্য্য ও নিষ্ঠার সাথে এই অভিসন্দর্ভটি কম্পোজ করতে আমাকে সহায়তা করেছেন।

নানাবিধ অন্তরায় ও প্রতিকূলতায় গবেষণাকর্ম চালিয়ে যেতে যাঁরা আমাকে অনুপ্রেরণা ও সাহস যুগিয়েছেন তাদেরকে জানাই আন্তরিক মুবারকবাদ। বিশেষ করে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি আমার সহধর্মিণী উম্মে সালমা জেসমিনের প্রতি। যার আন্তরিক সহযোগিতা ও উৎসাহ-উদ্দীপনা- প্রেরণায় আমার গবেষণাকর্মের গতিবেক সঞ্চার করেছে। এছাড়াও আন্তরিক ভালোবাসা ও দু'আ দিচ্ছি আমার কলিজার টুকরা সন্তান মুহাম্মদ ফখরুদ্দীন রাজী ও মুহাম্মদ ছদরনুদ্দীন হাদীকে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু দান করুন এবং দেশ ও জাতীর খাদেম হওয়ার তাওফীক দান করুন।

পরিশেষে আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা জানাই হে আল্লাহ! তুমি আমার এই গবেষণাকর্মটি কবুল কর। বিভিন্ন পর্যায়ে যারা আমাকে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমিন।

(মুহাম্মদ বদরুদ্দীন সাদী)
এম.ফিল গবেষক
রেজি. : ১১/২০১৮-২০১৯
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৮-২০১৯
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

আরবি বর্ণমালা সমূহের বাংলা প্রতি বর্ণায়ন

বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণ	প্রতিবর্ণ
ا	অ	ز	ঝ	ق	ক/ক্ব
ب	ব	س	স	ك	ক
ت	ত	ش	শ	ل	ল
ث	ছ	ص	স	م	ম
ج	জ	ض	দ/দ্ব	ن	ন
ح	হ	ط	ত/ত্ব	و	ও/ওয়া/ব
خ	খ	ظ	য	ة، ه	হ
د	দ	ع	অ	ء	অ
ذ	য	غ	গ	ي	য়/ইয়া
ر	র	ف	ফ		

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংকেত

আ.	:	আলাইহিস সালাম
খ্রি.	:	খ্রিস্টাব্দ
জ.	:	জন্ম
ড.	:	ডক্টর
তা. বি.	:	তারিখবিহীন
দ্র.	:	দ্রষ্টব্য
পৃ.	:	পৃষ্ঠা
মৃ.	:	মৃত্যু
রা.	:	রাদিআল্লাহু আনহু / রাদিআল্লাহু আনহুম
সম্পা.	:	সম্পাদিত, সম্পাদনা
সং.	:	সংস্করণ
সা.	:	সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
হি	:	হিজরী সন
ed. /eds.	:	edited by, edition, editor, editions
p.	:	page
pp.	:	pages
pub.	:	published, publication
vol.	:	volume

Dhaka University Institutional Repository

সংকেত পরিচয় ও শব্দসংক্ষেপ

(আ.)	:	আলাইহিস সালাম
অনূ.	:	অনূদিত
খ্রি.	:	খ্রিস্টাব্দ
(সা.)	:	সাল্লাল্লাহু ‘আলায়হি ওয়াসাল্লাম
ইফাবা	:	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
ড.	:	ডক্টর
ঢা বি	:	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
তা. বি.	:	তারিখবিহীন
দ্র.	:	দ্রষ্টব্য
পৃ.	:	পৃষ্ঠা
প্র.	:	প্রকাশিত/প্রকাশকাল
খ.	:	খণ্ড
প্রাগুক্ত	:	পূর্বোক্ত/পূর্বের উক্তি
ব.	:	বঙ্গাব্দ
বাং	:	বাংলা
বা এ	:	বাংলা একাডেমি
বা ই সে	:	বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
মৃ.	:	মৃত্যু
(র.)	:	রাহমাতুল্লাহি আলায়হি
(রা.)	:	রাদিয়াল্লাহু আনহু
লি.	:	লিমিটেড
হি.	:	হিজরী
সং	:	সংস্করণ
সম্পা.	:	সম্পাদিত

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রত্যয়নপত্র	ii
ঘোষণাপত্র	iii
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	iv
প্রতিবর্ণায়ন	viii
বাংলা শব্দসংক্ষেপ	ix
সূচিপত্র	x
ভূমিকা	xiii

প্রথম অধ্যায় : চট্টগ্রাম ও চুনতীর ভৌগোলিক পরিচয় (১-১৯)

প্রথম পরিচ্ছেদ	: চট্টগ্রামের ভৌগোলিক অবস্থান	২
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	: চট্টগ্রাম পরিচিতি	৪
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	: চুনতী অঞ্চলের পরিচিতি	৬
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	: চট্টগ্রামে ইসলামের আগমন	১২

দ্বিতীয় অধ্যায় : চট্টগ্রামে ‘আরবী ভাষা ও সাহিত্যচর্চা (২০-৮৪)

প্রথম পরিচ্ছেদ	: বাংলাদেশে ‘আরবী ভাষা ও সাহিত্যচর্চার সূচনা	২১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	: ‘আরবী ভাষার চর্চা ও বিকাশ	৩০
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	: ‘আরবী চর্চায় ‘আলেমসমাজ	৩৩
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	: বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক আরবীচর্চা	৩৫
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	: মসজিদ ও মাদরাসা কেন্দ্রিক ‘আরবীচর্চা	৪২

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায় : ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা রাসূলের যুগ থেকে বর্তমান (৮৫-১৪৪)

প্রথম পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সময় ইসলামী শিক্ষা ৮৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : সুলতানী আমলে ইসলামী শিক্ষা ৯৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে ইসলামী শিক্ষা ১০৯

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা ১১৭

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়-এর ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সিলেবাস ১২৪

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : বি.এ ও এম.এ শ্রেণির ইসলামী শিক্ষা উন্নয়নে সমস্যা ও সম্ভাবনা ১৩৭

চতুর্থ অধ্যায় : মাওলানা হাফেজ আহমদ (রঃ) এর জীবন পরিক্রমা (১৪৫-১৮৪)

প্রথম পরিচ্ছেদ : জন্ম ও বংশ পরিচয় ১৪৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : শৈশবকাল ও শিক্ষাজীবন ১৫০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : কর্মজীবন বার্মা (মিয়ানমার) সফর ও আধ্যাত্মিকচর্চা ১৫২

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : যোগ্য ব্যক্তিত্ব তৈরিতে তাঁর অবদান ১৭১

পঞ্চম অধ্যায় : শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিকাশে শাহ মাওলানা হাফেজ আহমদ (রঃ) (১৮৫-২২৩)

প্রথম পরিচ্ছেদ : শিক্ষা ও নৈতিকতা প্রসারে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপন মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা ১৮৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ওয়াজ নছিহত ও ধর্মীয় মাহফিল চালু রাখা ২০৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : মুসলমানদের ঐক্যের প্রয়াস ২১৫

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : নৈতিক আন্দোলনে সমর্থন প্রদান ২১৮

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : আলেম-ওলামার পৃষ্ঠপোষকতা ২২১

উপসংহার ২২৪

গ্রন্থপঞ্জি ২২৮

পরিশিষ্ট ২৩৩

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

বাংলাদেশের ইসলামী শিক্ষা ও বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্য বহু শতাব্দীব্যাপী এক সুদীর্ঘ ইতিহাসের ধারক। এই ধারাবাহিকতার গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক কেন্দ্র হিসেবে চট্টগ্রাম অঞ্চল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগরের সংযোগস্থলে অবস্থিত এই জনপদ প্রাচীনকাল থেকেই 'আরব বণিক, দা'ঈ ও 'আলেমদের মাধ্যমে ইসলামের আলো গ্রহণ করে। ফলে চট্টগ্রাম কেবল বাণিজ্যিক নয়; বরং ধর্মীয় ও শিক্ষাগত দিক থেকেও একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে বিকশিত হয়। এ অঞ্চলে 'আরবী ভাষা ও ইসলামী শিক্ষারচর্চা ধীরে ধীরে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে, যার পেছনে অসংখ্য 'আলেম, পীর-মাশায়েখ ও ধর্মীয় চিন্তাবিদের অবদান রয়েছে। তন্মধ্যে মাওলানা হাফেজ আহমদ (র:) চট্টগ্রামে 'আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

উপমহাদেশে মুসলিম সমাজের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের সাথে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থাও নানাবিধ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে। বিশেষত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে মুসলমানদের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব, ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি অবহেলা এবং সামাজিক অবক্ষয় মুসলিম সমাজে এক গভীর শূন্যতা সৃষ্টি করে। এই সঙ্কটময় সময়ে যেসকল 'আলেম ইসলামী শিক্ষার পুনর্জাগরণে আত্মনিয়োগ করেন, মাওলানা হাফেজ আহমদ (র:) তাঁদের অন্যতম। তিনি চট্টগ্রাম অঞ্চলে 'আরবী ও ইসলামী শিক্ষার পুনর্গঠন, প্রসার এবং মানোন্নয়নে আজীবন কাজ করে গেছেন।

মাওলানা হাফেজ আহমদ (র:) ছিলেন একাধারে একজন 'আলেম, আধ্যাত্মিক সাধক ও সমাজসংস্কারক। তাঁর শিক্ষাজীবন, দাওয়াতি কার্যক্রম এবং প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ তাঁকে সমকালীন 'আলেম সমাজের মধ্যে স্বতন্ত্র মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে, 'আরবী ভাষা ইসলামী জ্ঞানের মূল চাবিকাঠি। কুর'আন ও হাদীসের যথার্থ অনুধাবনের জন্য 'আরবী ভাষায় দক্ষতা অপরিহার্য–এই বিশ্বাস থেকেই তিনি তাঁর শিক্ষাদর্শন নির্মাণ করেন। ফলে তাঁর শিক্ষা কার্যক্রমে 'আরবী ভাষা, সাহিত্য ও ব্যাকরণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

চট্টগ্রামে ‘আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে মাওলানা হাফেজ আহমদ (র:)-এর অবদান কেবল পাঠদান বা ধর্মীয় বক্তৃতার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি মক্তব, মাদরাসা, দ্বীনি শিক্ষাকেন্দ্র ও বিষয়ভিত্তিক মাহফিল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি সুসংগঠিত শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলেন। এসব প্রতিষ্ঠানে কুর’আন, হাদীস, তাফসীর, ফিক্হ, উসুলুল ফিক্হ, ‘আকাইদ ও ‘আরবী ভাষার মৌলিক ও উচ্চতর শাস্ত্রসমূহ পাঠদানের ব্যবস্থা ছিল। একই সঙ্গে শিক্ষার্থীদের নৈতিকতা, তাকওয়া ও সামাজিক দায়বদ্ধতা গড়ে তোলার দিকেও তিনি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন। এর ফলে তাঁর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো কেবল ‘আলেম তৈরির কারখানা নয়; বরং আদর্শ মানুষ গঠনের কেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

মাওলানা হাফেজ আহমদ (র:)-এর শিক্ষা আন্দোলনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সাধারণ মানুষের সঙ্গে ইসলামী শিক্ষার সংযোগ স্থাপন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, দ্বীনি শিক্ষা কেবল ‘আলেম সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে সমাজের সার্বিক সংস্কার সম্ভব নয়। তাই তিনি গ্রামীণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে মক্তব শিক্ষা বিস্তারে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় অসংখ্য শিশু কুর’আন শিক্ষা লাভের সুযোগ পায় এবং ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়। এই উদ্যোগ চট্টগ্রামের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলেছে।

চট্টগ্রামের ইসলামী শিক্ষা আন্দোলনে মাওলানা হাফেজ আহমদ (র:)-এর অবদান প্রজন্মান্তরে বিস্তৃত হয়েছে। তাঁর প্রত্যক্ষ ছাত্র ও অনুসারীরা পরবর্তীকালে বিভিন্ন অঞ্চলে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা এবং দাওয়াতী কার্যক্রমে আত্মনিয়োগ করেন। এভাবে তাঁর চিন্তা ও কর্ম একটি ধারাবাহিক শিক্ষাধারায় রূপ নেয়, যা চট্টগ্রামের বাইরেও বিস্তৃত প্রভাব সৃষ্টি করে। এই দিক থেকে তাঁকে একটি শিক্ষা আন্দোলনের রূপকার হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের ইসলামী শিক্ষার ইতিহাস নিয়ে গবেষণা ক্রমেই গুরুত্ব পাচ্ছে। তবে আঞ্চলিক পর্যায়ে ‘আলেমদের অবদান নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা এখনো তুলনামূলকভাবে সীমিত। মাওলানা হাফেজ আহমদ (র:)-এর মতো একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অবদান নিয়ে স্বতন্ত্র ও বিশ্লেষণধর্মী গবেষণা বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। তাঁর জীবন, কর্ম ও শিক্ষাদর্শন বিশ্লেষণের মাধ্যমে চট্টগ্রামে ‘আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র উপস্থাপন করা সম্ভব হবে।

Dhaka University Institutional Repository

এই এম.ফিল গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো চট্টগ্রামে 'আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে মাওলানা হাফেজ আহমদ (র:)-এর ভূমিকা ও অবদানকে ঐতিহাসিক, বিশ্লেষণধর্মী ও সমালোচনামূলক দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করা। এ গবেষণায় তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ, পাঠ্যক্রম, শিক্ষাদর্শন এবং সামাজিক প্রভাব বিশ্লেষণ করা হবে। পাশাপাশি তাঁর অবদানের শক্তি ও সীমাবদ্ধতাও নিরপেক্ষভাবে পর্যালোচনার চেষ্টা করা হবে, যা একটি একাডেমিক গবেষণার জন্য অপরিহার্য।

আমি বাংলাভাষী পাঠকের জন্য আমার অভিসন্দর্ভটিতে ভূমিকা ও গ্রন্থপঞ্জি ছাড়া ০৫টি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছি। প্রত্যেকটি অধ্যায়ের অধীনে একাধিক পরিচ্ছেদ যথাযথভাবে যুক্ত করেছি। উপসংহার ও তথ্যনির্দেশিকা প্রদান পূর্বক এ অভিসন্দর্ভটির সমাপ্তি টানা হয়েছে।

এই গবেষণাকর্ম প্রণয়নে প্রাথমিক ও গৌণ উৎসের যথাযথ ব্যবহার, তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা এবং বিশ্লেষণের গভীরতা নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। আশা করা যায়, এই গবেষণা চট্টগ্রামের 'আরবী ও ইসলামী শিক্ষা আন্দোলনের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হবে এবং ভবিষ্যৎ গবেষকদের জন্য একটি মূল্যবান একাডেমিক দলিল হিসেবে কাজ করবে। আমার জ্ঞান ও যোগ্যতার সীমাবদ্ধতা, স্বভাবজাত ভুলত্রুটি এবং গবেষণার নিয়ম-কানুন সম্পর্কে অপর্যাপ্ত জ্ঞান সত্ত্বেও এ ক্ষুদ্র প্রয়াসের দ্বারা পাঠকগণ সামান্যতম উপকৃত হলে নিজের শ্রম সফল ও সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো। মহান আল্লাহ এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন।

মুহাম্মাদ বদরুদ্দীন সাদী

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়
চট্টগ্রাম ও চুনতীর ভৌগোলিক পরিচয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়
চট্টগ্রাম ও চুনতীর ভৌগোলিক পরিচয়

প্রথম পরিচ্ছেদ : চট্টগ্রামের ভৌগোলিক অবস্থান

প্রাচীন ও বর্তমানকালের চট্টগ্রামের ভৌগোলিক সিমানা এক নয়। এই সীমা সময়ের ব্যবধানে পরিবর্তন হয়েছে। সীমানা: উত্তরে ফেনী নদী, দক্ষিণে নাফ নদী ও বঙ্গোপসাগর পূর্ব পার্বত্য চট্টগ্রাম ও পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর। এই ২৪৯৮ বর্গমাইল ছিল পার্বত্য চটগ্রাম। ইসলামের আগমনের সময় চট্টগ্রামের ভৌগলিক সীমানা এরকম ছিল না। তখন পুরো দশম শতাব্দি কক্সবাজার আরকান রাজার অধীনে ছিল। ড.আব্দুল করিম কক্সবাজারের ইতিহাস গ্রন্থে লিখেন, ৯৮২ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম আরকানের রাজ্যের অধীনে ছিল। ৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে আরকানের রাজা সুলতইঙ্গচন্দ্র চট্টগ্রাম জয় করে বিজয় স্তম্ভ স্থাপন করেন। অতএব বলা যায়, কক্সবাজারসহ সমগ্র বৃহত্তম চট্টগ্রাম আরকান রাজ্যের অধীনে ছিল।[১] ড. আহমদ শরীফ চট্টগ্রাম ও আরকানকে এক ও অভিন্ন বলেছেন।[২] খ্রিস্টীয় ৪/৫ শতাব্দী পযর্ন্ত চট্টগ্রাম ও আরকান এক অঞ্চল ছিল। আরব বণিকদের চট্টগ্রাম আগমন কালে বর্তমান চট্টগ্রাম অঞ্চলটি গাঙ্গের বদ্বীপ ও গঙ্গার মোহনার নিকটবর্তী ছিল।[৩] ইসলাম প্রচারকালে চট্টগ্রাম বহুবিস্তৃত ছিল এবং চট্টগ্রাম ও সোনারগাও এর মধ্যে সংক্ষিপ্ত নদী পথ ছিল।[৪] ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামকে পূর্ব পাকিস্তানের একটি বিভাগে পরিণত করা হয়। ১৯৯৫ খ্রি. আগস্টের ০১ তারিখ পর্যন্ত সিলেট চট্টগ্রাম বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। চট্টগ্রাম বিভাগের জেলাগুলু হল, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, বান্দরবন, খাগড়াছড়ি, ফেনী, লক্ষীপুর, নোয়াখালী, কুমিল্লা, চাঁদপুর ও ব্রাহ্মাণবাড়িয়া। আয়তন ৩৩৭৭১.১৩ বর্গ কি: মি:। চট্টগ্রাম বিভাগের উত্তরে ঢাকা বিভাগ এবং ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ও আরকান (মিয়ানমার)পূর্বে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, মিয়ানমার ও চিন রাজ্য, পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর, বরিশাল ও ঢাকা বিভাগ অবস্থিত। ১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রাম জেলায় সৃষ্টি হয়।[৫] চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাও। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে পার্বত্য অঞ্চল নিয়ে পৃথক পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা গঠন করা হয়। পরবর্তিতে কক্সবাজার কে পৃথক জেলা করা হয়। তবে বর্তমান চট্টগ্রাম জেলার

---

১. ড.আব্দুল করিম, *কক্সবাজারের ইতিহাস* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, মে ১৯৯৪), পৃ. ১২
২. ড. আহমদ শরীফ, *চট্টগ্রামের ইতিহাস*, আদিযুগ, পৃ. ১৬২
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২
৪. অধ্যাপক মুহাম্মদ খালেদ সম্পাদিত, *হাজার বছরের চট্টগ্রাম*, পৃ. ২৫
৫. *বাংলা পিডিয়া*, (ঢাকা: বাংলা এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩ খ্রি.), ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৭২

Dhaka University Institutional Repository

সীমানা হলো উত্তরে খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি পাবর্ত্য জেলা এবং ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, দক্ষিণে কক্সবাজার জেলা ও বঙ্গোপসাগর, পূর্বে বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলা, পশ্চিমে ফেনি জেলা ও বঙ্গোপসাগর। বিশ্ব মানচিত্রে চট্টগ্রামের অবস্থান বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্ত সীমার ২০০-৩৫ থেকে ২২০-৫৯ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯১০-২৭ থেকে ৯২০-১১ দ্রাঘিমাংশ বরাবর, এর ভূ-প্রকৃতি হচ্ছে ১.২ উচুঁ পাহাড়ী এলাকা, ১.১ নিচু পাহাড়ী এলাকা, ৩.১২ উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় ডালু সমতল, ৩.৬ বালুকা সৈকত, ৩.৫৩ জোয়ার প্লাবিত মাতা মহুরী এলাকা, ৩.৫২ জোয়ার প্লাবিত উপকুলীয় সমতল।[১] বার্ষিক সর্বোচ্চে তাপমাত্রা ৩৩.৮০ সে. এবং সর্বনিম্ন ১৪.৫০ সে.বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৩১৯৪ মি.মি.।[২] ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের লোক গণনার জরিপে আয়তন ২০৩৯ বর্গমাইল বা ৫২৮২.৯৮ বর্গ কিলোমিটার বলা হয়েছে। মোট আয়তনের ৫৬১.৯৮ বর্গ কিলোমিটার নদী এলাকা এবং ১২,৪৩,১৪ বর্গ কি. মি. বনাঞ্চল। এ গণনানুসারে চট্টগ্রাম জেলার মোট লোকসংখ্যা ৫২,৯৬, ১২৭। এর মধ্যে পুরুষ হল ২৮, ১৯,২১৫ জন এবং ২৪,৭৬, ৯১২ জন মহিলা।[৩]

১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম জেলার উত্তর সীমান্ত সংলগ্ন নোয়াখালী জেলার ছাগলনাইয়া গ্রামে ও পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙামাটিকে অবস্থিত হয়েছে প্রস্তর যুগে কাষ্টের তৈরি হাতিয়ার যথাক্রমে একখানা হাতকুড়াল ও একটি বাটালি। ফলে তাতে চট্টগ্রাম ভূখণ্ডের প্রাচীনত্বের পরিধির প্রমাণ পাওয়া যায়। মহাভারতে বর্ণিত কিতাব রাজ্য গ্রীক ভৌগলিকদের বর্ণনায় কিরাদিয় রাজ্যের অর্ন্তগত চট্টগ্রাম বলে মনে করেন পণ্ডিত ম্যাক ক্রিডিল ও পাজিটার সাহেব। প্রাচিন গ্রীক ও মিসরীয় ভৌগলিকদের বর্ণনায় চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানের কিছু কিছু উল্লেখ পাওয়া যায়। ল্যাসেনের পেন্ঠাঠোলিস চট্টগ্রামেরই ক্লাসিক্যাল নাম।

---

১. অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ, *হাজার বছরের চট্টগ্রাম* (প্রকাশক, এম. এ খালেদ, সম্পাদক দৈনিক আজাদী, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ২৫

২. *বাংলা পিডিয়া*, (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, প্রকাশকাল: মার্চ ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ২৭২

৩. হেলাল উদ্দীন মোহাম্মদ নোমান, *সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এর চট্টগ্রাম সফর* (প্রকাশক: মোহাম্মদ শফিউল আলম, প্রকাশকাল, সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ ৭ ও ৮

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : চট্টগ্রাম পরিচিতি

চট্টগ্রাম ছিল আরাকানী অধিকারের একটি দুর্গ। ইতিহাসের পাতায় চাটগাঁ ও চর-চাটগাঁ দুটি নামই পাওয়া যায়। মোগলদের 'আন্দরকিল্লা'ই ছিল মূল চাটগাঁ দুর্গ আর নদীর দক্ষিণ তীরের কেল্লাটি ছিল চর-চাটগাঁ দুর্গ। আরাকান থেকে উত্তরে ভূভাগ ফেনী নদী পর্যন্ত চাটগাঁ'র অধীনে ছিল। ২৬ জানুয়ারি, ১৬৬৬খ্রি. মোগলরা তা অধিকার করে নেয়। তারা প্রথম থেকেই এ অঞ্চলকে একটি থানা (ইসলামাবাদ থানা নামে) মর্যাদা দিয়ে রাখেন। পরবর্তীতে জাহাঙ্গীরনগরের অধীনে হলেও থানা ইসলামাবাদ নামে একটি পৃথক সরকার বা প্রদেশ হিসেবে গড়ে উঠে।[১] এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক আহমদ শরীফ তাঁর রচিত "চট্টগ্রামের ইতিহাস" (আদি যুগ) শীর্ষক একটি গবেষণামূলক রচনা থেকে উদ্ধৃত করা হলো–

> "আমরা দেখেছি, পর্বত ও সাগর বেষ্টিত চট্টগ্রাম একটি প্রাচীন ভূ-খণ্ড। এর সাথে আরাকানের সম্পর্কও সুপ্রাচীন। প্রকৃতপক্ষে আরাকান ও চট্টগ্রাম একই ভূ-খণ্ড। মধ্যে কেবল পর্বতমালার ব্যবধান।"[২]

নবাব মীর কাসিম ১৭৬০খ্রি. ১৫ অক্টোবরের যে সানন্দ দ্বারা ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীকে চট্টগ্রাম সমর্পণ করে তাতে চট্টগ্রামের নামটি উল্লেখ ছিল তবে তা ছিল থানা ইসলামাবাদ বা চট্টগ্রাম হিসেবে। ১৭৭২খ্রি. এপ্রিল ওয়ারেণ হেস্টিংস বাঙ্গালার গভর্নর হয়ে রাজস্ব সংগ্রহের জন্য জেলায় জেলায় ইংরেজ কালেক্টর নিযুক্ত করেন। সেসূত্রে ইসলামাবাদ বা চট্টগ্রামের শাসক একাধারে চীফ ও কালেক্টর গণ্য হতে থাকেন। ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম দিকের কাগজপত্রে ইসলামাবাদ বা চট্টগ্রামকে দেশ বা প্রদেশ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে রাজধানীর নাম বারংবারই ইসলামাবাদ বলা হয়েছে।[৩] বাংলাদেশে চট্টগ্রাম দিয়েই সর্বগ্রথম ইসলামের আগমন ঘটে। এ কারণে চট্টগ্রামকে ইসলামের প্রবেশদ্বার বলা হয়। সেই সুবাদে চট্টগ্রামের প্রাচীন নাম ইসলামাবাদ। এছাড়াও বারো আউলিয়ার দেশও বলা হয়।[৪]

---

১. মাহবুব-উল্ আলম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস* (চট্টগ্রাম: নয়ালোক প্রকাশনী, কাজীর ডেউরী সেকেন্ড লাইন, ১৯৬৬ খ্রি.), ভূমিকা, পৃ. ০৬

২. অধ্যাপক আহমদ শরীফ, *চট্টগ্রামের ইতিহাস (আদি যুগ)*' ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৃ. ১৬২

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ০৭

৪. ঐতিহাসিকদের মতে, আরব, ইরাক ও ইরান বিভিন্ন দেশ থেকে ধর্ম প্রচারের জন্য সুফি-সাধকরা বাংলার জমিনে আগমন করতেন। তাদের সমগ্র জীবনের সাধনা ও ধ্যানজ্ঞান ছিল ইসলামের প্রচার। তারা সারাদিন গ্রামে গ্রামে দ্বীনের প্রচার করতেন। রাতে এসে সে স্থানে একত্রে বসবাস করতেন। তাদের সাধনা, ত্যাগের বিনিময়েই চট্টগ্রামের গ্রামগঞ্জের মানুষ ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় নেয়। তারা এই স্থানেই আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগি ও আধ্যাত্মিক সাধনায় মগ্ন থাকতেন। ফলে অতি প্রাচীনকাল থেকেই এ জায়গাটি বারো আউলিয়ার মাজার, দরগা বা আস্তানা হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছে। দ্র. ড. গোলাম সাকলাইন, *বাংলাদেশের সূফি সাধক* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬খ্রি.), পৃ. ১২৯

চট্টগ্রামস্থ কোম্পানী সরকার ১৭৬১খ্রি. মার্চ মাসের ত্রিপুরা অধিকার করেন। ১৭৮৯খ্রি. ১৭ ডিসেম্বর ত্রিপুরা পূরাদস্তর পৃথক জেলা হিসেবে গঠিত হয়। এর পূর্বে ত্রিপুরা চট্টগ্রাম থেকেই শাসিত হতো। ১৮২২খ্রি. ভুলুয়াকে (লক্ষীপুরের চীফগিরির অবসান করে) নোয়াখালী জেলা হিসেবে গঠন করা হয়। সন্দ্বীপ ও হাতিয়া এপর্যন্ত চট্টগ্রামের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এগুলোকে এখন নোয়াখালীর সাথে জুড়ে দেয়া হলো। ১৮৬০খ্রি. চিটাগাং হিল ট্রাক্টস্ একটা পৃথক জেলা হিসেবে গঠিত হয়। ১৮৬৬খ্রি. ১লা মে চট্টগ্রামের কালেক্টর এর সুপারিন্টেন্ডেন্টকে রাজস্ব আদায়ের ভার বুঝিয়ে দেন। এর পূর্বে এ এলাকাগুলো চট্টগ্রামের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[১]

চট্টগ্রামের সীমানা

চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে 'আরবদের এ দেশের সাথে যোগাযোগ একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়। 'আরব ও বিভিন্ন জাতির বাণিজ্যতরী ও নৌজানসমূহ বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়েই চলাচল করত এবং চট্টগ্রাম বন্দর হয়েই সুদূর চীন পর্যন্ত যাতায়াত করত।

উত্তরে ফেনী নদী, দক্ষিণে আরাকান সীমানার নাফ নদী এবং বঙ্গোপসাগর, পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের গিরিরাজি এবং পশ্চিমে বঙ্গ সমুদ্র–এই চতুঃসীমানার মধ্যবর্তী ২৪৯৮ বর্গ মাইল পরিমিত ভূ-খণ্ডই আমাদের ইসলামাবাদ।[২] তবে আধুনিক চট্টগ্রাম ও প্রচীনকালের সেই বৃহত্তর চট্টগ্রামের ভৌগোলিক সীমানা বিচার বিশ্লেষণ করলে বুঝা যাবে যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে যে বৃহত্তর চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচারিত হয়েছিল তার অবস্থান এবং আজকের চট্টগ্রামের অবস্থান এক নয়। বিষয়টি বুঝার সুবিধার্তে উপরিউক্তি সীমানার আলোচনা করা হলো। বৃহত্তর চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচার সম্পর্কিত মৌলিক উপাদান ও তথ্যাবলীর মধ্যে সর্বাগ্রে যাঁদের কথা উল্লেখ করতে হয় তাঁরা হচ্ছেন 'আরব নাবিক-বণিক, পর্যটক, ভূগোলবিদ এবং ঐতিহাসিকবৃন্দ। তাঁরা যেসব বন্দরনগরী, সমুদ্র পথ এবং বিভিন্ন স্থানের ভৌগোরিক অবস্থানের কথা বর্ণনা করেছেন, যেসকল জনবসতি, লোকাচার, জীবনধারা, আরবদের যাতায়াত-অবস্থান, বাণির্জ-উপকরণ, দ্রব্য-সামগ্রী, পশু-পাখী, জীব-জানোয়ার, রীতিনীতি, রাজন্যবর্গ প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এছাড়াও প্রাচীন মানচিত্র, গেজেটিয়ার, দলীল-দস্তাবেজ ইত্যাদি। এগুলো ছিল মুসলিম আমলে ইতিহাসের প্রধান উপাদান।[৩] চট্টগ্রামে তথা বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে আরবদের এ দেশের সাথে যোগাযোগ একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়। আরব ও বিভিন্ন জাতির বাণিজ্যতরী ও নৌযানসমূহ বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়েই চলাচল করত এবং চট্টগ্রাম বন্দর হয়েই সুদূর চীন পর্যন্ত যাতায়াত করত।

---

১. মাহবুব-উল্ আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৭

২. আবদুল করীম, *ইসলামাবাদ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৪খ্রি.), পৃ. ০৩

৩. এ.কে.এম. মহিউদ্দিন, *চট্টগ্রামে ইসলাম* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬খ্রি.), পৃ. ০৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : চুনতী[১] অঞ্চলের পরিচিতি

চুনতী বা চুনতী ইউনিয়ন লোহাগাড়া উপজেলায় অবস্থিত, চট্টগ্রাম শহর থেকে প্রায় ৭০-৭৪ কিমি দক্ষিণে, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার জাতীয় মহাসড়কের পাশে। এটি কক্সবাজার জেলার সীমার কাছাকাছি একটি ইউনিয়ন (গ্রামসমষ্টি)। চুনতী ইউনিয়নের মোট আয়তন প্রায় ৬১.২২ বর্গকিমি এবং এগারো হাজারেরও বেশি লোক এখানে বসবাস করে।[২]

প্রাকৃতিক ঐতিহ্য – চুনতী বন্যপ্রাণী শূন্যাঞ্চল এলাকাটিকে সবচেয়ে বেশি পরিচিত করেছে চুনতী বন্যপ্রাণী শূন্যাঞ্চল (Chunati Wildlife Sanctuary), যা বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ সংরক্ষিত বনাঞ্চল।

 প্রতিষ্ঠা: ১৯৮৬ সালে সরকারী গেজেট নোটিশ মাধ্যমে এটি ঘোষিত হয়।

 আয়তন: প্রায় ৭,৭৬৪ হেক্টর, যেখানে গজরান (Garjan) বন ছিল মূল বুনিয়াদি বনভূমি।

 উদ্দেশ্য: বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, বিশেষত হাতির প্রাকৃতিক পথ ও পরিবেশ রক্ষার জন্য।

 বিশেষত্ব: এখানে হাতি, হরিণ, বুনো শূকর, মাছশোড়শসহ বহু জীবজন্তু ও প্রজাতি পাওয়া যায়।

শূন্যাঞ্চলটি বন বিভাগের আওতায় এবং সময়ের সাথে সাথে বন পুনরুদ্ধার ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলছে।[৩]

মানবিক ও সামাজিক ঐতিহ্য

চুনতী ইউনিয়ন ও গ্রামবাসীর জীবনযাত্রা বহু প্রজন্ম ধরে জায়গার প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত। অঞ্চলে কিছু ঐতিহাসিক মাদ্রাসা, দরগা ও স্থানীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে যা গ্রামের সামাজিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যদিও লিখিত প্রাচীন ইতিহাস কম পাওয়া যায়, স্থানীয়ভাবে বহু ধর্মীয় ও সামাজিক মর্যাদাপূর্ণ অনুষ্ঠান দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে।

---

১. চুনতী নামকরণের সম্ভাব্য কারণসমূহ, একসময় এই এলাকায় চুনাপাথর পাওয়া যেত। পাহাড়ি অঞ্চলে চুন পুড়িয়ে চুন তৈরি করা হতো। সেই "চুন" উৎপাদনের এলাকা হিসেবেই জায়গাটির নাম হয় চুনতী। চট্টগ্রামের অনেক স্থানের নামই এভাবে পেশা বা প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর ভিত্তি করে রাখা হয়েছে। অথবা পাহাড়ি/আরাকানি ভাষার প্রভাব: চুনতী এলাকা আরাকান (বর্তমান রাখাইন রাজ্য) সীমান্তসংলগ্ন হওয়ায়–স্থানীয় পাহাড়ি বা আরাকানি ভাষায়। "চুনতী" বা কাছাকাছি উচ্চারণের কোনো শব্দ থেকে নামটি আসতে পারে। এ অঞ্চলে বহু জায়গার নামেই আরাকানি ও পাহাড়ি ভাষার প্রভাব দেখা যায়।
এছাড়াও ব্রিটিশ শাসনামলে (১৮-১৯শ শতক): চুনতীকে রিজার্ভ ফরেস্ট হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। গজারি, চাপালিশ, শালসহ বড় বড় গাছ কাটা হতো। চুন ও কাঠ সরবরাহের জন্য এই এলাকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই সময়েই "চুন" শব্দটি জায়গার নামের সাথে স্থায়ীভাবে যুক্ত হয়ে যায় বলে ইতিহাসবিদরা মনে করেন।অথবা, ১৯৮৬ খ্রি. সরকারিভাবে Chunati Wildlife Sanctuar ঘোষণা অনুযায়ী নাম রাখা হয় এলাকার ঐতিহাসিক নাম অনুসারেই–চুনতী।

২. *Banglapedia: National Encyclopedia of Bangladesh*, s.v. "Chunati Union," Asiatic Society of Bangladesh, 2012

৩. প্রাগুক্ত।

উদাহরণস্বরূপ: চুনতীর ঐতিহাসিক সীরাতুন্নবী মাহফিল ও ধর্মীয় সমাবেশ বা debat-এর মতো সামাজিক কর্মকাণ্ড এলাকার ঐতিহ্যের অংশ। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো– শাহ্ সাহেব (র:) চুনতীর দরবারে ১৯ দিন ব্যাপী জিয়াফতসহ ইসলামী বিষয়ভিত্তিক সীরাতুন্নবী (স.) মাহফিল প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে অদ্যাবধী চলে আসছে। এটাই শাহ সাহেব (র:) এর মূল প্রতিষ্ঠান, যা আজো ইসলামী শিক্ষা ও প্রচার প্রসার কাজ করে আসছে।

চুনতী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য

চুনতী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য চট্টগ্রাম জেলার লোহাগড়া ও বাঁশখালি উপজেলা এবং কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলায় অবস্থিত। এর আয়তন ৭,৭৬৪ হেক্টর। এটি প্রাকৃতিক ভাবেই গর্জন গাছ প্রধান এলাকা। পূর্বে এ অঞ্চলে ঘন গর্জন বন থাকলেও বর্তমানে অল্প কিছু গর্জন গাছ অতীতের সাক্ষ্য বহন করে দাঁড়িয়ে আছে। এ বনের উল্লেখযোগ্য প্রাণীদের মধ্যে হাতি অন্যতম, ভাগ্য কিছুটা ভালো হলেই প্রকৃতির মাঝে হাতির দেখা মেলা সম্ভব। বনের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় বিভিন্ন বিরল প্রজাতির পাখির মিষ্টি মধুর আওয়াজ আপনার মনে আনবে এক অনাবিল প্রশান্তি।[১]



চুনতী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য

শিক্ষা ব্যবস্থা

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী চুনতি ইউনিয়নের সাক্ষরতার হার ৪৩%।[২] এ ইউনিয়নে ১টি মহিলা সরকারি কলেজ, ১টি কামিল মাদ্রাসা, ১টি ফাজিল মাদ্রাসা, ২টি দাখিল মাদ্রাসা, ৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৫টি এবতেদায়ী মাদ্রাসা ও ৩টি কিন্ডারগার্টেন রয়েছে।[৩]

---

১. Bangladesh Bureau of Statistics, Population and Housing Census 2022: District Report–Chattogram (Dhaka: Bangladesh Bureau of Statistics, 2023), table for Chunati Union.

২. ইউনিয়ন পরিসংখ্যান সংক্রান্ত জাতীয় তথ্যের ভিত্তিতে।

৩. Chunatiup.chittagong.gov.bd

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

কলেজ

- চুনতি সরকারি মহিলা কলেজ

মাদরাসা

- চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্রাসা
- ফাতেমা বতুল মহিলা ফাজিল মাদ্রাসা
- আল্লামা ফজলুল্লাহ আদর্শ দাখিল মাদ্রাসা
- সাতগড় শাহ আতাউল্লাহ আদর্শ দাখিল মাদ্রাসা[১]

এবতেদায়ী মাদরাসা

- ইসলামিয়া সুলতানিয়া এবতেদায়ী মাদ্রাসা
- এলাহী মোহাম্মদিয়া এবতেদায়ী মাদ্রাসা
- চুনতি নলবনিয়া দারুল কোরআন এবতেদায়ী মাদ্রাসা
- চুনতি হাফেজিয়া আদর্শ এবতেদায়ী মাদ্রাসা
- চুনতি সুফিনগর শাহ কুতুবিয়া আমিনউল্লাহ এবতেদায়ী মাদ্রাসা[২]

প্রাথমিক বিদ্যালয়

- এস এ খলিফা পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
- চান্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
- চুনতি আনসার ভিডিপি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
- চুনতি নোয়াপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
- চুনতি শাহসুফী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
- চুনতি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
- চুনতি হাকিমিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
- নারিশ্চা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
- পানত্রিশা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
- ফারাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
- সাতগড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়[৩]

---

১. Chunati Hakimia Kamil M A Madrasah," Chunati Union Parishad Official Website.
২. প্রাগুক্ত।
৩. প্রাগুক্ত।

কিন্ডারগার্টেন

- হা-মীম একাডেমি

ধর্মীয় উপাসনালয়

চুনতি ইউনিয়নে ৫০টি মসজিদ, ৫টি মন্দির ও ৩টি বিহার রয়েছে।

চুনতী ইউনিয়নের মসজিদসমূহ

- চুনতি ইউনিয়নে প্রায় ৫০টিরও বেশি মসজিদ রয়েছে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-
- মসজিদে বায়তুল্লাহ
- চুনতি কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ
- ডিপুটি পাড়া বড় মৌলানা মসজিদ
- খাঁন দিঘী জামে মসজিদ
- সাতগড় বুড়া মৌলানা জামে মসজিদ
- রোসাইংগা ঘোনা আউলিয়া জামে মসজিদ
- বনপুকুর জামে মসজিদ
- ফরেস্ট অফিস জামে মসজিদ
- সুফিনগর জামে মসজিদ
- রাতার খুল জামে মসজিদ
- শাহ আখতারিয়া জামে মসজিদ ইত্যাদি[১]

খাল ও নদী

চুনতি ইউনিয়নের উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে চাম্বী খাল, চান্দা খাল, সোনাছড়ি খাল, ফারাঙ্গা ছড়া, সাতগড় ছড়া, হাইছবিলা খাল, মছকানিয়ার ছড়া, রাতার ছড়া, হাতিয়ার খাল, পাগলীর খাল, বুড়ির ছড়া, পেকুয়ার ছড়া এবং নারাঙ্গার ছড়া।

হাট-বাজার

- চুনতি ইউনিয়নের প্রধান প্রধান হাট/বাজারগুলো হল চুনতি ডেপুটি বাজার, চুনতি মুন্সেফ বাজার, চুনতি বনপুকুর বাজার এবং সাতগড় মৌলভী বাজার।

দর্শনীয় স্থান

- হাফেজ আহমদ শাহ সাহেব-এর মাজার

চুনতি ইউনিয়নের দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে রয়েছে-

১. Bangladesh Bureau of Statistics, Population and Housing Census 2022: District Report – Chattogram (Dhaka: Bangladesh Bureau of Statistics, 2023), table for Chunati Union.

- হাফেজ অজিহুল্লাহ (র.) ডলু সেতু চুনতি চাঁন্দা - হাফেজ পাড়া পুটিবিলা
- হযরত মাওলানা হাফেজ আহমদ শাহ সাহেব (রহ.) এর মাজার
- চুনতি বড় মিয়াজী ও ছোট মিয়াজী মসজিদ
- খাঁন দীঘি ও মসজিদ
- চাম্বি লেক
- চুনতি প্রকৃতি ব্যাখ্যা কেন্দ্র
- চুনতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
- চুনতি বন্যপ্রাণ অভয়ারণ্য
- মিডওয়ে ইন হাইওয়ে রিসোর্ট
- ডাক বাংলো রেস্ট হাউস (ছায়াপথ)
- বুলবুল চৌধুরীর বাড়ি
- ফোর সিজন হাইওয়ে রিসোর্ট
- মেজর মিয়া মুহাম্মদ জয়নুল আবেদীন উচ্চ বিদ্যালয়
- আউলিয়া মসজিদ
- মসজিদ এ বায়তুল্লাহ, চুনতি
- সীরাতুন্নবী (সাঃ)
- নির্মাণাধীন রেললাইন

উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব

চুনতি ইউনিয়নের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগণের মধ্যে রয়েছেন-

- শাহ সাহেব (র:), চুনতি, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম, প্রতিষ্ঠাতা- সীরাতুন্নবী (সাঃ)
- অধ্যাপক নিয়াজ আহমদ খান, *পিএইচ.ডি*, বর্তমান উপাচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।[১]

---

১. দৈনিক যুগান্তর, ২৭ আগস্ট, ২০২৪ খ্রি.।
অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খান পিএইচ.ডি (জন্ম: ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৬৬ খ্রি.) একজন বাংলাদেশী শিক্ষাবিদ ও অধ্যাপক। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক এবং বিশ্ববিদ্যালয়টির বর্তমান উপাচার্য। এ পদে নিয়োগ লাভের আগে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের সভাপতি এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশের (আইইউবি) উপ-উপাচার্য এবং সাময়িক সময়ের জন্য ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
প্রাথমিক জীবন : নিয়াজ আহমেদ খান ১৯৬৬ খ্রি. ২৮ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলার চুনতি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষ খান বাহাদুর নাসির উদ্দিন ছিলেন অবিভক্ত ভারতের একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর। দাদা কবীর উদ্দিন আহমেদ খান আসাম-বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের ডেপুটি কালেক্টর এবং প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তাঁর বাবা শফিক আহমেদ খান জাতিসংঘের একজন পরামর্শক হিসেবে কাজ করতেন।

- মিয়া মোহাম্মদ জয়নুল আবেদীন, প্রাক্তন সেনা কর্মকর্তা ও সামরিক সচিব।
- নকীব খান, গীতিকার, সুরকার ও সংগীত শিল্পী।

শিক্ষাজীবন : নিয়াজ আহমেদ কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে মানবিক বিভাগ থেকে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান লাভ করে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেন। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান অনুষদের লোক প্রশাসন বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে ১৯৮৬ খ্রি. স্নাতক (সম্মান) ও ১৯৮৭ খ্রি. স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৯১ খ্রি. তিনি ইনস্টিটিউট অব পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট থেকে মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা সম্পন্ন করেন। তিনি কমনওয়েলথ বৃত্তি নিয়ে যুক্তরাজ্যের ওয়েলস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৯৬ খ্রি. পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন এবং পরবর্তী সময়ে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, সোয়ানসি বিশ্ববিদ্যালয় ও এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজিতে পোস্ট ডক্টরাল গবেষণা সম্পাদন করেন।

কর্মজীবন : নিয়াজ আহমদ খান ১৯৯২ খ্রি. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি ১৯৯৪ খ্রি. সহকারী অধ্যাপক, ১৯৯৯ খ্রি. সহযোগী অধ্যাপক ও ২০০৫ খ্রি. অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। ২০০৬ খ্রি. তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন।

তিনি এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন-এ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের বিশেষ অতিথি অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেন এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কুইন এলিজাবেথ হাউসে সিনিয়র কমনওয়েলথ ফেলো/সাউথ এশিয়ান ফেলো হিসেবে গবেষণা সম্পন্ন করেন। এছাড়াও, তিনি আইইউসিএনের বাংলাদেশ কান্ট্রি অফিসে কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ (২০০৯-২০১১ খ্রি.) হিসেবে এবং জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) চট্টগ্রাম হিল ট্র্যাক্টস ডেভেলপমেন্ট ফ্যাসিলিটি (সিএইচটিডিএফ)-এর জ্যেষ্ঠ প্রোগ্রাম সমন্বয়কারী (২০০৪-২০০৬ খ্রি.) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তার কর্মজীবনে আরও উল্লেখযোগ্য পদগুলোর মধ্যে রয়েছে এশিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির এশিয়া রিসার্চ ফেলো (১৯৯৬-১৯৯৮ খ্রি.) এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) অপারেশনস বিভাগের ব্যবস্থাপক (১৯৯০-১৯৯২ খ্রি.) হিসেবে কাজ করা।

অধ্যাপক নিয়াজ আহমদ খান পিএইচ.ডি ২০২১ থেকে ২০২৪ খ্রি. পর্যন্ত ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশের (আইইউবি) উপ-উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০২৪ খ্রি. ২৭ আগস্ট তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০তম উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। দ্র. দৈনিক কালবেলা, ২৬ আগস্ট, ২০২৪ খ্রি.।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : চট্টগ্রামে ইসলামের আগমন

'আরব-হিন্দুস্তান ধর্মীয় যোগাযোগ

'আরব-হিন্দুস্তান ধর্মীয় যোগযোগের বিষয়টি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, জাহেলী যুগে 'আরব ও হিন্দু (হিন্দুস্তানী) উভয় ধর্ম প্রায় কাছাকাছি। তৎকালীন সময় হিন্দুস্তান ও 'আরবদের যৌথ মন্দির সম্পর্কে চমৎকার বিবরণ পাওয়া যায়। প্রথমে হিন্দুস্তান ও 'আরবের আচার-আচরণ একই ছিল। কিন্তু পরে উভয় জাতি পৌত্তলিকতার প্রচলনে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং তারা দেবদেবীর পূজারী জাতিতে গণ্য হতে থাকে। সেসময় পৃথিবীর পৌত্তলিক জাতিগুলোর প্রধান সাতটি মন্দির ছিল। এগুলোকে 'সাবয়ে সাইয়ারা' বা সপ্ত নক্ষত্র নামে পরিচিত। সপ্ত নক্ষত্রের নামে নির্মিত মন্দিরগুলো হচ্ছে[১]–

(১) ইসফাহানের পর্বতে পারস্য মন্দির (বায়ত ফারেস)

(২) চিনেও নক্ষত্রের নামে মুলতান মন্দির

(৩) হিন্দুস্তানে সোমনাথ মন্দির

(৪) বল্‌খে নওবিহার মন্দির

(৫) ইয়ামানে সানায় ছিল শুক্র নাগের 'বায়তে গমদান'

(৬) ফরগানায় ছিল সূর্য মন্দির

(৭) মক্কায় কা'বা ছিল শনি নক্ষেত্রের মন্দির[২]

এছাড়াও সীরাত ইবন হিশাম-এর বর্ণনানুযায়ী 'আব্দুল মুত্তালিব যখন দ্বিতীয় বার যমযম কূপ খনন করান তখন তার ভেতরে দুটি সোনার হরিণ, কাল্লা[৩]র নির্মিত তরবারি ও লৌহবর্ম পাওয়া যায়। হরিণ দুটি ছিল জুরহুম গোত্রের।

এক বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, কাল্লার হিন্দী তরবারির মাধ্যমে সেখানের লোকেরা কা'বার জন্য মানত করেছিল। অথবা 'আরবরা এগুলো ক্রয় করে কা'বার গুপ্তভাণ্ডারে রেখে দিয়েছিল। এ বিষয়ে এতটুকু জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) এর দাদা

---

১. এ.কে.এম. মহিউদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৯

২. কা'বা সম্পর্কে পরবর্তীকালে ভুলবশত একথা প্রসিদ্ধ হয়ে যায় যে, এটি শনি গ্রহের নামানুসারে নির্মিত হয়। অথচ কা'বার প্রতিষ্ঠাতা কোনো নক্ষত্রের ভালো মন্দের উপর নির্মাণ করা হয়নি এবং এর নাম শনি ঘরও রাখেননি; বরং কা'বাকে হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু 'আমর ইবন লুওয়াই তার তত্ত্বাবধানকালে বালকা (সিরিয়া) থেকে মূর্তি এনে প্রথমবারের মতো কা'বায় স্থাপন করেন এবং তার প্রচলন বাদশাহ শাপুর যিল আক্‌তারের যুগ থেকে ব্যাপক আকার ধারণ করে। যা ইসলামের আগমন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। শেষ নবী মুহাম্মদ (সা.) মক্কা বিজয়ের পর কা'বাকে মূর্তির অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করেন। এ বাস্তবতা সত্ত্বেও একদল পৌত্তলিকের কা'বা সম্পর্কে বিশ্বাস ছিল যে, শনি নক্ষত্রের নামানুসারে নির্মাণ করা হয়। দ্র. এ.কে.এম. মহিউদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৯-১০

৩. কাল্লা হিন্দুস্তানের একটি শহরের নাম। এ শহরে বিরাট একটি দুর্গ ছিল। এ দুর্গের ভেতরে তরবারি তৈরি করা হতো। এ তরবারিগুলো হিন্দুস্তানের উন্নত তরবারি হিসেবে গণ্য হত।

'আব্দুল মুত্তালিব যমযম কূপে হিন্দী তরবারিগুলো দিয়ে কা'বার প্রবেশদ্বার নির্মাণে ব্যবহার করেছেন। যা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) এর যুগ পর্যন্ত অক্ষুণ্ন ছিল।[১]

বাংলাদেশে ইসলাম আগমনের প্রেক্ষাপট

প্রাক-ইসলামি যুগ থেকেই 'আরবের অভিজাত শ্রেণি ও ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। জল ও স্থল উভয় পথেই তারা ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করতেন। পরবর্তীতে মহানবি (সা.) এর জীবদ্দশাতেই ভারতীয় উপমহাদেশসহ বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল বিশেষ করে চট্টগ্রামে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে যায়। 'আরব মুসলিম বণিক, সাহাবী, তাবেঈ ও তাবে-তাবেঈ-এর অনুসৃত পথ ধরে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ বিশেষ করে 'আরব, ইরান, ইরাক, ইয়ামেন থেকে অনেক ওলি ইসলামের পতাকা নিয়ে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে আগমন করেন। ১২০৪খ্রি. ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি সতেরোজন ঘোড়সওয়ার সৈনিক নিয়ে আসেন বাংলায়। অত্যাচারী শাসক লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করে বাংলার শাসনক্ষমতা দখল করেন। মুসলমানগণ প্রায় সাড়ে পাঁচশ বছর এদেশ শাসন করেন। শান্তি, সৌহার্দ্য, উন্নয়ন-অগ্রগতি ও আদর্শের ছোঁয়ায় গড়ে ওঠা সমাজে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার জন্য রচিত হয় শান্তির নীড়।

রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এর জীবদ্দশাতেই ভারতীয় উপমহাদেশসহ বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল বিশেষ করে চট্টগ্রামে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে যায়। কারণ রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ভারতবর্ষ (হিন্দুস্তান) সম্পর্কে অবগত ছিলেন এবং সাহাবীদেরকে হিন্দুস্তান বিজয়ের ব্যাপারে সুসংবাদ দান করেছিলেন। এছাড়া সেকালে বাংলাদেশ হিন্দুস্তানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। ইসলাম আগমনের পূর্বেই 'আরব বণিকদের ভারত, বার্মা, চট্টগ্রাম, কামরূপ ও চীনের ক্যান্টন বন্দরে বাণিজ্যিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং ইসলাম আগমনের পর সে ধারা অব্যাহত ছিল। জলপথে আরব বণিক, সাহাবী, তাবে'ঈ ও আওলিয়া কিরামের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ইসলাম বাংলাদেশ ভূখণ্ডে আগমন করে। অন্যদিকে স্থলপথে মুসলিম শাসকদের দীর্ঘ প্রচেষ্টায় তেরো শতকের প্রথমে পর্যায়ক্রমে সমগ্র দেশে ইসলামের অভ্যুদয় ঘটে এবং সূচিত হয় মুসলিম সমাজব্যবস্থার।[২]

প্রাক ইসলামি যুগ থেকেই আরবের অভিজাত শ্রেণি ও ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মরুময় আরবদেশে জীবনযাপনের জন্য খাদ্য ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহের নিমিত্তে তারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ব্যবসায়িক কাফেলা নিয়ে গমন করতেন। জল ও স্থল উভয় পথেই তারা ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করতেন। উটের পিঠে আরোহণ করে

---

১. এ. কে. এম. মহিউদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০-১১

২. আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস: মুসলিম বিজয় থেকে সিপাহী বিপ্লব পর্যন্ত (১২০০-১৮৫৭) (ঢাকা: বড়াল প্রকাশনী, ১৯৯৯), পৃ. ১৫-১৬

স্থলপথে এবং নৌযানে ভেসে ভেসে এক দেশ থেকে অন্য দেশে ভ্রমণ করতেন। ফলশ্রুতিতে একদিকে সমুদ্রপথে আবিসিনিয়া এবং অপরদিকে চীন পর্যন্ত তাদের ব্যবসার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছিল।[১] ব্যবসার জন্য লোহিত সাগর, 'আরব সাগর এবং ভারত মহাসাগরের তীরবর্তী বন্দরগুলোতে 'আরব বণিকদের যাতায়াত ছিল।[২]

'আরব বণিকগণ সমুদ্রপথে সর্বদা মালাবারের উপর দিয়ে চট্টগ্রাম এবং সেখান থেকে সিলেট ও কামরূপ হয়ে চীন[৩] দেশে গমনাগমন করতেন। যাত্রাপথে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম এবং তৎকালীন আসামের অন্তর্ভুক্ত সিলেট বণিকদের যাতায়াতের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হত। তাই প্রাক ইসলামি যুগেই চট্টগ্রাম ও সিলেট বন্দরনগরীতে 'আরবদের বসতি গড়ে উঠেছিল।[৪] বণিকদের সাথে ধর্মপ্রচারক ও আওলিয়া কিরামের ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। তারা মূলত ভারতবর্ষের বিভিন্ন নদী বন্দরের উপকূল অঞ্চল দিয়ে উপমহাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেন।[৫]

'আরবের বণিকগণ জাহাজের জ্বালানি, খাদ্য ও কাপড় সংগ্রহের জন্যে চট্টগ্রাম বন্দর, আরাকান এবং বার্মায় যাত্রা বিরতি করতেন।[৬] সম্ভবত বণিকদের সাথে ইসলাম প্রচারকগণ সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে আগমন করে ইসলাম প্রচার করেছেন। এমনকি এ সকল বণিকদের অনেকে ইসলামি অভিজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের বন্দর ও উপবন্দরে স্থায়ী নিবাস গড়ে তোলেন। ইসলামের দাওয়াতি কাফেলা নিয়ে তারা স্থানীয় লোকদের সংস্পর্শে আসেন। তাদের আমল আখলাক ও আদর্শের প্রতি মুগ্ধ হয়ে এ দেশের সাধারণ মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। 'আরব মুসলমানরা স্থানীয়দের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে মুসলিম সমাজ গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করেন।[৭]

হযরত উমর (রা.) এর খিলাফতকালে দু'জন তাবেঈ মামুন ও মোহায়মেন-এর নেতৃত্বে একদল ইসলাম প্রচারক সমুদ্রপথে বাংলাদেশে আগমন করে উপকূলীয় অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। ইতিহাসে ইসলাম প্রচারক এ দলটি 'মোমেন' নামে পরিচিত।[৮] পরবর্তীতে হামিদুদ্দীন,

---

১. আব্বাস আলী খান, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৪খ্রি.), পৃ. ১৪

২. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, বাংলাদেশে ইসলাম: কয়েকটি তথ্যসূত্র, *মাসিক মদীনা* (২৭ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, জানুয়ারী ১৯৯২খ্রি.), পৃ. ৪১

৩. Muhammad Nurul Haque, *Arab Relations with Bangladesh* (Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 2003), P. 88

৪. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫খ্রি.), খ. ১৮, পৃ. ৩০০

৫. আবুল হাসান আলী নদভী, *আল-মুসলেমুনা ফিল হিন্দ* (লক্ষ্ণৌ: মাকতাবাত নদবিয়া, ১৯৮৭খ্রি.), পৃ. ১২

৬. Muhammad Abdur Rahim, *Social and Cultural History of Bengal* (Karachi: Pakistan Historical society, 1963 A.D.), vol. 1, p. 37

৭. ড. তারা চাঁদ, *ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, চতুর্থ সংস্করণ, ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ৩৮

৮. এ. কে. এম. মহিউদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

হাশেম, মুর্জা, আবদুল্লাহ ও আবূ তালিব প্রমুখ মুমিনের অপর দল ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে এদেশে আগমন করেন। এ দলটি 'আবেদ' নামে প্রসিদ্ধ।[১] এছাড়াও আরো পাঁচটি দল মিসর ও পারস্য থেকে বাংলাদেশে আগমন করতঃ বিভিন্ন স্থানে ধর্ম প্রচার কেন্দ্র তৈরি করে ইসলাম প্রচার করেন।[২]

'আরব মুসলিম বণিক, সাহাবী, তাবেঈ ও তাবে-তাবেঈ-এর অনুসৃত পথ ধরে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ বিশেষ করে 'আরব, ইরান, ইরাক, ইয়ামেন থেকে অনেক ওলি ইসলামের পতাকা নিয়ে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে আগমন করেন। এখানকার জলবায়ু, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় উপকরণ সামগ্রীর প্রাচুর্যে মুগ্ধ হয়ে মুসলিম বণিকদের মতো অনেক ওলী স্থায়ী বসবাস শুরু করে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। ইসলামের প্রচার-প্রসারে তারা এদেশে অসংখ্য মাদরাসা, মসজিদ ও ধর্ম প্রচারকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। এ সকল ওলিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন হযরত বায়জীদ বোস্তামী (রহ.)। সম্ভবত নয় শতকের দিকে ইসলাম প্রচারের জন্য সিন্ধু থেকে চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ-এর নাসিরাবাদের এক পর্বতচূড়ায় আগমন করেন।[৩] ইসলাম প্রচারকল্পে পর্বতের চূড়ায় একটি খানকাহ[৪] প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর সন্দ্বীপসহ পার্শ্ববর্তী অন্যান্য অঞ্চলে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেন।

শাহ মোহাম্মদ সুলতান রুমী (রহ): তিনি ইরানের বলখ রাজ্য থেকে সহচর ও আস্তানাসহ বর্তমান নেত্রকোণা জেলার অন্তর্গত মদনপুর গ্রামে আগমন করে বসতি স্থাপন করেন।[৫] ১৬৭১ ১৬৭১ খ্রিস্টাব্দে ফারসি ভাষায় দরগাহগারে লিখিত একটি দলিল[৬] থেকে জানা যায়, শাহ সুলতান রুমী (রহ) ৪৫৫ হিজরি মোতাবেক ১০৫৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর ওস্তাদ সৈয়দ শাহ সুরফুল আনতিয়াহসহ মদনপুরে আগমন করেন।[৭]" অতঃপর নেত্রকোণা, ময়মনসিংহসহ পার্শ্ববর্তী

---

১. কুষ্টিয়া জেলায় ইসলাম, পৃ. ৪০; আজিজুল হক বান্না, বরিশালে ইসলাম (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৪খ্রি.), পৃ. ৭১; ড. মোহা. আশরাফ উজ জামান, '*বৃহত্তর রংপুর জেলায় ইসলাম প্রচারে আওলিয়া কেরামের ভূমিকা: একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ*, অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি. থিসিস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০ খ্রি., পৃ. ৮৯

২. ড. হাসান জামান, *সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য* (ঢাকা: ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৮০ খ্রি.), পৃ. ২১২; বরিশালে ইসলাম, পৃ. ৮৩; দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী (সম্পাদিত), *আমাদের সূফীয়ামে কিরাম* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ২০০৪খ্রি.), পৃ. ৪০

৩. Board of Researchers, Islam in Bangladesh Through Ages (Dhaka Islamic Foundation Bangladesh, 1995 A.D), p. 20

৪. খানকাহ: খান অর্থ-ফকীর দরবেশ, আর 'কাহ' অর্থ স্থান। খানকাহ শব্দের অর্থ ফকীর-দরবেশদের স্থান। দ্র. সম্পাদনা পরিষদ, *বাংলা বিশ্বকোষ* (ঢাকা; নওরোজ কিতাবিস্থান, ১৯৭৬খ্রি.), খ. ২, পৃ. ২৫০

৫. নুরুল হোসেন খন্দকার, *শাহ সুলতান রুমী (রহ.)* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭ খ্রি.), পৃ. ১

৬. ১৭৬১ খ্রি সম্রাট শাজাহানের পুত্র সুলতান সুজা ফারসি ভাষায় লিখিত একটি সনদ প্রদান করেন। দ্র. আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ৬৯

৭. Social and Cultural History of Bengal, Vol. 1, p. 81; গোলাম সাকলায়েন, *বাংলাদেশে সূফী-সাধক* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০২০ খ্রি.), পৃ. ২১০-২১১

অঞ্চলে তাওহিদের বাণী প্রচার করেন।[১] ময়মনসিংহ অঞ্চলের জনৈক কোচ রাজা তাঁর অলৌকিকতার বিষয়ে অবগণ হয়ে অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েন। এরপর কোচ রাজা শাহ সুলতান রুমী (রহ.)-কে রাজদরবারে নিয়ে আসেন। রাজা তার অলৌকিকত্ব প্রমাণের জন্য রুমী (রহ.) কে বিষপান করতে দেন। তিনি বিসমিল্লাহ বলে তা পান করেন। রাজা তার এ অলৌকিক শক্তি দেখে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন এবং ধর্ম প্রচারের সুবিধার্থে মদনপুর গ্রাম দান করেন।[২] শাহ সুলতান রুমী (রহ.) মদনপুরে ইন্তিকাল করেন এবং সেখানেই সমাহিত হন।[৩]

বাংলাদেশে প্রাথমিক পর্যায়ের সুফিদের মধ্যে বাবা আদম শহীদ (রহ.) ছিলেন অন্যতম।[৪]" তিনি রাজা লক্ষ্মণ সেন-এর আমলে মক্কানগরী থেকে মুন্সিগঞ্জ জেলার বিক্রমপুরে আগমন করেন।[৫] তাঁর সঙ্গে কিছুসহচর ও শিষ্য ছিল। পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম অধ্যুষিত অঞ্চলে এসে তিনি তিনি আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত প্রদান করেন। তাঁর আহ্বানে কিছুসংখ্যক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেন। রাজা লক্ষ্মণ সেন তাঁর ধর্ম প্রচারে শঙ্কিত হয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হন। এ যুদ্ধে বাবা আদম শহীদ (রহ.) ও সঙ্গীগণ শাহাদতবরণ করেন। তাঁকে মুন্সিগঞ্জের রামপালে দাফন করা হয়।[৬] পরবর্তীকালে মুন্সিগঞ্জ জেলার রামপালের নিকটবর্তী কাজী কসবা নামক স্থানে বাবা আদম শহীদ (রহ.) এর নামে একটি মসজিদ নির্মিত হয়।[৭] মসজিদের প্রস্তর ফলক থেকে জানা যায়, ৮৮৮ হিজরি মোতাবেক ১৪৮৩ খ্রিস্টাব্দে সুলতান জালাল উদ্দীন ফতেহ শাহ-এর সময় জনৈক কাফুরের নেতৃত্বে এ মসজিদ নির্মিত হয়।

বাংলাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার অনেক পূর্বে শাহ নিয়ামাতুল্লাহ ঢাকা অঞ্চলে আগমন করেন।[৮] তিনি ঢাকায় আগমন করে তাওহিদের বাণী প্রচার আরম্ভ করেন।[৯] ঢাকা অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের প্রভাব দেখে স্থানীয় প্রভাবশালী হিন্দুরা বিভিন্নভাবে তাঁর ইসলাম প্রচার কাজে

---

১. Arab Relations with Bangladesh, p. 171

২. গোলাম সাকলায়েন, বাংলাদেশের সূফী-সাধক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯; বাংলা বিশ্বকোষ, খ. ৪, পৃ. ৪৫৫

৩. Enamul Haque, Bange Sufi Prabhava (Culcutta: 1935 A.D.), P. 138; History of the Muslims of Bengal, Vol. 1A, p. 4

৪. Journal of Asiatic Society, Vol. LVII, p. 12

৫. আসকার ইবনে শায়খ, *মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪খ্রি.), পৃ. ২৮৪

৬. আ. ন. ম. বজলুর রশীদ, পাকিস্তানের সূফী-সাধক (ঢাকা: জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা: পূর্ব পাকিস্থান সরকার ১৯৬৫ খ্রি), পৃ. ১৯; বাংলা বিশ্বকোষ, খ. ৩, পৃ. ৪০৬

৭. দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী (সম্পাদিত), *আমাদের সূফীয়ানে কিরাম*, (ইফাবা) পৃ. ৫২; *বাংলা বিশ্বকোষ*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৪০৬; *আমাদের সূফী-সাধক*, পৃ. ১৯৩-১৯৪; আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২-৭৩

৮. তাঁর অঙ্গুলের ইশারায় হিন্দু দেবমূর্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়ায় তাকে এ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। দ্র. আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮, দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী (সম্পাদিত), *আমাদের সূফিয়ায়ে কিরাম*, (ইফাবা) পৃ. ৬৮

৯. মুহাম্মদ জোহুরুল ইসলাম, *হযরত শাহ মখদুম (রহ.) জীবন ও কর্ম* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮ খ্রি.), পৃ ২৫

বাধা প্রদান করতে থাকে। এক পর্যায়ে তাঁর অলৌকিকত্বের প্রতি মুগ্ধ হয়ে হিন্দুরা তাঁর হাতে ইসলামের বাইয়াত গ্রহণ করে বলে প্রচলিত রয়েছে। বর্তমান ঢাকা মহানগরীর পুরাতন পল্টন এলাকায় দিলকুশায় শাহ নিয়ামাতুল্লাহ-এর মাজার অবস্থিত। তাঁর সমাধিস্থলে পাঠান আমলে নির্মিত একটি মসজিদ রয়েছে।[১]

উপরোল্লিখিত সুফি-সাধক ছাড়াও শাহ মখদুম রূপোশ (রহ.), মখদুম শাহ দৌলা শহীদ (রহ.), শাহ জালাল (রহ.), শাহ তুর্কান শহীদ (রহ.), তাকী উদ্দীন আরাবী (রহ.), শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (রহ.), আবদুল্লাহ কিরমানী (রহ.), শাহ বদরুদ্দীন (রহ.), আমীর লোহানী (রহ.)সহ আরো নাম না জানা অসংখ্য আওলিয়া কিরাম ও মুহাদ্দিসগণ বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে আগমন করে তাওহীদের সুমহান বাণী প্রচার করেন। এজন্য এগারো শতক থেকে সতের শতক পর্যন্ত সাতশ বছর ব্যাপী সময়কে ইসলামের সুবর্ণ যুগ বলা হয়ে থাকে। কেননা এ সময়ে আগত আওলিয়া ও উলামায়ে কিরাম বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে গমন করে মসজিদ, মাদরাসা ও খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইসলামের সুমহান বাণী জনসাধারণের নিকট পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করেন।

চট্টগ্রামে ইসলামের আগমন

চট্টগ্রামের সাথে 'আরবদের প্রাচীনতম সম্পর্ক ও যোগাযোগ, ইসলাম ও মুসলমানদের আগমন, মুবাল্লিগ-প্রাচারকদের প্রচার অভিযান ও 'আরব উপনিবেশ স্থাপন ইসলামী রাজ্য প্রতিষ্ঠা, প্রচারকদের আস্তানা, খানকাহ, তাকিয়া স্থাপন, মসজিদ-মাদরাসা প্রতিষ্ঠা এবং অন্যান্য ইসলামী নিদর্শন সাংস্কৃতিক তৎপরতার ব্যাপক প্রচলন চট্টগ্রামকে প্রাথমিক যুগেই তাৎপর্যমণ্ডিত করে তুলেছিল। তাতে স্বাভাবিকভাবেই তখন পূর্বদিগন্তের এই অঞ্চল ইসলামী ইতিহাস-ঐতিহ্যের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত হয়েছিল।

প্রথমে 'আরব বণিক-নাবিক ও ধর্মপ্রচারকদের ব্যাপক তৎপরতা এবং পরে রাজনৈতিকভাবে ইসলামের প্রতিষ্ঠা ও পরবর্তীকালে এ এলাকায় ইসলামের প্রচার-প্রসারকে অধিক বিস্তৃত করার ফলে যুগে যুগে পর্যটক লেখক ও ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি চট্টগ্রামের দিকে নিবদ্ধ হতে থাকে এবং তাঁরা চট্টগ্রামকে তাঁদের আলোচনা-পর্যালোচনা ও গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তুতে পরিণত করেন। চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের ইতিহাস রচনার একটি সফল প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় আধুনিক যুগে। আধুনিক যুগ বলতে আমাদের উদ্দেশ্য ১৯৪৭ খ্রি. পর থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত। ভারত বিভক্তি তথা পাকিস্তান সৃষ্টির পর। প্রাচীন আরবরা যে সকল স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করতেন, সে সকল স্থানে তাঁরা নিজেদের দেশের প্রথানুযায়ী মুসলমান

---

১. আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮; দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী (সম্পাদিত), *আমাদের সূফীয়ায়ে কিরাম* (ইফাবা), পৃ. ৬৮

ঔপনিবেশিক ও স্থানীয় নবদীক্ষিত মুসলমানদের সুখ সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য এক একজন 'আমীর' বা নেতা নিযুক্ত করতেন। এই আমীর কোনো কোনো স্থানে শক্তিশালী হয়ে ওঠার পর 'সুলতান বা রাজা' পদবী গ্রহণ করে রাজদণ্ড পরিচালনা করতে কুণ্ঠিত হতেন না। খ্রিস্টিয় দশম শতকের মধ্যভাগে চট্টগ্রামের 'আরব উপনিবেশকে কেন্দ্র করে একটি ক্ষুদ্র 'আরব রাজ্য হওয়ায় মেঘনা নদীর পূর্ব তীর থেকে নাফ নদীর উত্তর তীরবর্তীর সমুদ্রোপকুলস্থিত ভূ-ভাগ তখন এই 'আরব সুলতানের অধীনে ছিল।[১] ইসলামের প্রাথমিক যুগে চট্টগ্রামে প্রথম একটি মুসলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এই এলাকায় রাজনৈতিকভাবে ইসলাম বিস্তার লাভ করে। কিন্তু আরাকানরাজ তাঁর রাজ্যের উপকণ্ঠে একটি মুসলিম রাজ্য গড়ে উঠার ন্যায় আশংকাজনক ব্যাপারকে সহ্য করতে না পেরে আক্রমন পরিচালনা করেছিলেন।

ড. মুহাম্মদ এনামুল হক তাঁর রচিত চট্টগ্রামে ইসলাম গ্রন্থে বলেন,

> "তাই দেখিতে পাই, খ্রীষ্টীয় ৯৫৭ অব্দে রোসাঙ্গ (আরাকান) রাজ মূলতেং চন্দন (৯৫১-৯৫৭ খ্রী.) স্বীয় রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া 'বাঙ্গালা' অভিমুখে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া 'খূরতন'কে (ইহা আরবী 'সুলতান' শব্দের আরাকানী অপভ্রংশ) পরাজিত করেন এবং স্বীয় দিগ্বিজয়ের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ 'চেওগৌং' অর্থাৎ চট্টগ্রাম নামক স্থানে এক প্রস্তর নির্মিত বিজয় স্তম্ভ স্থাপন করিয়া পাত্রমিত্রের অনুরোধে স্বরাজ্যে ফিরিয়া যান। এই 'চেওগৌং' শব্দের অর্থ যুদ্ধ করা অনুচিত, বলিয়া রাজা মুলতেং চন্দর সেখানে পৌঁছিয়া যুদ্ধ করা অনুচিত বিবেচনা করিয়াছিলেন, সেখানেই বিজয় স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন। আধুনিক চট্টগ্রাম জেলার নাম এই 'চেওগৌং' শব্দ হইতে উদ্ভুত বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন।
>
> ফখরুদ্দীন মোবারক শাহের রাজত্বকালে (১৩৩৬-১৩৫২) ১৩৪৫ সালে ইব্ন বতূতা চট্টগ্রামে আগমন করেছিলেন, তখন তিনি সেখানে অনেক মুসলমান দেখেছিলেন। ষোড়শ শতকের প্রারম্ভে পর্তুগীজ ভ্রমণকারী বার্বোসা পূর্ববঙ্গের সামুদ্রিক বন্দরগুলিতে অনেক আরবী, ফারসী ও হাবসী দেখেছিলেন। চট্টগ্রামের অনেক মুসলমান প্রাচীন আরবদের বংশধর বলে দাবী করায় এবং চট্টগ্রাম শহরের ও তৎসন্নিহিত কোন কোন স্থানের নাম আরবী হওয়ার এবং এ জেলার কোনো কোন খেলাধূলা, রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহারে আরবী প্রভাব চট্টগ্রামের সাথে আরবদের প্রাচীন সম্বন্ধের কথা সহজেই অনুমান করা যায়।
>
> খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে আরবীয় বণিকগণ বাণিজ্য-ব্যপদেশে পূর্ব পাকিস্তানের সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে চট্টগ্রামে আগমন করিয়া

১. ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, পূর্ব পাকিস্তানের ইসলাম, পৃ. ১৭

স্থানীয় লোককে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিতেছিলেন। এতদ্‌সঙ্গে আরও বহু আরবীয় সাধু ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ইসলাম প্রচারের জন্য আরবদেশ হইতে বিভিন্ন দেশে ছড়াইয়া পড়েন। চট্টগ্রামেও এই সময়ে এইরূপ সাধু পুরুষ ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির আগমন ঘটে বলিয়া জানা যায়। চট্টগ্রাম রেল স্টেশনের উত্তর পার্শ্বস্থ কুমাদান পাহাড়ের উপর এইরূপ অনেক প্রাচীন আরবীয় সাধু পুরুষের কবর আছে বলিয়া উল্লেখ করা হয়। তবে দুঃখের বিষয় এখন তাঁহাদের সম্বন্ধে প্রকৃত তত্ত্ব নিরূপণ করিবার কোন উপায় নাই।

বিভিন্ন যুগে যেসব সাধু পুরুষ ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রামে আগমন করেন তাঁরা হচ্ছেন, সুলতান বায়যীদ বিস্তামী-২৬২ হিজরী অর্থা ৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে পারস্যের বিস্তাম নগরে ইন্তেকাল করেন ও সমাহিত হন। চট্টগ্রাম শহর থেকে প্রায় পাঁচ মাইল উত্তরে নাসিরাবাদ গ্রামের এক পর্বত চূড়ায় এই সাধকের একটি স্মারক সমাধি তাঁর চট্টগ্রাম আগমনের স্মৃতি বহন করছে। ফখরুদ্দীন মোবারক শাহের (১৩৩৬-১৩৫২) রাজত্বকালে তাঁর বিজয়ী সেনাপতি কদল খাঁ গাজী যখন চট্টগ্রাম জয় করেন, তখন তিনি এইরূপ একদল সাধু পুরুষের সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন। তন্মধ্যে হাজী খলীল ও বদ আলমের নাম প্রসিদ্ধ। ১৫০৫ সালে শেখ জালাল হালবী নামে আলোপ্পোর আরও এক ধর্মপ্রচারক চট্টগ্রাম এসেছিলেন ১৪৬২ খ্রীস্টাব্দে। আলেপ্পোতে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। জালালবাদে এখনও তাঁর সমাধি সর্বজন সম্মানিত। এখনও জালালবাদে (হাটহাজারী থানায়) এবং বখ্‌তপুর (ফটিকছড়ি থানায়) গ্রামে এই ধর্মপ্রচারকের বহু বংশধর বাস করেন।

ড. মুহাম্মদ এনামুল হকের মতে, বাংলাদেশে ইসলাম বিস্তৃতির আদি যুগে চট্টগ্রাম অঞ্চলে যেরূপ নিয়মিত ইসলাম প্রচারিত হয়েছিল। বাংলার আর কোন অঞ্চলে সেরূপভাবে তখন ইসলাম প্রচারিত হয়েছিল বলে জানা যায় না। চট্টগ্রামে 'বার আওলিয়া' ছাড়াও বহু দরবেশ আগমন করেছিলেন। চট্টগ্রাম জেলার আলেয়া বার (বটতলীতে) শাহ মুহসেন আওলিয়া (মৃত্যু: ১৩৯৭ খ্রিস্টাব্দে), সাতকানিয়ায় শাহ পীর, পটিয়ায় শাহ চাঁদ আওলিয়া, চন্দনপুরায় শাহ মুল্লা মিসকীন প্রমুখ ইসলাম প্রচার করেছিলেন।"[১]

১. ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম, তা.বি., পৃ. ২১-২২; এ. কে. এম মহিউদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯-৭০

দ্বিতীয় অধ্যায়

চট্টগ্রামে ‘আরবী ভাষা ও সাহিত্যচর্চা

দ্বিতীয় অধ্যায়
চট্টগ্রামে 'আরবী ভাষা ও সাহিত্যচর্চা

প্রথম পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশে 'আরবী ভাষা ও সাহিত্যচর্চার সূচনা

ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মাদ বিন বখতিয়ার খিলজি[১] কর্তৃক খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে লক্ষ্মণাবর্তী রাজ্য বিজয়ের পর মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন হলে এদেশে 'আরবী চর্চার শুভসূচনা হয়। ধর্মীয় শিক্ষা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা থেকেই মূলত এ অঞ্চলে 'আরবী ভাষার সূত্রপাত হয়।[২] বাংলাদেশে প্রথম 'আরবী ও ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্র রাজশাহীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর এ উপমহাদেশে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামি তথ্য 'আরবী শিক্ষাকেন্দ্রের সর্বপ্রথম ভিত্তি স্থাপিত হয় ঢাকার সোনারগাঁয়ে।[৩] তাছাড়াও বাংলাদেশের চট্টগ্রাম অঞ্চল 'আরবী চর্চায় বিশেষ অবদান রাখে। বখতিয়ার খিলজির বঙ্গবিজয়ের বহু পূর্বেই চট্টগ্রামে আরব বণিক ও ধর্ম প্রচারকের মাধ্যমে ইসলামের আগমন ঘটে। তারা চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে খানকাহ ও আস্তানা স্থাপন করে ইসলামের সুমহান বাণী প্রচার করেন। বিশেষত এ অভিসন্দর্ভের মহান সাধকের পূর্বপুরুষ দ্বিতীয় খলীফা 'উমার ইবনু খাত্তার (রা:) এর বংশদর চট্টগ্রামের লোহাগড়া ইউনিয়নের চুনতী অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে 'আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ অবদান রেখেছেন। তাঁদের সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় চট্টগ্রাম অঞ্চলে বহু মাদরাসা স্থাপিত হয়।[৪] এ মাদরাসাসমূহের মধ্যে মীর ইয়াহ্ইয়ার মাদরাসা ধর্মীয় ও 'আরবী চর্চার পাদপীঠ হিসেবে গণ্য

---

১ ইখতিয়ার উদ্দিন আফগানিস্তান উত্তরে সিস্তান রাজ্যের নরমসর জেলায় এক তেজোদ্দীপ্ত সাহসী সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি খর্বাকৃতি ও কুৎসিত ছিলেন। তার দেহের তুলনায় হাত দুটি লম্বা ছিল। তিনি বাদাউনের শাসনকর্তা মালিক হুসামুদ্দিনের অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন। হুসামুদ্দীন তাকে বর্তমান মির্জাপুর জেলার একাংশে একটি ক্ষুদ্র পরগণার ভার প্রদান করেন। এ সময় থেকেই তার উন্নতির সূত্রপাত হয়। তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই গোত্রীয় ও তুর্কিদের সহযোগিতায় এক শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করেন। কুতুবুদ্দিন আইবেক তার সাফল্যে আনন্দিত হয়ে তাকে নানা সম্মানে ভূষিত করেন। অতঃপর তিনি ১২০০ খ্রিস্টাব্দের প্রারম্ভে লক্ষণাবতী রাজ্য জয় করেন। ফলে বাংলাদেশে মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন হয়। (Dr. AKM Ayub Ali, *History of Traditional Islamic Education Bangladesh* (Islamic Foundation Bangladesh 1983), p. 5-7 ইবনে গোলাম সামাদ, *বাংলাদেশে ইসলাম* (ঢাকা: ইসালামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৭ আব্দুল করিম, *বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস* (ঢাকা, বাংলা একাডেনি, ১৯৯৩ খ্রি.) : আব্দুল করিম, *মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য* (ঢাকা: একাডেমি, ১৯৯৩), পৃ. ২১২. ড. এম এ রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮২ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২৬

২ ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *বাংলাদেশের খ্যাতনামা 'আরবী বিদ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ১

৩ *বাংলাদেশের খ্যাতনামা 'আরবী বিদ*, পৃ. ৪

৪ এ. কে. এম. মুহিউদ্দিন, *চট্টগ্রামে ইসলাম* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩ খ্রি.), পৃ. ৩১

করা হয়। এছাড়া চট্টগ্রাম নগরীতে দ্বীনি শিক্ষা ও 'আরবী চর্চার জন্য বহু মাদরাসা স্থাপিত হয়।[১] এভাবেই বাংলাদেশে ' 'আরবী ভাষা চর্চার সূচনা ও বিকাশ ঘটে।

'আরবী ভাষার পরিচয়ঃ 'আরবী ভাষা সেমেটিক ভাষা পরিবারের জীবন্ত সদস্যগুলোর মধ্যে থেকে অন্যতম একটি। এটি সেমেটিক ভাষার কেন্দ্রিয় ভাষা। হিব্রু ও আরামিয় ভাষার সাথে এ ভাষার রয়েছে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। আধুনিক 'আরবী কে একটি 'ম্যাক্রোভাষা' আখ্যা দেয়া হয়। এর সাতাশ রকমের উপভাষা রয়েছে। আরব বিশ্বজুড়ে এই উপভাষাগুলো প্রচলিত এবং আধুনিক বিশ্বের সর্বত্র পড়া ও লেখা হয়। আধুনিক 'আরবী বিশুদ্ধ 'আরবী থেকে উদ্ভূত। মধ্যযুগে 'আরবী ভাষা ছিলো গণিত, বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রধান বাহক। বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত বহু ভাষা 'আরবী ভাষার বিশাল-ব্যাপক শব্দভাণ্ডার থেকে শব্দ ধার করেছে।

সব সেমেটিক ভাষারই একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ব্যঞ্জন দিয়ে গঠিত ধাতুরূপ বা শব্দমূল। সাধারণত তিনটি ব্যঞ্জন নিয়ে একটি মূল গঠিত হয় এবং প্রতিটির একটি মূল অর্থ থাকে। তারপর এই মূলকে বিভিন্নভাবে পরিবর্তন করে (স্বরবর্ণ যোগ করে, উপসর্গ-মধ্যসর্গ-অন্ত্যপ্রত্যয় বসিয়ে) অন্যান্য কাছাকাছি অর্থের শব্দ সৃষ্টি করা হয়। উদাহরণস্বরূপ নেয়া যাক 'আরবী 'সালিম' মূলটি, যার অর্থ নিরাপদ (আরও সঠিকভাবে সালিম মানে সে (পুরুষ) নিরাপদ ছিল।) এখান থেকে আমরা পাই সাল্লাম (সরবরাহ করা), আসলামা (সমর্পণ করা, জমা দেওয়া), ইস্তালামা (গ্রহণ করা), ইস্তেসলাম (আত্মসমর্পণ করা), সালামুন (শান্তি), সালামাতুন (নিরাপত্তা) এবং মুসলিমুন (মুসলিম)। এই বৈশিষ্ট্যের কারণে 'আরবী ভাষার শিক্ষার্থী সহজেই 'আরবী শব্দভাণ্ডারের জ্ঞান বৃদ্ধি করতে পারে।

'আরবী কে সাধারণত ধ্রুপদী 'আরবী , আধুনিক লেখ্য 'আরবী এবং আধুনিক কথ্য বা চলতি 'আরবী এই তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। ধ্রুপদী 'আরবী ষষ্ঠ শতক থেকে প্রচলিত ও এতেই কুরআন শরিফ লেখা হয়েছে। আল-মুতানাব্বি ও ইবন খালদুন ধ্রুপদী 'আরবী র বিখ্যাত কবি। আধুনিক লেখ্য 'আরবী তে আধুনিক শব্দ যোগ হয়েছে ও অতি প্রাচীন শব্দগুলো বর্জন করা হয়েছে, কিন্তু এ সত্ত্বেও ধ্রুপদী 'আরবী র সাথে এর পার্থক্য খুব একটা বেশি নয়। 'আরবী সংবাদপত্র ও আধুনিক সাহিত্য আধুনিক লেখ্য 'আরবী তেই প্রকাশিত হয়।

বাংলাদেশে 'আরবী সাহিত্যচর্চার সূচনা

ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মাদ বিন বখতিয়ার খিলজি[২] কর্তৃক খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে লক্ষ্মণাবতী রাজ্য বিজয়ের পর মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন হলে এদেশে 'আরবী চর্চার

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩

২ (Dr. AKM Ayub Ali, *History of Traditional Islamic Education Bangladesh* (Dhaka Islamic Foundation Bangaldeshi 1983), p. ৫-৭ ইবনে গোলাম সামাদ, *বাংলাদেশে*

শুভসূচনা হয়। ধর্মীয় শিক্ষা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা থেকেই মূলত এ অঞ্চলে 'আরবী ভাষার সূত্রপাত হয়।[১] কারণ কুরআন, হাদীস, তাফসির, ফিকহ, উসূলুল ফিক্হ, আকাঈদ, মানতিকসহ ইসলামি সাহিত্যের সকল মৌলিক গ্রন্থাবলি 'আরবী ভাষায় রচিত; ফলে মুসলিম শাসকগণ বিজিত এলাকায় ধর্মীয় শিক্ষা প্রসারের কাজে মনোনিবেশ করেন এবং স্থানে স্থানে মসজিদ, মাদরাসা ও মন্দির স্থাপন করেন।[২] এসব প্রতিষ্ঠানে 'আরবী ভাষা শিক্ষা প্রদান করা হত।[৩] এ সময় মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি ইমাম ও ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে মুসলিম সমাজের ভিত রচনা করেন এবং 'আরবী শিক্ষার পথও সুগম করেন।[৪] সুলতান গিয়াস উদ্দিন ইওয়াজ খিলজি তার শাসনামলে (১২১৩-১২২৭ খ্রি.) লক্ষ্মণাবতী ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অসংখ্য মসজিদ, মাদরাসা ও খানকাহ স্থাপন করেন। এসব প্রতিষ্ঠানে রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় প্রয়োজনে 'আরবী চর্চা হতো বলে ধারণা করা হয়।[৫] সুলতান গিয়াস উদ্দিন আলিমদের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করতেন। কল্যাণকামী আলিম, পণ্ডিত ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য প্রদর্শন করতেন। তিনি অনেক মিলনায়তন, মসজিদ ও মাদরাসা নির্মাণ করেন। তার প্রতিষ্ঠিত মসজিদ মাদরাসায় ইসলামি জ্ঞান আহরণ তথা 'আরবী চর্চা হত বলে জানা যায়।[৬] ইসলামি শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ থাকায় মাওলানা তকি উদ্দীন আল- 'আরবী বাংলাদেশে আগমন করেন এবং রাজশাহীর মাহিনে (বর্তমান নওগাঁ জেলার মাহি সন্তোষ) একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে 'আরবী ও ইসলামি শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তার প্রতিষ্ঠিত এই মাদরাসাটি বাংলাদেশে প্রথম প্রতিষ্ঠিত ইসলামিয়া মাদরাসা।[৭] সুলতান গিয়াস উদ্দিনের শাসনামলে (১২৬১-১২৭৮ খ্রি.) শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামাহ বর্তমান রাশিয়ার বুখারা প্রদেশ থেকে দিল্লি হয়ে বাংলাদেশের বর্তমান সোনারগাঁও আগমন করেন। তিনি সেখানে একটি মাদরাসা স্থাপন করে কুরআন, তাফসির, হাদীস, উসূলে হাদীসসহ

ইসলাম (ঢাকা: ইসালামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৭ আব্দুল করিম *বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস* (ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩ খ্রি.) আব্দুল করিম, *মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য* (ঢাকা: একাডেমি, ১৯৯৩), পৃ. ২১২. ড. এম এ রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮২ খ্রি.), খ. ১ পৃ. ২৬

১ ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *বাংলাদেশের খ্যাতনামা 'আরবী বিদ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ১

২ আব্দুল করিম, *বাংলার ইতিহাস* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি ১৯৭৭ খ্রি.), পৃ. ৫১৬

৩ মো: আব্দুস সাত্তার, *আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস*, অনূদিত: মোস্তফা হারুন (ঢাকা) ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮০ খ্রি.), পৃ. ২৬

৪ *আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস*, পৃ. ২৮; *বাংলাদেশে খ্যাতনামা 'আরবী বিদ*, পৃ. ২

৫ এ কে এম নাযির আহমদ, বাংলাদেশে মুসলিম শাসন, *মাসিক পৃথিবী* (ঢাকা: কাটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস- ডিসেম্বর, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ১৪৪

৬ NN Law, *Promotion of learning in India* (London, 1916), c. 106

৭ আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম* (ঢাকা) ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০ খ্রি.), পৃ. ১১৭।

'আরবী ভাষার বিভিন্ন গ্রন্থাবলি পাঠদান করতে থাকেন। তার এই মাদরাসাটি অল্প সময়ের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং বিভিন্ন স্থান হতে ছাত্র ও গুণীজনের মিলনকেন্দ্র হিসেবে পরিণত হয়। ফলে সোনারগায়েঁর এই মাদরাসাটি ইসলামি ও 'আরবী শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে।[১] একথা বলা যায় যে, বাংলাদেশে প্রথম 'আরবী ও ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্র রাজশাহীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর এ উপমহাদেশে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামি তথা 'আরবী শিক্ষা কেন্দ্রের সর্বপ্রথম ভিত্তি স্থাপিত হয় ঢাকার সোনারগাঁয়ে।[২]

বাংলাদেশে 'আরবী শিক্ষার ক্ষেত্রে সমসাময়িক আরো একজন অবদান রাখেন তিনি হলেন শায়খ শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামার সুযোগ্য ছাত্র ও জামাতা শরফুদ্দীন ইয়াহ্ইয়া আল মানীরি।[৩] আবু তাওয়ামা তদীয় জামাতা আল মানীরিকে একাধারে ২২ বছর যাবৎ তাফসির, হাদীস, ফিকহ ও 'আরবী সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তালীম দিয়ে সুপণ্ডিত হিসেবে গড়ে তোলেন। তার খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লে মাদরাসাটি বাংলাদেশের মানুষের ধর্মীয় ও 'আরবী শিক্ষার একমাত্র কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। পরবর্তীতে শ্বশুর জামাতার যৌথ প্রচেষ্টায় এটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়ে বাংলার মুসলমানদের 'আরবী চর্চা ও ইসলামি জীবনধারায় উৎকৃষ্ট অবদান রাখতে সক্ষম হয়।[৪] 'আরবী ভাষায় ব্যাপক চর্চার জন্য বাংলার বিভিন্ন মুসলিম শাসকগণ অসংখ্য মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তাদের মধ্যে সুলতান রুকন উদ্দিন কাইকাউস (১২৯০-১০০১ খ্রি.)-এর নাম উল্লেখযোগ্য। সুলতান শামস উদ্দীন ফিরোজ শাহ ও সুলতান জালাল উদ্দীন মুহাম্মাদ শাহের শাসনামলের প্রাপ্ত শিলা লিপিতেও একটি মাদরাসা স্থাপনের কথা পাওয়া যায়। এ সমস্ত মাদরাসাতে 'আরবী চর্চা হত সুনিপুণভাবে।[৫] সুলতান গিয়াস উদ্দীন আজম শাহের শাসনামলে (১৯৯২-১৪১০ খ্রি.) বাংলাদেশে 'আরবী চর্চা হয় ব্যাপকভাবে। তিনি ছিলেন ধার্মিক এবং 'আরবী ও ইসলামি জ্ঞানচর্চার বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক। বিশিষ্ট পণ্ডিত শায়খ আলাউল হক তার শাসনকালে পাণ্ডুয়াতে বসবাস করেন এবং সেখানে 'আরবী ও ইসলামি শিক্ষাচর্চায় ব্যাপক ভূমিকা রাখেন। সে সাথে তদীয় পুত্র নূর কুতুবুল আলম সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতায় 'আরবী ও ইসলামি জ্ঞান বিস্তারে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন।[৬] গৌড়ের সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহের (১৪৩৭-১৪৫৯ খ্রি.) আমলে বাংলাদেশের যশোর ও খুলনা অঞ্চলে আসেন খানজাহান আলী। তিনি দক্ষিণবঙ্গ জয় করে ও সে এলাকার

---

১ *বাংলাদেশে ইসলাম*, পৃ. ১২০-১২: ড. এম এ রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, পৃ. ১২৯

২ *বাংলাদেশের খ্যাতনামা 'আরবী বিদ*, পৃ. ৪

৩ *বাংলাদেশে ইসলাম*, পৃ. ১২১; ড. কাজী দীন মুহাম্মদ, অগ্রপথিক সংকলন, আমাদের সুফীয়ায়ে কিরাম (ঢাকা) ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৬৭ খ্রি.) পৃ. ৯৮

৪ ড. আব্দুল করিম, *বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস*, পৃ. ১৪১

৫ আব্দুল করিম, *মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩ খ্রি.), ২২৫

৬ *বাংলাদেশে ইসলাম*, পৃ. ১৭২-১৭৪। *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, পৃ. ৮৩-৮৪

শাসনভার গ্রহণ করেন এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মসজিদ ও মাদরাসা স্থাপন করেন। এর মধ্যে বাগেরহাটে তার স্থাপিু ষাটগম্বুজ মসজিদ আজও কালের সাক্ষী হয়ে আছে।[১]

শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহের আমলেও (১৪৭৪-১৪৮১ খ্রি.) বাংলাদেশে অনেক মসজিদ ও মাদরাসা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তিনি হিজরি ৮৮৪/১৪৭৯ খ্রিস্টাব্দে মাহদীপুর ও পিরোজপুরের মধ্যর্বী উমরপুরে গৌড় "দরসবাড়ী" বলে পরিচিত একটি মসজিদ ও মাদরাসা স্থাপন করেন।[২] বিখ্যাত শাসক আলাউদ্দিন হুসাইন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.) 'আরবী ও ইসলামি শিক্ষা চর্চায় বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাঁর শাসনামলের এমন কিছু মুদ্রা পাওয়া যায় যা মসজিদ নির্মাণের সাথে সম্পর্কিত। তার আমলের কোন কোন মুদ্রায় 'আরবী তে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' কালেমা খচিত ছিল। আবার কোনোটিতে খুলাফায়ে রাশেদার নাম লেখা ছিল। এ সময়ে গৌড়ে ছোটসোনা মসজিদ নির্মিত হয়। 'আরবী চর্চা ও ইলমে দ্বীনের চর্চার লক্ষ্যে তিনি ১৪৯৩ খ্রি. গৌড়ের নিকটর্বী একটি মাদরাসাও স্থাপন করেন। তার নির্মিত মসজিদ ও মাদরাসায় বিজ্ঞ 'আরবী বিদদের নিয়োগ দেন এবং তাদের স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করেন। ফলে তার সময় ব্যাপকভাবে 'আরবী চর্চা হয়।[৩] আলাউদ্দিন হুসাইন শাহ তদীয় পুত্র নুসরত শাহর বাংলার হুসাইন শাহী খান্দানের (১৪৯৩-১৫৩৮ খ্রি.) দক্ষ শাসক ছিলেন। তিনি তাঁর শাসনামলে বহু মসজিদ, মাদরাসা ও খানকাহ্ প্রতিষ্ঠা করেন। এগুলোতে 'আরবী ও ইসলামি জ্ঞান চর্চা হত। হুসাইন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.) স্বীয় ক্ষমতায় আরোহণ করে দেশ বিদেশের 'আরবী পণ্ডিতদের আমন্ত্রণ করেন। ১৫০২ খ্রিস্টাব্দে গৌড়ে গোর শহীদ নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত মাদরাসার শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেন। সমসাময়িক কালে ঢাকার নিকটস্থ সোনারগাঁয়ে 'আরবী ভাষা চর্চাকেন্দ্র গড়ে উঠে। এখানকার মসজিদ ও মাদরাসার ভগ্নাবশেষ আজও সে যুগের 'আরবী চর্চার সাক্ষ্য বহন করে। নুসরত শাহের শাসনকালে (১৫১৯-১৫৩২ খ্রি.) বিখ্যাত মুহাদ্দিস তকিউদ্দীন বিন আইনুদ্দীন ১৫২২ খ্রিস্টাব্দে একটি মসজিদ তৈরি করেন। তথায় কুরআন, হাদীস, ফিকহসহ বহু 'আরবী গ্রন্থাদি চর্চা করা হত।[৪]

বাংলাদেশ 'আরবী চর্চায় সুবেদার শায়েস্তা খানের অবদান স্মরণীয়। তিনি ১৯৬৪ সাল থেকে ১৬৬০ সাল পর্যন্ত ঢাকার সুবেদার থাকাবস্থায় একটি বিরাট মসজিদ ও মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এ মাদরাসা বিগণ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল। বর্তমানে তা একটি হাসপাতাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আর মসজিদটির ভগ্নাবশেষ এখন পর্যন্ত বিদ্যমান। শায়েস্তা

---

১ প্রাগুক্ত ১৮৬-১৮৭

২ প্রাগুক্ত ১৮৯-১৯০; বাংলাদেশ খ্যাতনামা 'আরবী বিদ, পৃ. ৬

৩ *আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস*, পৃ. ২৯; কে. এম. নযর আহমদ, *মাসিক পৃথিবী*, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ খ্রি., পৃ. ৩৮; মাওলানা আব্দুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ৬

৪ *বাংলাদেশের খ্যাতনামা 'আরবী বিদ*, পৃ. ৬; *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, পৃ. ১৩০-১৩১

খান কর্তৃক ১৭০৪ খ্রি. নির্মিত হয় খান মুহাম্মদ মৃধার মসজিদ নামে একটি মসজিদ। সেখানে ব্যাপক 'আরবী চর্চা হত। এমনকি বর্তমানেও 'আরবী চর্চা অব্যাহত রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। মসজিদটির নিচতলায় বহু ছোট ছোট কামরা রয়েছে। সে কামরাগুলো বর্তমানে মাদরাসা ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাস হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং এখনও সেখানে কুরআন, হাদীসসহ বিভিন্ন বিষয়ে 'আরবী চর্চা হয়।[১] ঢাকার আজিমপুর কেন্দ্রিয় গোরস্থানের পশ্চিম পাশে সম্রাট আওরঙ্গজেবের পুত্র মুহাম্মদ আজম একটি দ্বিতল মসজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদটি আযমের মসজিদ নামে খ্যাত। এ মসজিদের দ্বিতলের উত্তরাংশে কয়েকটি হাওদার প্রশস্ত প্রকোষ্ঠ রয়েছে। এগুলো মাদরাসা হিসেবেই ব্যবহৃত হয়। এখনো দোতলার উক্ত কক্ষগুলো মাদরাসা রূপেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। দোতলার দেয়ালে খোদিত শিলালিপি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এ মাদরাসা সংযুক্ত মসজিদটি ধর্মীয় শিক্ষালাভের জন্য ১৭৪৭ খ্রি. ফয়জুল্লাহ নামে জনৈক 'আরবী বিদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানে 'আরবী ও ইসলামি সাহিত্যচর্চা হতো।[২] ঢাকা শহরে বিভিন্ন মাদরাসা সংযুক্ত বহু মসজিদের সন্ধান পাওয়া যায়। যেগুলোতে ব্যাপকভাবে 'আরবী চর্চা হতো বলে ঐতিহাসিক ও গবেষকগণ মনে করে থাকেন। মুর্শিদাবাদেও সামরিক শাসকগণ ও নওয়াবদের পৃষ্ঠপোষকতায় বহু মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব মাদরাসা 'আরবী চর্চায় বিশেষ অবদান রাখে। শিক্ষানুরাগী নবাব আলীবর্দী। (১৭৪০-১৭৫৬ খ্রি.) পাটনা আজীমাবাদ থেকে 'আরবী বিদদের আমন্ত্রণ করে মুর্শিদাবাদে আনয়ন করেন। তারা সেখানে 'আরবী চর্চার বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। বর্ধমান জেলাতেও 'আরবী চর্চা হতো ব্যাপকভাবে। তথাকার বুহার মাদরাসা ও গ্রন্থাগারটি ছিল মুনশী সদরউদ্দীন আহমদ প্রতিষ্ঠিত 'আরবী চর্চার বিশাল কেন্দ্র। ১৭৬৫ খ্রি. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সহায়তায় কলিকাতা আলিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠার সতের বছর পূর্বে এ প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়। এ মাদরাসা ও গ্রন্থাগারটি বাংলাদেশে 'আরবী চর্চার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।[৩] একইভাবে বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটেও একসময় 'আরবী ও ফারসির যথেষ্ট চর্চা হয় এবং একটি বড় লাইব্রেরি গড়ে উঠে। এখানে 'আরবী র অনেক দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি রয়েছে। এ গ্রন্থাগার বাংলাদেশে 'আরবী চর্চায় বিশেষ অবদান রাখে।

বাংলাদেশের চট্টগ্রাম অঞ্চল 'আরবী চর্চায় বিশেষ অবদান রাখে। বখতিয়ার খিলজির বঙ্গবিজয়ের বহু পূর্বেই চট্টগ্রামে আরব বণিক ও ধর্ম প্রচারকের মাধ্যমে ইসলামের আগমন ঘটে। তারা চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে খানকাহ ও আস্তানা স্থাপন করে ইসলামের সুমহান বাণী

---

১ *বাংলাদেশের খ্যাতনামা 'আরবী বিদ*, পৃ. ৭; *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, পৃ. ১৪০

২ *আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস*, পৃ. ৩১-৩২

৩ *বাংলাদেশের খ্যাতনামা 'আরবী বিদ*, পৃ. ৭

প্রচার করেন। তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় চট্টগ্রাম অঞ্চলে বহু মাদরাসা স্থাপিত হয়।[১] এ মাদরাসাসমূহের মধ্যে মীর ইয়াহ্ইয়ার মাদরাসা ধর্মীয় ও 'আরবী চর্চার পাদপীঠ হিসেবে গণ্য করা হয়। এছাড়া চট্টগ্রাম নগরীতে দ্বীনি শিক্ষা ও 'আরবী চর্চার জন্য বহু মাদরাসা স্থাপিত হয়।[২] চট্টগ্রামে অধিকহারে 'আরবী চর্চার অন্যতম কারণ হলো এখানে অনেক আরব মুবাল্লিগ, সুফিসাধক ও বণিক ইসলাম প্রচার ও ব্যবসায়িক কাজে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। ফলে দিনে দিনে মুসলমানের সংখ্যা বাড়তে থাকে। এছাড়া তাদের পরবর্তী বংশধরেরা স্থায়ীভাবে অত্র এলাকায় বসবাস শুরু করে এবং নগরীর বিভিন্ন স্থানে জনগণের মাঝে ইসলাম প্রচারের জন্য ছড়িয়ে পড়েন।[৩] এভাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে ঢাকা, সোনারগাঁ, চট্টগ্রাম ও হাটহাজারিতে অনেক মসজিদ ও মাদরাসা গড়ে উঠে যেগুলোতে 'আরবী চর্চাই ছিল প্রধান। ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে বাংলাদেশে আশি হাজার মক্তব স্থাপিত হয় এবং প্রতি চারশত জনে একটি মাদরাসা স্থাপিত হয়। এসব মাদরাসা থেকে হাজার হাজার 'আরবী বিদ বের হন যারা পরবর্তীকালে 'আরবী ভাষায় অসংখ্য গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ হন।[৪] পর্যায়ক্রমে সুলতানি ও মুঘল শাসনামলে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বহু মাদরাসা স্থাপিত হয়। সুলতানগণ মাদরাসা পরিচালনার জন্য সম্পত্তি বরাদ্দ দেন। এছাড়া নগদ অর্থ দিয়েও সহযোগিতা করেন।[৫] এভাবে বাংলাদেশে ব্যাপকহারে 'আরবী চর্চা হয়। বাংলাদেশসহ এ উপমহাদেশে বিভিন্ন স্থানে যুগে যুগে 'আরবী চর্চার এমন সব কেন্দ্র গড়ে উঠে যাতে প্রায় ৭০০ বছর ধরে 'আরবী চর্চাসহ ইসলামি সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চা অব্যাহত থাকে। এমনকি ব্রিটিশ আমলেও বাংলাদেশে 'আরবী চর্চা বাধাগ্রস্ত হলেও থেমে থাকেনি; বরং এদেশে ব্রিটিশ সরকারের আমদানি করা ইউরোপিয় সভ্যতার সাথে প্রতিযোগিতা করে 'আরবী চর্চা হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সাহারানপুর জেলায় মাজাহিরে উলুম মাদরাসা (১৮৬৬ খ্রি.), রামপুর মাদরাসা (১৮৯৮ খ্রি.) সহ বিভিন্ন মাদরাসা এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলাদেশে হাটহাজারি মঈনুল ইসলাম মাদরাসা (১৯০১ খ্রি.), সিলেট আলিয়া মাদরাসা (১৯১৩ খ্রি.), চট্টগ্রাম দারুল উলুম মাদরাসা (১৯১৩ খ্রি.) ইত্যাদি স্থাপিত হয়।[৬] এগুলোতে সুনিপুণভাবে 'আরবী চর্চা হতে থাকে। যদিও এ অঞ্চলের মানুষের মাতৃভাষা বাংলা, তথাপি 'আরবী চর্চার মূল্যমান বিচার করলে মোটেও কম বলার সুযোগ নেই। কেননা ঢাকা সোনারগাঁ, চট্টগ্রাম ও হাটহাজারিতে 'আরবী ভিত্তিক অনেক

---

১ এ. কে. এম. মুহিউদ্দিন, *চট্টগ্রামে ইসলাম* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩ খ্রি.), পৃ. ৩১।

২ প্রাগুক্ত। পৃ. ৯৩

৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০-৬৭: *বাংলাদেশে ইসলাম*, পৃ. ৬১-৬১

৪ প্রাগুক্ত। পৃ. ৯২

৫ মুশতাক আহমেদ, *তাহরীকে দেওবন্দ* (ঢাকা: সোনালি প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ১৮৫-১৮৬

৬ *বাংলাদেশের খ্যাতনামা 'আরবী বিদ*, পৃ. ৯

প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে এবং সেগুলো থেকে হাজার হাজার বিজ্ঞ আলিম, ফাজিল, কামিল ও 'আরবী বিদ তৈরি হয়। যারা 'আরবী ভাষায় অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেন। ফলে বাংলাদেশে অপ্রতিরোধ্য গতিতে 'আরবী চর্চা হতে থাকে। আরব বণিক ও মুবাল্লিগদের মাধ্যমে যে 'আরবী চর্চার শুভসূচনা হয় তা ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজির বঙ্গবিজয়ের মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে এবং বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মানুষের কাছে অল্প সময়ের মধ্যেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ফলে 'আরবী চর্চা হতে থাকে দ্রুত গতিতে, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক কারণে কোনো কোনো সময় 'আরবী চর্চায় বাধাগ্রস্ত হলেও কোনো সময় থেমে থাকেনি। মর্যাদা ও গতিশীলতার সাথে ক্রমেই উন্নতির দিকে ধাবিত হয়। এর পিছনে উল্লেখযোগ্য কারণ হলো 'আরবী ভাষা ইসলাম ধর্মের ভাষা হওয়া। ইসলাম 'আরবী ভাষাকে আন্তর্জাতিক ভাষায় উন্নীত করেছে এবং এর মূল উৎস কুরআন ও হাদীস এ ভাষাতেই রচিত ও সংরক্ষিত। মুসলিম মাত্রই এ ভাষার সঙ্গে কমবেশি পরিচিত। তাই বাংলাদেশসহ মুসলিম বিশ্বের সর্বত্রই 'আরবী চর্চার প্রতি এত আগ্রহ। মধ্যপ্রাচ্যের সাথে এদেশের অধিবাসীদের ধর্মীয়, রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক অধিকতর ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক চুক্তির মাধ্যমে বহুসংখ্যক বাংলাদেশি মধ্যপ্রাচ্যে চাকরি লাভ করে থাকেন। এ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশে 'আরবী চর্চার নতুন অভিযাত্রা হয়। দেশের বিভিন্ন স্থানে 'আরবী ভাষা শিক্ষার জন্য অনেক 'আরবী শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠে। এগুলোতে ব্যাপকভাবে 'আরবী চর্চা হচ্ছে। নতুন 'আরবী -বাংলা অভিধানও প্রকাশিত হয়েছে। এমনকি বাংলাদেশ থেকে 'আরবী পত্রিকাও প্রকাশিত হয়।[১] বাংলাদেশে ইসলামের আগমনকাল থেকে নিয়ে বর্তমানকাল পর্যন্ত মোট আটশত বছর ধরে বিভিন্নভাবে 'আরবী র চর্চা হয়ে আসছে। যা বর্তমানে একটি আন্দোলনে রূপ নিয়েছে। এ উপমহাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বেই মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ইসলামি তথা 'আরবী শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে ওঠে। সেগুলোর মধ্যে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ে বাগদাদের দরসে নিজামিয়ার।[২] দিল্লিতে অবস্থিত মাও. আবদুর রহীমের মাদরাসা শিক্ষা, পরবর্তীতে শাহ ওয়ালিউল্লাহর শিক্ষাব্যবস্থা, লখনৌতে নিজামুদ্দীন সিহালবীর দরসে নিজামিয়া প্রবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের

---

১ আন্তর্জাতিক খ্যাতনামা ইসলামি চিন্তাবিদ মাও: আবুল কালাম মোহাম্মদ ইউসুফ এর সম্পাদনায় ঢাকা মগবাজার দারুল আরাবীয়া থেকে 'আল হুদা' নামক একটি 'আরবী মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

২ দরসে নিজামিয়া; বাগদাদ: সিলজুকী আমলেখ্রি.াম ও খ্রি.ক সাহেবের স্বনামধন্য মন্ত্রী নিজামুল মূলক আল (১০৫-১০৬৭) দুই দিন ইরাকের রাজধানী বাগদাদে নিজামিয়া নামে একটি আন্তর্জাতিক মানের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠানটি দুইশত বছর ধরে 'আরবী, ইসলামি ও জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা বিস্তারে ভূমিকা পালন করে। এতে যে শিক্ষা পদ্ধতি ও সিলেবাস অনুসৃত হয়, তারই আলোকে সিলেবাস প্রণয়ন করে যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা হয় তাকে দরসে নিজামিয়া নামে অভিহিত করা হয়।

‘আরবী শিক্ষার উপর বাগদাদের দরসে নিজামিয়া গভীর প্রভাব ফেলে। সুতরাং বাংলাদেশে ‘আরবী শিক্ষাচর্চা ও বিকাশে বাগদাদের দরসে নিজামিয়ার প্রভাব অনস্বীকার্য।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : 'আরবী ভাষার চর্চা ও বিকাশ

উপমহাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকে ব্রিটিশপূর্ব যুগ পর্যন্ত 'আরবী চর্চা ও বিকাশের কালকে পাঁচটি যুগ বা ভাগে ভাগ করা যায়।[১]

প্রথম যুগঃ এ যুগটি খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত দুই শতাধিক বছর স্থায়ী ছিল। এসময় মাদরাসাগুলোতে সরফ, বালাগাত, ফিকহ, উসুলে ফিকহ, তাফসির, হাদীসসহ প্রভৃতি ধর্মীয় গ্রন্থাদি পড়ানো হত।

দ্বিতীয় যুগঃ এ যুগটি ষোড়শ শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে সপ্তদশ পর্যন্ত বিস্তৃত। এ যুগের সিলেবাস প্রথম যুগের সিলেবাসের ন্যায় ছিল। দ্বিতীয় যুগে উপমহাদেশে 'আরবী সাহিত্য শিক্ষা তেমন প্রসার লাভ করেনি।

তৃতীয় যুগঃ এ যুগ খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দি থেকে অষ্টাদশ শতাব্দি পর্যন্ত বিস্তৃত। এ যুগে সিলেবাসের কিছু পরিবর্তন সাধিত হয় এবং 'আরবী সাহিত্য শিক্ষা বেশ প্রসারিত হয়।

চতুর্থ যুগঃ এ যুগ শুরু হয় অষ্টাদশ শতাব্দিতে, যার স্রষ্টা হলেন মোল্লা নিজামুদ্দীন সিহালবি। তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এ যুগে 'আরবী শিক্ষা আশাতীত প্রসার লাভ করে। তিনি সিলেবাসে ব্যাপক পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেন। সিলেবাসে নতুনভাবে যুক্ত করেন *মীযান, মুনশাঈব, সরফ, ফুসুল-ই-আকবরী, কাফিয়া, নহবেমীর, শারহু মিআতি আমিল, হিদায়াতুন নাহু, শরহ-ই জামী* প্রভৃতি। এ যুগে প্রণীত দরসে নিজামীয়া উপমহাদেশের 'আরবী শিক্ষার উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে।

পঞ্চম যুগঃ এ যুগকে মুসলিম শাসনের পতনের যুগ বলা হয় (১৭৫৭-১৮৫৭ খ্রি.)। 'আরবী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর এ সময়ে পতন ঘটে। ব্রিটিশ শাসনামলে মুসলমানরা নির্যাতিত হতে থাকে এবং তারা তাদের অর্জিত গৌরব হারিয়ে ফেলে। তাই এ যুগে ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে লখনৌর দরসে নিজামিয়ার পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সিলেবাস চালু করা হয়। তারা পূর্বের সিলেবাসের সাথে 'আরবী সাহিত্যের পাঠ্যপুস্তক অন্তর্ভুক্ত করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো *নাফহাতুল ইয়ামন, আস-সাবউল মুআল্লাকাহ, দিওয়ান-ই-মুতানাব্বী, মাকামাতা-ই- হারীরী, হামাসাহ* প্রভৃতি। এখানে লক্ষণীয় যে, দরসে নিজামিয়ার যেসব গ্রন্থ পাঠ্যভুক্ত ছিল, সেগুলোর অধিকাংশই 'আরবী ভাষায় রচিত। ইংরেজদের শাসনামলে বিশেষ করে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে সরকারিভাবে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে 'আরবী শিক্ষার কোনো সুযোগ ছিল না। সে সময় যতটুকু 'আরবী ভাষা ও সাহিত্যচর্চা হয়েছে তা একান্ত ব্যক্তিগণ ও সামাজিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে।[২] অনেকেই 'আরবী শিক্ষার প্রতি আগ্রহ

---

১ *বাংলাদেশের খ্যাতনাম 'আরবী বিদ*, পৃ. ১২

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

হারিয়ে ফেলে। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দির শুরুর দিকে কবি ও সাহিত্যিকগণের 'আরবী চর্চার আগ্রহ অপ্রত্যাশিতভাবে বৃদ্ধি পায়। এসময় মুদ্রণ প্রক্রিয়া ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে কবি ও সাহিত্যিকদের মাঝে 'আরবী সাহিত্যচর্চা ও রচনাবলি প্রকাশের সুযোগ সুবিধা লাভ করেন। ফলে 'আরবী সাহিত্যচর্চার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। কিন্তু বিশ শতকের গোড়ার দিকে (১৯১৫ খ্রি.) নিউ স্কিম মাদরাসা প্রবর্তনের ফলে বাংলাদেশে 'আরবী সাহিত্যচর্চার অগ্রগতি সাধিত হয়। চলতে থাকে এ শতাব্দির মাঝামাঝি পর্যন্ত। ১৮৭৪ খ্রি. বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর ক্যাম্পবেলের প্রচেষ্টায় মুহাসিন ফান্ডের অর্থে ঢাকা চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে একটি করে মাদরাসা স্থাপিত হয়। এসব মাদরাসার প্রত্যেক শ্রেণিতেই 'আরবী সাহিত্য পাঠ্যভুক্ত ছিল। এখানে 'আরবী সাহিত্য পড়ানো হত হাদীস ও তাফসির শিক্ষার সহায়ক বিষয় রূপে। 'আরবী সাহিত্যের এমন বৈরী পরিবেশেও বাংলাদেশে জন্ম লাভ করে কিছুসংখ্যক কবি ও সাহিত্যিক। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন আলাউদ্দিন আল আজহারি, আবদুর রহমান কাশগাড়ি, মাও. মুসা, আবু নসর ওহীদ, মুফতি আমীমুল ইহসান প্রমুখ। নিউ স্কিম মাদরাসা প্রবর্তনের ফলে আধুনিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মুসলমানদের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। এ স্কীমে ড. এস এম হুসাইন, ড. সাজ্জাদ হোসেন, অধ্যাপক আ.ত.ম মুসলেহ উদ্দীনের ন্যায় খ্যাতনামা 'আরবী সাহিত্যিক সৃষ্টি হয়।[১] তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে 'আরবী ভাষা ও সাহিত্যচর্চা হয়।

বাংলাদেশে 'আরবী ভাষাচর্চার বিকাশ

এ কথা সর্বজনবিদিত যে, মাতৃভাষায় সাহিত্যচর্চা আর বিদেশি ভাষায় সাহিত্যচর্চা এক বিষয় নয়। উভয়ের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। বাংলাদেশে 'আরবী চর্চা ও বিকাশের ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ কিছু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অবদান রয়েছে। বাংলাদেশে 'আরবী র বিকাশ ধারা নিম্নোক্তভাবে সাধিত হয়:

- ব্যক্তিকেন্দ্রিক 'আরবীরচর্চা ও বিকাশ
- মসজিদকেন্দ্রিক 'আরবীরচর্চা ও বিকাশ
- মাদরাসাকেন্দ্রিক 'আরবীর চর্চা ও বিকাশ
- স্কুল, কলেজকেন্দ্রিক 'আরবীর চর্চা ও বিকাশ
- বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক 'আরবীর চর্চা ও বিকাশ

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০-৩১

- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক ‘আরবীর চর্চা ও বিকাশ
- বিভিন্ন পত্রপত্রিকার মাধ্যমে ‘আরবীর চর্চা ও বিকাশ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : 'আরবী চর্চায় 'আলেমসমাজ

বাংলাদেশে আলেম, ওলামা, মুহাদ্দিস, মুফতি, ইসলামিক পণ্ডিতদের সৃজনশীল মেধা, দাওয়াতি ও শিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কে আরব বিশ্বের পণ্ডিতদের তেমন ধারণা নেই বললেই চলে। তারা যখন বাংলাদেশে আসেন এ দেশের মাদরাসা, মুসলমান, আলেম-ওলামার দ্বীনি খেদমত দেখে অভিভূত হয়ে পড়েন। বাংলাভাষী আলেম স্কলারদের জীবনী নিয়ে 'আরবী তে উল্লেখযোগ্য কোনো গ্রন্থ রচিত না হওয়ায় এক্ষেত্রে একটি বিশাল শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশ ও উপমহাদেশের আলেম, ওলামা ও মাশায়েখদের মেধা, জীবন, কর্ম, অবদান ও সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে পৃথিবীবাসীকে জানানোর উদ্দেশ্যে ঢাকার জামিয়া রহমানিয়ার সিনিয়র মুহাদ্দিস ও প্রধান মুফতি আল্লামা হিফজুর রহমান (হাফি:) 'আরবী ভাষায় কলম ধরেছেন। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি 'আরবী চর্চা করতেন। করাচির নিউ টাউন মাদরাসায় তাখাসসুস কোর্স করার সময় আল্লামা রশিদ আহমদ নোমানির তত্ত্বাবধানে ইসলামি আইনগ্রন্থ 'হেদায়া'-এর 'আরবী ভাষায় ভূমিকা লেখেন যা পরবর্তীতে 'মা ইয়ামবাগি বিহিল ইনায়া, লিমান ইতালিউল হেদায়া' নামে প্রকাশিত হয়। এরই মধ্যে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে বাংলা ও 'আরবী তে ৭০টি গ্রন্থ রচনা করেন। এর মধ্যে ১৯টি 'আরবী ভাষায়। ১০ বছর পরিশ্রম করে তিনি 'আরবী ভাষায় ২৩ খণ্ডের প্রামাণ্য জীবনী বিশ্বকোষ তৈরি করেছেন। কায়রোর 'দারুস সালিহ' প্রকাশনী থেকে 'আল বুদুরুল মুজিয়্যাহ ফি তারাজিমিল হানাফিয়্যাহ' নামে এটি প্রকাশ পেয়েছে। এই বিশ্বকোষ ইমাম আবু হানিফা (র:) থেকে একবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত হানাফি মাজহাবের ইমাম, মুজতাহিদ, ফকিহ ও মুহাদ্দিসগণের জীবন ও কর্মসাধনার নির্ভরযোগ্য দলিল। বাংলাদেশের বহু ওলামা-মাশায়েখের বর্ণাঢ্য জীবনসাধনা ও অবদান এতে স্থান পেয়েছে। মিসরে আন্তর্জাতিক গ্রন্থমেলায় এই বিশ্বকোষ পাঠকমহলে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে বিশেষত আরব রাষ্ট্রগুলোতে বাংলাভাষী ওলামায়ে কেরামের পরিচয় তুলে ধরার ক্ষেত্রে তার অবদান ও কৃতিত্ব অসামান্য। ফিকহি পরিভাষার ওপর তার চার খণ্ডের আরেকটি গবেষণাগ্রন্থ পাঠকসমাদৃত হয়েছে। প্রতি খণ্ডে রয়েছে প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠা। যারা হাদীস ও ফিকহের ওপর বিশেষ কোর্স করে থাকেন, তাদের জন্য এটি একটি আকরগ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত।

আল্লামা মুফতি হিফজুর রহমান বাংলাভাষী দুই হাজার কীর্তিমান মনীষীর জীবন, কর্ম, সাধনা ও অবদান নিয়ে জীবনীকোষ তৈরি করেন 'আরবী ভাষায়। ২০২০ খ্রি. আট খণ্ডে এটি প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে বাংলাভাষী ২১৮৩ জন মনীষীর অমূল্য জীবনকথা। প্রায় চার হাজার পৃষ্ঠার যুগান্তকারী এই গ্রন্থের নাম 'আল ইয়াওয়াকিতু ওয়াল জাওয়াহের ফি তারাজিমি নুবালা-ই বাঙাল ওয়াল আকাবির'। সুদীর্ঘ ছয় বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে রচিত হয় এ

জীবনীকোষ। গ্রন্থটিতে অভিমত দিয়েছেন মিসরের বিশিষ্ট ফকিহ ও আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শায়খ মুহাম্মদ বিন জামালুদ্দিন আস-সুয়ূতি, দারুল উলুম দেওবন্দের বিশিষ্ট মুহাদ্দিস আল্লামা নেয়ামাতুল্লাহ আজমি ও আল্লামা হাবিবুর রহমান আজমি (মুহাম্মদ আল আমিন, আওয়ার ইসলাম, ঢাকা, ডিসেম্বর ০২, ২০২০)।

স্মর্তব্য, অন্যান্য বহুল প্রচলিত ভাষার মতোই 'আরবী একটি আন্তর্জাতিক ভাষা। পৃথিবীর প্রায় ২৯ কোটি মানুষ এই ভাষায় কথা বলে। মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার প্রায় ২৬টি দেশের রাষ্ট্রভাষা 'আরবী। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় ও আত্মার সম্পর্ক রয়েছে 'আরবী ভাষার সাথে। বহু আগে থেকেই বাংলাদেশি আলিমরা 'আরবী ভাষায় গ্রন্থ রচনা করে আসছেন। চট্টগ্রাম দারুল মা'আরিফের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক আল্লামা সুলতান যওক নদভি (র:) 'আরবী ভাষা ও সাহিত্যের এক প্রবাদপুরুষ। তার লিখিত 'আরবী ব্যাকরণ, রচনালিখন ও সাহিত্যবিষয়ক বহু গ্রন্থ কওমি মাদরাসা বোর্ডে পাঠ্যতালিকাভুক্ত। তার ভাষা প্রাঞ্জল ও সাবলীল। '*আস সুবহুল জাদিদ*' নামে একটি 'আরবী জার্নাল তার সম্পাদনায় বের হয়। আল্লামা সুলতান যওক নদভি (র:) ও হাসানুজ্জামান জালালুদ্দিন কর্তৃক জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জীবন ও কাব্যচর্চা নিয়ে লিখিত 'আরবী নিবন্ধ সৌদি আরবের জার্নালে ছাপা হয়েছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক আরবীচর্চা

বাংলাদেশে 'আরবীরচর্চা ও বিকাশে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েও 'আরবী ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে রয়েছে আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম ও দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯২১ খ্রি.): প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯২১ খ্রি. প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে ৯টি অনুষদ, ৮১টি বিভাগ ও ১০টি ইনস্টিটিউট রয়েছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে 'আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই চালু আছে। শামসুল উলামা আবু নসর ওহীদ এ বিভাগের পাঠ্যক্রম তৈরি করেন। করোনার স্টোন খ্যাত এ বিভাগটি বিংশ শতাব্দীর আশির দশকে 'আরবী বিভাগ ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ নামে দুটি স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। 'আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ উভয়বিভাগেই 'আরবী ভাষা ও সাহিত্য সংক্রান্তসহ নানা বিষয়াদি পাঠদান করা হয়ে থাকে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আরবী বিভাগের প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান লিখিত '*আরবী - বাংলা- 'আরবী অভিধান*, '*আরবী -বাংলা ব্যবহারিক অভিধান* এবং *দৈনন্দিন 'আরবী কথোপকথন* গ্রন্থগুলো ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে। রবীন্দ্রচর্চা নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আরবী বিভাগের চেয়ারম্যান ও প্রফেসর ড. যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হকে[১]র একটি 'আরবী

---

১. অধ্যাপক ড. যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের বর্তমান চেয়ারম্যান এবং একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও গবেষক। তিনি ১৯৭৬ খ্রি. কক্সবাজার জেলার ধরুলিয়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।। তাঁর পিতা মরহুম আবু মুহাম্মদ এজহারুল হক কক্সবাজারের জেলা শিক্ষা অফিসার ছিলেন। তাঁর মাতা মরহুমা বেগম রহিমা হক একজন নিরব বুযুর্গ ও পরহেযগার গৃহিনী ছিলেন। ড যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক চট্টগ্রামের বিখ্যাত ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদরাসা থেকে দাখিল ও আলিম পরীক্ষায় (প্রথম বিভাগ) অর্জন করেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবী বিষয়ে ১৯৯৬ খ্রি. অনার্স ও ১৯৯৭ খ্রি. মাস্টার্স (প্রথম শ্রেণিতে প্রথম) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি ২০তম বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তথ্য ক্যাডারের কর্মকর্তা হিসেবে জয়পুরহাটে ২০০১-২০০২ খ্রি. 'জেলা তথ্য অফিসার' হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৩ খ্রি. তিনি লেকচারার হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগে যোগদান করেন এবং ২০০৬ খ্রি. সহকারী অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। ২০১০ খ্রি. তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হতে পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর পিএইচ.ডির শিরোনাম ছিল "Perso-Arabic Elements in Chittagonian Bangla: A Linguistic Analysis" এরপর ২০১১ খ্রি. সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি লাভ করেন। ২০১৯ খ্রি. অধ্যাপক পদে পদোন্নতি লাভ করেন। ২০২৩ খ্রি. ২৩ মার্চ আরবী বিভাগের চেয়ারম্যানের আসন অলঙ্কৃত করেন। ব্যক্তিজীবনে তিনি বিবাহিত ও দুই পুত্রের জনক। তিনি আরবী ভাষা ও সাহিত্য ছাড়াও কুর'আন,

নিবন্ধ ইন্দোনেশিয়া থেকে প্রকাশিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক, ড. মুহাম্মদ আরশাদুল হাসান কর্তৃক '*হাজ্জাজ ইবন ইউসুফের অভিভাষণে 'আরবী সাহিত্যের উৎকর্ষ*' নিয়ে 'আরবীতে একটি গ্রন্থ ছাপা হয়েছে জার্মানি থেকে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৫৩ খ্রি.): ১৯১৭ খ্রি. স্যার মাইকেল স্যাডলারের নেতৃত্বে গঠিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন রাজশাহীতে একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করে। কিন্তু পূর্ব বাংলার মুসলিম রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও এলিটদের দাবির প্রেক্ষিতে ১৯২১ খ্রি. ১লা জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে বাংলার মানুষের উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মোচিত হয়। ফলে স্যাডলার কমিশনের সুপারিশ থাকা সত্ত্বেও আর কোনো বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি জোরালো হয়নি যার কারণে ১৯৪৭ খ্রি. ভারত বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিষয়টি চাপা পড়ে যায়। ভারত ও পাকিস্তান আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্র হওয়ার পর পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের জনগণের জন্য শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যথেষ্ট নয় বলে বিবেচিত হয়। সে কারণে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্টের মাধ্যমে ১৯৫৩ খ্রি. রাজশাহীতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৯৫৪-১৯৫৫ শিক্ষাবর্ষে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বাংলা, ইংরেজি, অর্থনীতি, ইতিহাস, দর্শন, গণিত, ভূগোল ও আইন এই ৮টি বিষয়ে পাঠদানের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের পদযাত্রা শুরু হয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন প্রফেসর ড. ইৎরাত হোসেন জুবেরী।[১]

বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়তন ৩০৩৮০ হেক্টর। এতে রয়েছে ৮টি অনুষদ, ৫টি ইনস্টিটিউট এবং ৪৭টি বিভাগ। আবাসিক হলের সংখ্যা ১৬টি, তন্মধ্যে ছাত্রদের জন্য ১১টি এবং ছাত্রীদের ৫টি। শিক্ষার্থী সংখ্যা প্রায় পঁচিশ হাজার।[২] এ বিশ্ববিদ্যালয়ে 'আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ প্রতিষ্ঠার পর থেকে ব্যাপকভাবে 'আরবী চর্চা হতে থাকে। এ বিভাগটি ১৯৯৫ খ্রি. 'আরবী বিভাগ ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ হিসেবে দুটি আলাদা বিভাগে হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এ বিভাগ দুটিতে 'আরবী ভাষা, 'আরবী সাহিত্য ও 'আরবী সাহিত্যের ইতিহাস প্রভৃতি বিষয় পাঠ্যভূক্ত রয়েছে। বিভাগ দুটির সহযোগিতায় একাধিক গবেষণা পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে যাতে 'আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে।

হাদীস, ইসলামের ইতিহাস এবং ফিকহ শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান রাখেন। এছাড়াও রাজনীতি, ক্রীড়াসহ সমসাময়িক নানান বিষয়ে তাঁর পান্ডিত্য রয়েছে। দ্র. গবেষক গত ২০-০১-২০২৫ খ্রি. আরবী বিভাগের অফিসে কর্মরত মুফতী মাসরুরুল হাসন কর্তৃক সংগ্রহ করেছেন।

১ *রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ডায়রী* (রাজশাহী জনসংযোগ দপ্তর, ডিসেম্বর, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ২

২ http. www.ru.ac.bd.com

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৬৫): চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬৫ খ্রি. প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬টি অনুষদ, ৩১টি বিভাগ ও ২টি ইনস্টিটিউট রয়েছে।[১] ১৯৭৫ খ্রি. 'আরবী ও ফারসি বিভাগ নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ প্রতিষ্ঠালাভ করে। বিভাগটি ২০০৫ খ্রি. 'আরবী বিভাগ ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ নামে দুটি আলাদা বিভাগ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।[২] 'আরবী বিভাগে 'আরবী ভাষা, সাহিত্য, ব্যাকরণ এবং 'আরবী সাহিত্যের ইতিহাসসহ অন্যান্য বিষয় পাঠদান করা হয়ে থাকে। এ বিশ্ববিদ্যালয় হতে গবেষণা পত্রিকা প্রকাশিত হয়। যাতে 'আরবী ভাষা ও সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রবন্ধ বের হয়।

ফিকাহশাস্ত্রের সূত্রাবলি ও মূলনীতি সম্পর্কে চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান ও জাতীয় সংসদ সদস্য প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নিজামুদ্দিন নদভির ৩০৮ পৃষ্ঠার একটি অনবদ্য গবেষণাকর্ম '*আল কাওয়ায়িদুল ফিকহিয়্যাহ ওয়াল উসুলিয়্যাহ ফি দুয়িল আহাদিসিন নাবাভিয়্যাহ*'। গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় কুয়েত আওকাফ অ্যান্ড ইসলামিক অ্যাফেয়ার্স অধিদফতর থেকে।

চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের চেয়ারম্যান ড. নাজমুল হক নদভি কবি ফররুখ আহমদের কবিতায় ইসলামি জাগরণের উপজীব্য নিয়ে গবেষণা নিবন্ধ রচনা করেন। এটি প্রকাশিত হয় সৌদি আরবের গবেষণা পোর্টাল 'আলুকাহ'-তে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আরবী বিভাগের প্রফেসর ড. নুরুল আমিন নুরী কর্তৃক 'হযরত আয়েশা (রা.)-এর তাফসির ও ফিকাহ গবেষণার পদ্ধতি' বিষয়ে লিখিত 'আরবী অভিসন্দর্ভ বৈরূত থেকে প্রকাশিত হয়েছে গ্রন্থাকারে।

ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া (১৯৮৫ খ্রি.): ১৯৮০ খ্রি. ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ অনুমোদন লাভের পর কুষ্টিয়া জেলার মাটিভাঙ্গার দুলালপুর নামক স্থানে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য স্থান নির্ধারণ করা হয়। ১৯৮২ খ্রি. উক্ত অধ্যাদেশ পরিবর্তন করে কুষ্টিয়া থেকে স্থানান্তর করে ঢাকার অদূরে গাজীপুরে ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। ১৯৯০ খ্রি. সরকারি নির্দেশে ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় পুনরায় কুষ্টিয়ায় স্থানান্তরিত হয়।[৩] বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫টি অনুষদ, ২০ টি বিভাগ ও ১টি ইনস্টিটিউট রয়েছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে 'আরবী ভাষা ও সাহিত্যচর্চাই বেশি হয়। এখানে 'আরবী বিভাগ ছাড়াও থিওলজি এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদের তিনটি বিভাগে 'আরবী ভাষার মাধ্যমে পাঠদান করা হয়ে থাকে। এ অনুষদ থেকে

---

১ *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা*, পৃ.৩৮৪

২ প্রাগুক্ত পৃ. ৩৮৫

৩ প্রাগুক্ত পৃ. ৩৮৬

একটি ষান্মাষিক 'আরবী গবেষণা জার্নাল ১৯৯৩ সাল থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হয়। 'আরবী কাব্য গদ্য, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি বিষয়ে এখানে পঠন-পাঠন ও গবেষণা পরিচালিত হচ্ছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ফাজিল ও কামিল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ফলে অধিকহারে 'আরবী চর্চা হচ্ছে এ বিশ্ববিদ্যালয় হতে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৯২ খ্রি.): ১৯৮৫ খ্রি. ৫ই নভেম্বর অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন অনুমোদনকারি বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে একটি রিপোর্ট প্রদানের জন্য অধ্যাপক কাজী আব্দুল লতিফের নেতৃত্বে ১০ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে। উল্লেখ্য যে, ড. কুদরত-ই-খুদা কমিশন ৭৪ অধিভুক্ত কলেজসমূহের অবস্থার পরিবর্তন, লেখাপড়ার মানোন্নয়ন, পর্যায়ক্রমে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রত্যেকটি প্রশাসনিক বিভাগে একটি করে অনুমোদন দানকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে। উক্ত সুপারিশ ব্যাপকভাবে আলোচনা পর্যালোচনাপূর্বক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ করে। সে মোতাবেক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯২ অধ্যাদেশ মূলে ঢাকা থেকে মাত্র ২৩ মাইল দূরে গাজীপুরে স্থাপিত হয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় সমগ্র বাংলাদেশের ডিগ্রি কলেজ, আইন কলেজ, শিক্ষা, সংগীত ও আর্টস কলেজগুলো রয়েছে। বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ৫টি ইনস্টিটিউট, ৪টি একাডেমিক ইউনিট এবং ১০টি ডিসিপ্লিন রয়েছে।[১] তন্মধ্যে ঢাকা, রাজশাহী, বগুড়া, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা, সিলেট অঞ্চলের বেশ কয়টি কলেজে 'আরবী ভাষা ও সাহিত্যের উপর অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স চালু রয়েছে। বর্তমানে এটি বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়েছে। উচ্চমাধ্যমিক ও ডিগ্রি পর্যায়েও 'আরবী বিষয়ে পাঠদান করা এবং সকল শ্রেণিতে 'আরবী ভাষা, সাহিত্য, ব্যাকরণ, 'আরবী সাহিত্যের ইতিহাস প্রভৃতি বিষয় পাঠদান করা হয়। ফলে অধিক হারে 'আরবী চর্চা ও বিকাশ লাভ করেছে।

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়: ১৯৯৩ খ্রি. বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন দেশে উচ্চশিক্ষা বৃদ্ধি ও বিশেষভাবে কর্মজীবীদের দক্ষতাবৃদ্ধিসহ উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ প্রদানের লক্ষ্যে একটি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (Open University) প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুপারিশ পেশ করে। এ লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির সমন্বয়ে ৫৮০ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটির সুপারিশের আলোকে ১৯৯২ খ্রি. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের অনুমোদনসাপেক্ষে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় গাজীপুরের পরিত্যক্ত ক্যাম্পাসেই উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ণোদ্যমে কার্যক্রম চালাচ্ছে। বর্তমানে

১ প্রাগুক্ত পৃ. ৩৮৬-৩৮৭; http. www.nu.ac.bd.com

এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬টি অনুষদ ও ১০টি বিভাগ রয়েছে।[১] এখানে ইসলাম শিক্ষা ছাড়াও 'আরবী ভাষা কোর্সে পাঠদান করা হয়ে থাকে।

আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম: আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম ১৯৯৫ খ্রি. প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪টি অনুষদ ও ৬টি বিভাগ রয়েছে। এখানে কুরআনিক সায়েন্স বিভাগ (Quranic Science) ও 'আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে 'আরবী মিডিয়ামে 'আরবী ভাষা ও সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ের উপর পাঠদান করা হয়ে থাকে।[২] এ বিশ্ববিদ্যালয় হতেও গবেষণা পত্রিকা প্রকাশিত হয় যাতে 'আরবী ভাষা ও সাহিত্যের উপর অনেক গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়টি 'আরবী সাহিত্যচর্চা ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়: দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯৩ খ্রি. বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়টিতে ৪টি অনুষদ ও ৬টি বিভাগ রয়েছে।[৩] এখানে দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ চালু রয়েছে। এ বিভাগে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি 'আরবী ভাষা ও সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার উপর পাঠদান করে থাকে। ফলে 'আরবী ভাষা এবং সাহিত্যচর্চা ও বিকাশ লাভ করছে প্রশংসনীয় গতিতে।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক 'আরবীচর্চা

বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে 'আরবী ভাষা ও সাহিত্যচর্চা ও বিকাশ লাভ করছে। নিচে সেসব প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো:

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড: বাংলাদেশে ৯টি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড রয়েছে। এ বোর্ডগুলোর অধীনে তৃতীয় শ্রেণি হতে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ইসলাম শিক্ষা ও 'আরবী বাধ্যতামূলক রয়েছে। আর একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি তথ্য উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে 'আরবী ও ইসলাম শিক্ষা ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে রয়েছে। ফলে এতে 'আরবী চর্চা ও বিকাশ লাভ করছে।।

বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি: বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি ১৯৭৪ খ্রি. প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অন্যান্য দেশে সেনা অফিসার প্রেরণের জন্য তৎকালীন সেনাপ্রধান 2G Nuruddin 15th BMA Long Course হতে ক্যাডেটদের জন্য 'আরবী ভাষাশিক্ষা বাধ্যতামূলক করেন। এখানে একটি অত্যাধুনিক Language Laboratory আছে এবং সেখানে ক্যাডেটরা অতি সহজে 'আরবী ভাষা শিক্ষা করতে পারেন।

---

১ প্রাগুক্ত।

২ http. www.iuc.ac.bd.com

৩ http. www. diu.ac.bd

পত্রপত্রিকা ও সাময়িকী: বাংলাদেশে 'আরবী চর্চা ও বিকাশে পত্রপত্রিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এসব পত্রপত্রিকার মধ্যে অন্যতম হলো স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ খ্রি. বিশিষ্ট 'আরবী বিদ আলাউদ্দিন আল আযহারী কর্তৃক প্রকাশিত *আস সাকাফাহ* সাময়িকীটি। পরবর্তীতে ১৯৭৬ খ্রি. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ *মাজাল্লাতুল মুআসসাসা আল ইসলামিয়্যাহ* নামে একটি 'আরবী সাময়িকী প্রকাশ করেন, কিন্তু আশির দশকের শেষের দিকে তা বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৮০ খ্রি. থেকে চট্টগ্রামের দারুল মাআরিফ-এর পরিচালক মাওলানা সুলতান যওকের সম্পাদনায় '*আস সুবহুল জাদিদ*' নামে একটি 'আরবী ত্রৈমাসিক পটিয়া থেকে প্রকাশিত হয়। ঢাকার দারুল মায়ারিফ থেকে '*ইকরা*' নামে একটি 'আরবী সাময়িকী প্রকাশিত হয় । ১৪১২ হিজরির জিলহজ মাস হতে ঢাকার আশরাফবাদ থেকে '*আল কলম*' নামে একটি 'আরবী পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৯৯৫ খ্রি. থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আরবী বিভাগ হতে '*আল বারকুল জাদীদ*' নামে একটি 'আরবী ত্রৈমাসিক প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামির সিনিয়র নায়েবে আমীর মাওলানা একিউএম ইউসুফের সম্পাদনায় ঢাকা মগবাজার হতে 'আল হুদা' নামের উন্নত মানের 'আরবী মাসিক *নিয়মিত* পত্রিকা প্রকাশিত হয়।[১] এছাড়া *দৈনিক সংগ্রাম*, *নয়াদিগন্ত*, *জনকণ্ঠ*, *যুগান্তর*, সাপ্তাহিক *সোনার বাংলা*, সাপ্তাহিক *আরাফাত*, *মাসিক পৃথিবী*, *মাসিক মদিনা*, *মাসিক ছাত্রসংবাদ*, *মাসিক আত-তাহরীক*সহ বিভিন্ন স্থানীয় ও জাতীয় ও অনলাইনভিত্তিক পত্রিকার সাহিত্যপাতায় 'আরবী ভাষা ও সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর কবিতা প্রবন্ধ ও নিবন্ধ বিভিন্ন সাময়িকী-কড়চায় প্রকাশিত হয়ে থাকে। ফলে এ সবের মাধ্যমে 'আরবী সাহিত্য বিকশিত হয়।

বাংলাদেশ বেতার: 'আরবী চর্চা ও বিকাশে বাংলাদেশ বেতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বাংলাদেশ বেতার বহির্বিশ্ব কার্যক্রমের আওতায় রাত ১০টায় 'আরবী সংবাদ পাঠের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আরবী বিভাগের অধ্যাপক ড. আ. ন. ম. আবদুল মান্নান খান ও অধ্যাপক ড. ফজলুর রহমান নিয়মিত 'আরবী সংবাদ পাঠ করতেন।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ: বাংলাদেশে 'আরবী ভাষা ও সাহিত্যচর্চা, গবেষণা ও বিকাশে ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশের রয়েছে প্রশংসনীয় ভূমিকা। ১৯৮৩ খ্রি. থেকে এখানে 'আরবী ভাষা কোর্স চালু আছে। বর্তমানে এখানে একটি শক্তিশালী অনুবাদ বিভাগ রয়েছে। এ বিভাগ থেকে দেশের প্রখ্যাত অনুবাদকদের মাধ্যমে বহু 'আরবী ও ধর্মীয় গ্রন্থাদি বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রকাশনা বিভাগ অত্যন্ত সম্ভার। এ প্রকাশনা বিভাগ থেকে 'আরবী সাহিত্যের কিছু বই মুদ্রিত হয়েছে। এ ছাড়া ইসলামিক

১ *বাংলাদেশের খ্যাতনামা 'আরবী বিদ*, পৃ. ৩৫

ফাউন্ডেশন গবেষণা পত্রিকার 'আরবী ভাষা ও সাহিত্যসংক্রান্ত বহু গবেষণাপ্রবন্ধ প্রকাশিত হয় এবং এ ধারা অব্যাহত রয়েছে।

বাংলা একাডেমি: 'আরবী সাহিত্যচর্চা ও গবেষণায় বাংলা একাডেমির রয়েছে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। বাংলা একাডেমির তত্ত্বাবধায়নে 'আরবী সাহিত্যের ইতিহাস ও 'আরবী -বাংলা অভিধানসহ 'আরবী সাহিত্যসংক্রান্ত বেশকিছু বই মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্র। মুসলমানদের ধর্মীয় ভাষা 'আরবী হওয়ায় এদেশের আনাচে-কানাচে স্বতঃস্ফূর্তভাবে 'আরবী র চর্চা হচ্ছে প্রতিনিয়ত। এজন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অসংখ্য মসজিদ, মাদরাসা, মক্তব, ফোরকানিয়া, হাফিজিয়া, কওমি, দরসে নিজামিয়া এবং আলিয়া মাদরাসা। এসব প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেছে অসংখ্য আলিম ও 'আরবীবিদ। এছাড়াও স্থাপিত স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও ব্যাপকভাবে 'আরবী চর্চা হয়। ফলে 'আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিকশিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। সরকারি, বেসরকারি, ব্যক্তিগণ, বাণিজ্যিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কারণেও বাংলাদেশে 'আরবী চর্চা ও বিকাশের ধারা সামনের দিকে ধাবমান। যার গতি প্রতিনিয়ত বাড়তেই থাকবে।

সৌদি আরবের বাংলাদেশ দূতাবাসের কর্মকর্তা ড. সাদিক হোসেনের রচিত আটটি 'আরবী নিবন্ধ ভারতের নদওয়ার 'আল বাআছুল ইসলামি', রিয়াদের 'রাবিতাতুল আদব' ও মরক্কোর 'আল-মিশকাত' জার্নালে ছাপা হয়েছে। আয়েশা সিদ্দিকা আল আতিয়্যা নামের বাংলাদেশী শিক্ষার্থী কাতার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'চাটগাঁইয়া বাক্যগঠনে 'আরবী শব্দের প্রয়োগ' শিরোনামে 'আরবীতে থিসিস রচনা করে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : মসজিদ ও মাদরাসা কেন্দ্রিক 'আরবীচর্চা

বাংলাদেশে 'আরবীর চর্চা ও বিকাশে মসজিদকেন্দ্রিক মক্তবগুলোর ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ইসলাম ও মুসলিম সমাজব্যবস্থা মূলত মসজিদকেন্দ্রিক। মসজিদই হলো ইসলামি সমাজব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র। মানুষের ব্যক্তিগণ বিষয় থেকে শুরু করে সামাজিকতা, অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, আধ্যাত্মিকতা সকল কিছুই ইসলামের আওতাধীন। আর একজন মুসলিমের জীবনে এসব কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় মসজিদকে কেন্দ্র করেই। তাই মুসলিম সমাজের জীবন মূলত মসজিদের সাথে সুসম্পর্কিত। সুতরাং মসজিদ শুধুমাত্র সিজদার স্থান নয় বরং মানব জীবনের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনের সার্বিক দিক নির্দেশনার কেন্দ্রবিন্দু। মসজিদের গুরুত্ব বিবেচনা পূবর্ক মহানবি (সা.) হিজরতের পর মদিনায় মুসলিম সমাজের কাঠামো গড়ে তোলার জন্য সর্বপ্রথম মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যেটি ইসলামের ইতিহাসে মসজিদে নববি নামে প্রসিদ্ধ।[১]

আবূ মুসা আল আশয়ারী (রা.)-এর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, ফজরের নামাজের পর আমরা সবাই রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে বসে যেতাম। আমাদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ কুরআন শিক্ষা করত, কেউ কেউ দ্বিনের বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাগ্রহণ করত, আবার কেউ কেউ স্বপ্নের তাবির জেনে নিত।[২] এভাবেই মসজিদে দ্বিনী চর্চার মধ্যদিয়ে 'আরবী চর্চা হত কেন্দ্রিয়ভাবে। আল্লামা শিবলী নোমানী বলেন, পবিত্র মদিনার তৎকালীন মসজিদ ই নববী ইসলামের পূর্ণাঙ্গ দরসগাহ ছিল এবং এটাই আল্লাহতায়ালার ইবাদতের স্থান ও জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রাণকেন্দ্র ছিল। পবিত্র মদিনাতে ইসলামের তা'লিম ও ইরশাদের বিভিন্ন রূপ প্রদ্ধতি প্রচলিত ছিল। তন্মধ্যে একটি পদ্ধতি ছিল এই যে, বিভিন্ন গোত্রের কিছু লোক ১০/২০ দিন অথবা এক দুইমাস ধরে মদিনার মসজিদে নববিতে অবস্থান করে ধর্মীয় জ্ঞান ও প্রয়োজনীয় মাসআলা মাসায়েল সংক্রান্ত জ্ঞানার্জন করে স্বগোত্রে ফিরে গিয়ে প্রয়োজনীয় স্থানে মসজিদ নির্মাণ করে সেখানে অনুরূপ শিক্ষা দিত। আরেকটি পদ্ধতি ছিল স্থানীয় কিছু লোক মসজিদে নববিতে বসে বসে শিক্ষা গ্রহণ করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে তালিমের ব্যবস্থা করে জনগণের নিকট দ্বীনের আহবান পৌঁছে দিত।[৩] এভাবেই রাসুল (সা.) এর যুগে ইসলামের বাণী প্রচার হতে থাকে একই সাথে বিশুদ্ধ 'আরবী চর্চা হতে থাকে। এভাবে মসজিদে নববির অনুকরণে মদিনার উপকণ্ঠে মুসলমান বৃদ্ধির সাথে সাথে মসজিদ ও বৃদ্ধি পেতে থাকে। কুরআন নাযিলের সাথে

---

১ ড. মোঃ আবদুস সাত্তার, *বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তার প্রভাব* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ৫০

২ প্রাগুক্ত পৃ. ৫১

৩ আল্লামা শিবলী নোমানী, *সীরাতুন্নবী (সা.)*, ২য় খণ্ড (আযমগড়: দারুল মুছান্নেফিন, ১৯৮৯ খ্রি.), পৃ. ৮৮

সাথে সাহাবিদের মুখস্থ করাতেন এবং সেগুলো আবার চামড়া, হাড়, গাছের পাতা, পাথর ইত্যাদির উপর লেখাতেন। হযরত যায়িদ বিন সাবিত সেগুলো পরবর্তীতে খলিফা আবু বকর (রা.)-এর আমলে গ্রন্থাকারে লিপিবন্ধ করেন।[১] আবু বকর (রা.) শাসনভার গ্রহণের প্রাথমিক পর্যায়ে 'মুরতাদদের মুকাবিলা করার পর ইসলামি শিক্ষার প্রতি মনযোগী হন। তিনি রাসুল (সা.)-এর অনুকরণে মসজিদভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা আরও প্রসার ঘটান।[২] ১০০ তাঁর ওফাতের পর হযরত উমার ফারুক (রা.) ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা তখন নতুন নতুন এলাকা বিজিত হয়। সে অঞ্চলগুলোতে প্রতিষ্ঠিত হয় নতুন মসজিদ। তিনি মুসলিমদের কুরআন শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছেন। মসজিদভিত্তিক ক্বারি ও মুতাওয়ারি নিয়োগ করে দেন। তারা পাঠদানের সাথে লেখার পদ্ধতি শিক্ষা দিত। লোকেরা যাতে সঠিক মাখরাজ ও ইরানের সাথে কুরআন তেলাওয়াত করতে পারে সেজন্য 'আরবী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক করে ফরমান জারি করেন।[৩]

উমার (রা.) এরপর উসমান (রা.) (৬৪৪-৬৫৩) খিলাফতের দায়িত্বকালে ইসলামি সাম্রাজ্যে কুরআনিক শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে পূর্ববর্তী খলিফাদের অনুকরণে তিনি মসজিদে মসজিদে কুরআন হাদিসের শিক্ষার ব্যবস্থা সুদৃঢ় করেন।[৪] কুরআনের ব্যাখ্যা ভালোভাবে বোঝার জন্য 'আরবী কবিতা শিক্ষার ব্যবস্থাও করেন। উসমান (রা.) এর ওফাতের পর আলী (রা.) (৬৫৬-৬৬৯ খ্রি.) এর শাসনামলে 'আরবী ও ইসলাম শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটে। তিনি মক্কা ও মদিনার বাহিরে সিরিয়া, কুফা, বসরা প্রভৃতি স্থানে মসজিদ ও মসজিদের বাহিরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে 'আরবী ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব ও দর্শনের চর্চাসহ হস্তলিপি, আবৃত্তি ও কাব্যচর্চার প্রভূত উন্নতি সাধন করেন।[৫] উমাইয়া খিলাফাতকালে মসজিদভিত্তিক শিক্ষা সম্প্রসারিত হয়। এর পাশাপাশি শিক্ষার বিভিন্ন শাখায় ব্যাপক উন্নতি লাভ করে। উমাইয়া খিলাফতের পর আব্বাসীয় খিলাফতকালে মহানবি (সা.)-এর প্রতিষ্ঠিত মসজিদে নববির মসজিদগুলোতে ইমাম ও কারিগণ 'আরবী ও ইসলামচর্চায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করত।

---

১ মোঃ আকরাম খাঁ, *মোস্তফা চরিত* (কলিকাতা। নবজাতক প্রকাশন, ১৯৮৭), পৃ. ৪০৬

২ ড. মোহাম্মদ মুস্তাফিযুর রহমান, *জান পরিচিতি* (ঢাকা: নুবালা পাবলিকেশন, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ১২; মুফতী আমিমুল ইহসান, অনুবাদ: মাও. শরীফ মো. ইউসুফ, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস* (ঢাকা: ইসলামী একাডেমি, ১৪১১ হি.), পৃ. ২

৩ মুফতী মোহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ, *কুরআন সংকলনের ইতিহাস* (ঢাকা: দারুল ইফতা ও গবেষণা পরিষদ, ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ২২৫-২৫৭

৪ *বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তার প্রভাব*, পৃ. ৫৯।

৫ ড. মোহাম্মদ আজাহার ও হোসনে আরা বেগম, *মুসলিম শিক্ষা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ২৬১; *বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তার প্রভাব*, পৃ. ৬৫-৭১

আব্বাসীয় শাসনামলকে জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার স্বর্ণযুগ বলা হয়। মূলত এ যুগেই শিক্ষার মান অনুসারে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণীত হয়।[১] এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অসংখ্য মসজিদ আর মসজিদকেন্দ্রিক গণশিক্ষার কেন্দ্র। এসব মসজিদে কোমলমতি শিশু ও বয়স্কদের কুরআনিক জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়। ফলে সরকারি ও বেসরকারিভাবে মসজিদগুলোতে ইসলাম শিক্ষা ও 'আরবী চর্চা বিকাশ লাভ করে। বাংলাদেশ তথা এ ভারতীয় উপমহাদেশে যখন কোন মাদরাসা ছিল না তখন মসজিদই একমাত্র ইসলামি ও 'আরবী চর্চার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে পরিগণিত হতো। মোঘল শাসন আমলে বা এর পরবর্তীতে রাজধানী ঢাকা শহরে ৫০৭ টি মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়।[২] এছাড়া ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের উদ্যোগে মসজিদভিত্তিক শিক্ষা ও গণশিক্ষা প্রকল্পের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে 'আরবী চর্চা হচ্ছে। ২৬শে ডিসেম্বর, ২০০৮ সাল পর্যন্ত মোট ৪১ লাখ ৩৯ হাজার ১০ জনকে এ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। দেশের ৪৮৭টি উপজেলায় এ প্রকল্পের কাজ বর্তমানে চলমান রয়েছে। ২০১১ সাল পর্যন্ত ২৪ হাজার প্রাক প্রাথমিক কেন্দ্রে ১১ লাখ ৭০ হাজার শিক্ষার্থীকে বয়স্ক শিক্ষা দেওয়া হয়।[৩] এ সকল কেন্দ্রে 'আরবী র পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি ও অংকের ধারণাও দেওয়া হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) এর আমল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত মসজিদসমূহ 'আরবী চর্চা ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের মসজিদ গুলো 'আরবী চর্চা ও বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশে দুই ধারার শিক্ষানীতি চালু থাকায় ধর্মহীন শিক্ষানীতিতে কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা লাভের কোন সুযোগ থাকে না। ফলে মসজিদকেন্দ্রিক মক্তব, জুমআর খুতবা, সাপ্তাহিক দরস ইত্যাদির 'আরবী চর্চা ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

মাদরাসা কেন্দ্রিক 'আরবীচর্চা ও বিকাশ

মাদরাসা শিক্ষার মূল উৎস হলো কুরআন ও হাদীস। পবিত্র কুরআন ও হাদিসের বিস্তৃত জ্ঞান নিয়েই ইসলামি শিক্ষার সূচনা হয়। আর ইসলামি শিক্ষা অনানুষ্ঠানিক, উপ-আনুষ্ঠানিক এবং আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ধারা পার হয়েই মাদরাসা শিক্ষার শুভসূচনা হয়। মাদরাসা শব্দটি দারস (درس) অর্থ- শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ থেকে এসেছে। এটির একবচন মাদরাসা আর বহুবচন মাদারিস। সে হিসেবে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার স্থানকে 'আরবী তে মাদরাসা বলা হয়।[৪]

---

১ *বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তার প্রভাব*, পৃ. ৬৫-৭১

২ Dr. syed Mahmudul Hasan, *Dhaka The City of mosques* (Dhaka: is Lanie foundation Bangladesh 2nd Edition, 2002), p. 58-89

৩ www.lamic foundation.org bd

৪ *ইসলামী বিশ্বকোষ*, সম্পাদনা পরিষদ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ৩২৫

মাদরাসা শিক্ষা বলতে বোঝায় কুরআন ও হাদীসভিত্তিক শিক্ষা।[১] ৬১০ খ্রিস্টাব্দে মহানবি (সা.)-এর নবুয়ত লাভ পর্যন্ত মক্কায় কোনো মাদরাসা বা শিক্ষা নিকেতন ছিল না। মহানবি (সা.)-এর প্রতি আল্লাহতায়ালা ওহি নাজিল করলে প্রথমে তিনি নিজে মুখস্থ করতেন, সাহাবিদেরকে মুখস্থ করাতেন। সে সময় একদল কাতিবে ওহি ছিলেন যারা ওহি লিপিবদ্ধ করার কাজ করতেন।[২] সে সময় এভাবেই অনানুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষাদান পদ্ধতি শুরু হয়। এভাবেই দ্বিনের দাওয়াত ও শিক্ষা ক্রমান্বয়ে প্রচার এবং প্রসার লাভ করে। দ্বিনি শিক্ষার প্রচার এবং প্রসারের ফলে ক্রমান্বয়ে ইসলাম গ্রহণকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলে শিক্ষাদানের গুরুত্ব আরো বহুলাংশে বেড়ে যায়। ফলে অনানুষ্ঠানিকতা থেকে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তখন আবু বকর (রা.) প্রথমে তাঁর বাড়ির সামনে মসজিদ তৈরি করে সেখানে নামাযের পর কুরআনের দারস চালু করেন। এটি ছিল মক্কার প্রথম তা'লিমী মাদরাসা।[৩] উমার (রা.)-এর বোন ফাতিমার গৃহে মহিলাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থায় কুরআনের তালিম দেওয়া হত। সেখানে কুরআন তিলাওয়াত দেখে উমার (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। এটি ছিল ইসলামের ইতিহাসে দ্বিতীয় উপ-আনুষ্ঠানিক মাদরাসা।[৪] উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পর প্রথম আনুষ্ঠানিক মাদরাসা হলো সাফা পাহাড়ের পাদদেশের দারুল আরকাম মাদরাসা যার অধ্যক্ষ ছিলেন স্বয়ং মহানবি (সা.) আর ছাত্র ছিলেন আবু বকর (রা.), উমার (রা.), উসমান (রা.), আলী (রা.)সহ প্রথম শ্রেণির সাহাবিগণ।[৫] এছাড়া মদিনায় প্রথম প্রতিষ্ঠিত মসজিদ-ই-বনি-যুরায়েখ।[৬] দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠিত মসজিদ মাকামে কুবা মসজিদ মাদরাসা।[৭] মাদরাসা-ই-

---

১ প্রাগুক্ত পৃ. ৬২৫-৬২৬

২ ইবনে হিশান, *সিরাতুন্নবী (সা.)*, বঙ্গানুবাদ সম্পাদনা পরিষদ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৪ খ্রি. ।, খ. ২, পৃ ৭৭

৩ আবদুল খালেক, *সাইয়েদুল মুরসালিন* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯০ খ্রি.), পৃ. ১৭-১৮

৪ *সাইয়েদুল মুরসালিন*, পৃ. ১৫৩

৫ দারুল আরকাম বিন আবুল আরকাম প্রথম পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীদের মধ্যে অন্যতম। তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.) এর নির্দেশে সাফা পাহাড়ের পাদদেশে তাঁর নিজ বাড়িতে প্রথম আনুষ্ঠানিক মাদরাসা স্থাপন করেন। ইসলাম গ্রহণকারী নবীন ও প্রবীণ মুসলমানদেরকে দারুল আরকামে শিক্ষা দেয়া হতো। (দ্র. আবদুল মালেক ইবনে হিশাম বসরী, *সিরাত ইবনে হিশাম* (মিসর তা. বি.), পৃ. ১৪৪

৬ মসজিদ-ই-বনু যুরায়েখ মাদরাসা। এটা মদীনা নগরীর প্রাণকেন্দ্রে কার নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত। এখানকার প্রধান ইমান ও উত্তাল ছিলেন হযরত থাকে বিন মালিক আনসারী (রা)। এই মসজিদেই প্রথম নামায ও কুরআনের তালিম হয়। (দ্র. মো. আরকাম খাঁ, *মোস্তফা চরিত্র*, পৃ. ৪৫০)

৭ মাকামে কুবা মসজিদ মাদ্‌রাসা: এটি মদীনার উপকণ্ঠে ৬ মাইল দূরে 'মাকামে কুবা' নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত। হযরত ছালেম বিন যায় ইমাম ও অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি খুব সুন্দর করে কুরআন তেলাওয়াত করতেন। তার কুরআন মজীদ তেলাওয়াত শুনে মহানবী (সা) বলেন, আল্লাহ শুকরিয়া যে, আল্লাহ আমার উম্মতের মধ্যে ছালিমের মত একজন আলিম ও কারী তৈরি করেছেন। (দ্র. ড. মুহম্মদ হুসাইন হায়কল, *মহানবী (স.) এর চরিত্র*, অনুদিত মাওলানা আবদুল আউয়াল (ঢাকা) ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬ খ্রি.). ২

নাকিউল খাজামাত।[১] এ মাদরাসা গুলো শ্রেণি ও মান-গুণ দিক থেকে আকর্ষণীয় ছিল।[২] এরপর প্রতিষ্ঠিত হয় গামিমী তা'লিম মাদরাসা ও পরর্বীতে মসজিদ-ই-নববি মাদরাসা। এই মসজিদই নববীকে কেন্দ্রে করেই মুসলিম বিশ্বে জ্ঞান বিস্তারের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়।[৩] খুলাফায়ে রাশিদীন পরবর্তীতে এই মসজিদে নববীর শিক্ষাক্রম অনুযায়ী বিজিত এলাকায় বহু মসজিদ ও মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এ সমস্ত মাদরাসায় বিদগ্ধ সাহাবিগণ শিক্ষা দান করতেন। এ সময় মসজিদসমূহ ও বিশিষ্ট সাহাবিদের (রা.) বাড়ী শিক্ষায়তন হিসেবে ব্যবহৃত হয়।[৪] মাদরাসা প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় যুগ হলো উমাইয়া যুগে। এ যুগে তারা খোলাফায়ে রাশিদীনের রাশিদীনের শিক্ষার ধারাকে ত্বরান্বিত করেন। এ যুগের শিক্ষা কুরআন, হাদীস, তাফসির, ফিকহ প্রভৃতি বিষয়ের শিক্ষার পাঠ্যক্রম বিষয়বস্তু গ্রন্থবদ্ধ হতে থাকে। সব মসজিদ ও মসজিদসংলগ্ন চত্বরে মাদরাসা স্থাপিত হয়। সমগ্র সাম্রাজ্যের অনেক মসজিদকে সাধারণ শ্রেণির মাদরাসা এবং অনেক মসজিদ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়।[৫] পবিত্র মক্কায় আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) বহুসংখ্যক শিক্ষার্থীকে কুরআন, হাদীস, তাফসির, ফিকাহ, ফারায়েজ, 'আরবী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা দেন। আর মদিনায় রাযী আতুর রায়-এর মাদরাসায় উচ্চমানের শিক্ষা ও তালিমের কাজ অব্যাহত থাকে।[৬] হিজাজের পর ইরাক ছিল ইসলাম ও 'আরবী শিক্ষার দ্বিতীয় প্রাণকেন্দ্র। কৃষ্ণ নগরীতে ইমাম শাফেয়ি এবং বসরা নগরীতে ইমাম হাসান বসরির (রা.) এবং তাঁর মাদরাসা বিশেষ গুরুত্ব ও মর্যাদার অধিকারী ছিল।[৭] ইসলামি সংস্কৃতির পথ প্রদর্শক হিসেবে সর্বপ্রথম দামেশক নগরীকে শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেন। সে সময় প্রাথমিক মাদরাসা বা ইবতেদায়ি মাদরাসাসমূহ মসজিদে অথবা মসজিদের বারান্দায় অথবা মসজিদ সংলগ্ন চত্বরে আসর বসত।[৮] মাদরাসা শিক্ষারব্যবস্থার তৃতীয় যুগ শুরু হয় আব্বাসীয় খিলাফত কালে। এ যুগে মুসলিম শাসকরা রাজ্য দখলের চেয়ে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা বেশি ভূমিকা পালন করেন। এ সময় তারা জ্ঞানবিজ্ঞানের আবিষ্কার গবেষণা পরিচালনায় বিশ্বসভ্যতায় অবদান রাখতে সক্ষম হন।[৯] তাদের আমলেই প্রসিদ্ধ ইসলামি

---

১ মাদরাসা-ই-নাফিউল খাজামাত। এটি মদীনায় প্রতিষ্ঠিত তৃতীয় মসজিদ। মদীনার আনুমানিক ৯ মাইল দক্ষিণে নাফিউল খাজানাত নামক স্থানে আসাদ বীন যুরায়জ (রা.) এর বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত। হযরত মুসআব বিন উমায়ের ইমামতি করতেন এবং পাঠদান করতেন। (দ্র. ড. মুহাম্মাদ হুসাইন হায়কাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩)।

২ *মহানবী (সা.) এর জীবন চরিত্র*, পৃ. ২৮৪

৩ শিবলী নোমানী, *সীরাতুন্নবী (সা.)* (আজমগড়: দারুন মুয়াল্লিফীন, ১৯৮৯ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৮৮

৪ *ইসলামী বিশ্বকোষ*, খ. ১৭শ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৮

৫ মাওলানা আবদুস সাত্তার, *আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস*, পৃ. ২১-২২

৬ আহমাদ আমীন, *হিলাল-ই-ইসলাম*, (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, ১৯৭৫ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৫০

৭ প্রাগুক্ত পৃ. ৫০-৫১

৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

৯ ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *ইসলামের ইতিহাস* (ঢাকা: গ্লোব লাইব্রেরী লি., ১৯৭৫ খ্রি.) খ. ১, পৃ. ৫৭৬

চিন্তাবিদ ও সাহাবি ইমামদের আবির্ভাব ঘটে। আব্বাসীয় যুগেই মূলত শিক্ষার মান অনুসারে প্রথম শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণীত হয়। শিক্ষাধারাকে ১. প্রাথমিক ২. মাধ্যমিক ও ৩. উচ্চ শিক্ষা এই তিন স্তরে বিন্যাস করা হয়।[১] মাদরাসা শিক্ষার গুণাগুণ ও পরিবেশগত মান উন্নয়নের জন্য মাদরাসা ভবণ নির্মাণের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হয়। সে যুগে মাদরাসা নির্মাণ করাকে পার্থিব সম্মান ও মর্যাদার বিষয় রূপে গণ্য করা হয়। যার ফলে আমীর উমরা এবং বিভিন্ন অভিজাত শ্রেণির লোকেরা মাদরাসা ভবণ নির্মাণে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করতেন।[২] ক্রমান্বয়ে মাদরাসা শিক্ষার এ ধারা যুগের পরিবর্তনে কালের আবর্তে উন্নতি সাধিত হয় এবং আধুনিকীরণের ফলে বিশ্ব দরবারে গ্রহণযোগ্য শিক্ষাব্যবস্থা হিসেবে স্বীকৃত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করে অসংখ্য মাদরাসা। খ্রিষ্টীয় ১৩শ শতকের প্রথমার্ধ্বে মাওলানা তকী উদ্দিন আল- 'আরবী বাংলাদেশে আগমন করে রাজশাহী মাহি সন্তোষে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ১২৭০ খ্রিস্টাব্দে শায়খ সরফুদ্দীন আবু তাওয়ামাহ সোনারগাঁয়ে আগমন করে একটি মাদরাসা ও খানকাহ স্থাপন করেন। অনুরূপভাবে শায়েস্তা খাঁর শাসনামলেও কয়েকটি মাদরাসা স্থাপিত হয়।[৩]

১৭৫৭ খ্রি. পলাশির ভাগীরথী নদীর তীরে ইংরেজদের সাথে যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের মাধ্যমে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্ত গেলে এদেশের শাসনকর্তৃত্ব চলে যায় ইংরেজদের হাতে। তারা ১৭৬৫ খ্রি. ১২ই আগস্ট দ্বিতীয় শাহ আলম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে বাংলার দেওয়ানি সমর্পণ করলে কোম্পানি নিজ খরচে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে। ১৭৮০ খ্রি. অক্টোবর মাসে লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস কলকাতা আলিয়া মাদরাসা স্থাপন করেন। ১৯৮৪ খ্রি. কলকাতা আলিয়া মাদরাসার অনুকরণে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে একটি করে মাদরাসা স্থাপন করেন। মাওলানা আবু নসর ওহীদের প্রচেষ্টায় ১৯১৫ খ্রি. নিউ স্কিম মাদরাসা চালু হলে 'আরবী ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ সাধিত হয়। এর পর ওল্ড স্কিম পদ্ধতিতে এদেশে 'আরবী চর্চার জন্য আলিয়া নিসাবের (ইবতেদায়ী, দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল) মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়।[৪]

১৯৪৭ খ্রি. পাকিস্তান স্বাধীন হলে কলিকাতা আলিয়া মাদরাসা ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। শিক্ষার শুভসূচনা হয় পারস্যের নিজামুল মুলকের অধীনে নিজামিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। আর যুগের পরিবর্তনে প্রতিষ্ঠিত হয় বর্তমানের আলিয়া মাদরাসা। পরবর্তীতে দরসে নিজামি পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত হয়ে আধুনিক রূপে স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে দুই ধারার মাদরাসায়

---

১ *মুসলিম শিক্ষা* পৃ. ৭

২ *আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস*, পৃ. ৩৮

৩ প্রাগুক্ত পৃ. ২৮-২৯

৪ *The Bangladesh Gazette*, Thursday, march-2-1978

রূপান্তর হয় যা 'আরবী চর্চা ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশে প্রচলিত মাদরাসা শিক্ষার দুটি ধারা বিদ্যমান। (ক) আলিয়া (খ) কওমী।

চট্টগ্রাম জেলার আলিয়া মাদরাসা

আলিয়া মাদরাসাঃ ১৯৭৫ খ্রি. বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষাধারার আধুনিকায়নের কর্মসূচি শুরু হয়েছিল। ১৯৭৯ খ্রি. ৪ঠা জুলাই বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড স্বায়ত্তশাসন লাভের পর এর একাডেমিক সংস্কারের পথ পুরোপুরি উন্মুক্ত হয়।[১] ১৯৮৪ খ্রি. সরকার নতুন পাঠ্যসূচি অনুমোদন দেয়। নতুন এই কারিকুলাম অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থা ৫টি স্তরে বিন্যস্ত করা হয়। এগুলো হলো যথাক্রমে ইবতিদায়ি, দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল।[২]

ইবতিদায়ী ও দাখিল ৮ম শ্রেণিতে দুটি বৃত্তি পরীক্ষা নেয়া হয়। দাখিল অষ্টম শ্রেণি পাসের পর নবম ও দশম শ্রেণিতে সাধারণ, বিজ্ঞান এবং মসজিদ গ্রুপের জন্য পৃথক পাঠ্যসূচি প্রণীত হয়। ১৯৮৪ খ্রি. দাখিল পাস ছাত্র/ছাত্রীরা সাধারণ শিক্ষার এসএসসি পাসের সমমান এবং ১৯৮৭ খ্রি. আলিম পরীক্ষার্থীরা এইচএসসি পাশের সমমান পায়। পরবর্তীতে ফাজিল ৩ বছরের (স্নাতক) সমমান এবং কামিল ২ বছরের স্নাতকোত্তর সমমানপ্রাপ্ত হয়। বর্তমানে সকল শ্রেণিতে 'আরবী শিক্ষা বাধ্যতামূলক হওয়ায় ব্যাপকভাবে 'আরবী ব্যাকরণ, 'আরবী সাহিত্যচর্চা ও বিকাশ লাভ করে। বর্তমানে বাংলাদেশে ৬,৭৭১ টি দাখিল মাদরাসা, ১৯২ টি বেসরকারি কামিল মাদরাসা ও ৩ টি সরকারি কামিল মাদরাসাসহ মোট ৯,৪৩৬ টি মাদরাসা 'আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

মুহসিনিয়া মাদরাসা (চিটাগাং মাদরাসা)

১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দের ২৪ জুলাই এই মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর 'আরবী বিভাগ অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও জনপ্রিয়। ০৫ পরবর্তীতে এটি ১৯৬৭ খ্রি সম্পূর্ণ কলেজে রূপান্তরিত করে ১৯৭৯ খ্রি. নতুন নামকরণ হয় হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজ। বর্তমানে লাইব্রেরীতে প্রায় তিন হাজার দুষ্পাপ্য মূল্যবান আরবী ও ফার্সি কিতার এখানো আছে।[৩] সেই সময় এ মাদরাসাটি ইসলামী শিক্ষা অর্জনের প্রধান কেন্দ্র ছিল। এ মাদরাসার উল্লেখ্যযোগ্য অধ্যক্ষ ছিলেন - মাওলানা কামাল উদ্দীন (১৯১৩-১৯২৫ খ্রি.), খান বাহাদুর মুহাম্মদ মুছা (১৯২৬-১৯৩০ খ্রি.)। উল্লেখযোগ্য মুহাদ্দিস ছিলেন, মাওলানা মুহাম্মদ হাসান (১৮৫০-১৯২০ খ্রি.), মাওলানা আজিজুর রহমান (১৮৬২-১৯২ খ্রি.), ফখরে বাংলা মাওলানা আব্দুল হামিদ (১৮৮১-১৯৪০ খ্রি.)।

উল্লেখযোগ্য ছাত্র হলেন, আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র:) এর বিখ্যাত ছাত্র মাওলানা ফজলুর রহমান (র:) (১৮৮৬-১৯৬৪ খ্রি.), মাওলানা শাহ গোলামুর রহমান মাইজ ভান্ডারী (র:)

---

১ মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা শিক্ষার উত্তরণ* (ঢাকা) আগ ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ৪০৭

২ *বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তার প্রভাব*, পৃ. ৩৫২

৩. মুহামদ শামসুল আলম, হাজী মুহাম্মাদ মহসিন কলেজ, চট্টগ্রাম, এষণা, *কলেজ স্মরণিকা* '৯৭', পৃ. ২০-২২

ইন্তেকাল (১৯৩৭ খ্রি.), ফখরে বাংলা মাওলানা আব্দুল হামিদ, হাটহাজারী মইনুল ইসলাম মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা ০৪জন মাওলানা হাবিবুল্লাহ (১৮৬৫-১৯৪৩ খ্রি.), মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদ (১৮৫০-১৯১০ খ্রি), মাওলানা সুফি আজিজুর রহমান (১৮৬২-১৯২১ খ্রি.) ও মাওলানা আব্দুল হামিদ (১৮৭০-১৯২০ খ্রি.) পটিয়া জিরি মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আহমাদ হাছান (১৮৮২-১৯৬৭ খ্রি.), মাওলানা হামেদ হাসান আলভী আজমগড়ী (র:) এর খলিফা চট্টগ্রাম দারুল উলুম কামিল মাদরাসার হেড মাওলানা শাহ নজির আহমদ (র:) (১৮৪৪-১৯৪৪খ্রি.), প্রখ্যাত মুহাদ্দিস মাওলানা মুহাম্মদ হাসান (১৮৫০-১৯২০ খ্রি.), দারুল উলুম আলিয়া মাদরাসার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা খলিলুর রহমান বাগবানী (মৃত ১৯১৮ খ্রি.), মাওলানা মুহাম্মদুর রহমান এম.পি. (মৃত ১৯৭৩ খ্রি.) গারাংগিয়ার বড় হুজুর শাহ মাওলানা আব্দুল মজিদ (র:) (১৮৯০-১৯৭৭ খ্রি), খান বাহাদুর প্রিন্সিপাল জিয়াউল হক (জন্ম ১৮৯৫ খ্রি.) চুনতী কামিল মাদরাসার নাজেমে আলা মাওলানা ফললুল্লাহ (১৮৯৮- ১৯৭৯ খ্রি.), ফখরুল মুহাদ্দেসীন মাওলানা আমিন উল্লাহ (১৮৯০-১৯৮৪ খ্রি.), প্রমুখ ব্যাক্তিগণ- এ মাদরাসার কৃতি ছাত্র ছিলেন।[১]

দারুল উলুম কামিল (অনার্স-মাস্টার্স) মাদরাসা, চট্টগ্রাম

এটি ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি উম্মুল মদারিস হিসেবে খ্যাত, অর্থাৎ মাদরাসা সমূহের জননী। ১৯১৫ খ্রি. আলিম ক্লাস খোলা হয়। ০১ জানুয়ারী ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে সে সময়ের পঞ্জুম বর্তমান দাখিল সে সময়ের সুওয়াম বর্তমান আলিম স্বীকৃতি ও মঞ্জুরী লাভ করে। ১৯১৬ খ্রি. ফাযিল ক্লাস চালু এবং ১৯২০ খ্রি. মঞ্জুরী প্রাপ্ত হয়। ১৯৪৭ খ্রি. কামিল হাদীস খোলার অনুমতি ১৯৪৮ খ্রি. পরীক্ষার সুযোগ লাভ করে।[২] এসময় মুহাদ্দিস হিসেবে ছিলেন আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ) এর ছাত্র খ্যাতিমান মুহাদ্দিস মাওলানা ফজলুর রহমান (১৮৮৬-১৯৬৪খ্রি.), ফখরে বাংলা মাওলানা আব্দুল হামীদ (১৮৮১-১৯৪০খ্রি.) ফখরুল মুহাদ্দিসীন মাওনান মুফতি মুহাম্মদ আমিন (১৯০৫-১৯৭৭ খৃঃ) ফখরুল মুহাদ্দিসীন মাওলানা আব্দুল আউয়াল (মৃত ১৯৫৫খ্রি.), মাওলানা আবুল ফসিহ মুহাম্মাদ ফুরকান (১৯১০-১৯৭৭খ্রি.), মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী (১৯২১-১৯৮৬ খ্রি.) মাওনানা মুহম্মদ ইসমাইল

---

১. হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজ, চট্টগ্রাম, এষণা, *কলেজ বার্ষিকী ২০০৭-২০০৮* এলবাম হতে সংগৃহিত তথ্য পৃষ্ঠা বিহীন ও মাওলানা শাহ আহম্মদ হাসান, *মাশায়েখে চাটগামী* (প্রকাশনায়, ওয়াদুদী দারুল মোতালায়া, জিরি মাদরাসা, চট্টগ্রাম, প্রকাশকাল, মার্চ ১৯৮৮ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭ ও ২য় খণ্ড, পৃ. ০৩

২. অফিস রেকর্ড ও তথ্য দাতা, জনাব নুরুল হুদা, অফিস সহকারী দারুল উলুম আলীয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম এবং মাওলানা সলিমুর রহমান কমরী, উপাধ্যক্ষ দারুল উলুম আলীয়া মাদরাসা, *বার্ষিকী আযযিকরা ২০০০*, দারুল উলুম আলীয়া, চট্টগ্রাম।

আরকামী (১৯১৮-১৯৮০খ্রি.), মাওলানা মুহাম্মদ নাওয়ার হুসাইন (১৯১৭-২০০১খ্রি.) প্রমুখ হাদীস বিশারদ-গণ ২০০২ খ্রি. তাফসীর বিভাগ চালু হয়। ২০১০ খ্রি. আল হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে অনার্স খোলা হয়।[১] পরবর্তীতে উক্ত বিষয়ে মাস্টার্স ও খোলা হয়। প্রতিষ্ঠানে আগমন করেছিলেন সে সময়ের অধিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ১৯৩৭ খ্রি.। তাঁর জন্য মানপত্র পাঠ করেছিলেন, সে সময়ের মাদরাসার সেক্রেটারী, চট্টগ্রাম পৌরসভার আজীবন চেয়ারম্যান মরহুম নুর আহমদ চৌধুরী (১৮৯০-১৯৬৪ খ্রি.) মানপত্রে জনাব চৌধরী দারুল উলুম মাদরাসাকে কলিকাতা আলিয়া মাদরাসার পর ২য় স্থানে রেখেছিলেন। শেরে বাংলা সাহেব মানপত্রের জবাবে বলেছিলেন বন্ধুবর নুর আহমদ সাহেব ভুল বলেছেন, দারুল উলুম আলীয়া মাদরাসাটি অবিভক্ত বাংলার মাদরাসাগুলোর মধ্যে ১ম স্থান অধিকারী। ফলাফলই এর প্রমাণ।[২] এটি সফর করেছেন সাইয়্যেদ আবুল আলা মাওদুদী (র:) (১৯০৩-১৯৭৯ খ্রি.), শায়খুল ইসলাম শববীর আহমদ ওসমানী (র:) (১৮৮৬-১৯৪৫ খ্রি.), মুফতি মুহাম্মদ শফি (রহ) (১৮৯৪-১৯৭৬ খ্রি.), এহতেশামুন হক থানবী (র:) (১৯১৫-১৯৮০ খ্রি.), জাফর আহমেদ ওসমানী (র:) (১৮৯২-১৯৭৪ খ্রি.), মাওলানা চেরাগ আলী (র:), মাওলানা ক্বারী মুহাম্মদ তৈয়ব (র:), ওমর আহমদ ওসমানী, ছারছিনার পীর মাওলানা নেছার উদ্দীন (১৯৫২ খ্রি.), মাওলানা আতহার আলী (র:) (১৮৯১-১৯৭৬ খ্রি.), খতীবে আজম মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ (রহ) (১৯০৫-১৯৮৭ খ্রি.), ভাষাবিদ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৫৮ খ্রি.) ফুরফুরার পীর সাহেব মাওলানা আবু বকর ছিদ্দীকী (র:), (১৮৪৪-১৯৩৯ খ্রি.), ছারছীনার পীর সাহেব আবুজাফর মুহাম্মদ ছালেহ (র:), ঢাকা আলীয়া মাদরাসার হেড মাওলানা আল্লামা আব্দুর রহমান কাশগড়ী (র:) (১৯১১-১৯৭৪ খ্রি,), ঢাকা আলীয়া মাদরাসার হেড মাওলানা ও জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররমের খতীব মাওলানা ওবায়দুল হক জালালাবাদী (র:) (১৯২৮-২০০৮ খ্রি.), ঢাকা আলীয়ার মুহাদ্দিস মাওলানা আলা উদ্দীন আল-আজহারী (র:) (১৯৩৫-১৯৭৮ খ্রি.), মাওলানা নুর মুহাম্মদ আজমী (১৯০৮-১৯৭৮ খ্রি.), মাওলানা মুফতি দ্বীন মুহাম্মাদ খান (১৯০০- ১৯৭৪ খ্রি.) পাকিস্তান জমিয়তে ইত্তেহাদুল ওলামার সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা গুলজার আহমদ মুজহেরী, যুক্তফ্রন্ট আমলের শিক্ষা মন্ত্রী আশরফুজ্জামান চৌধুরী।

---

১. অফিস রেকর্ড, দারুল উলুম আলিয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম।

২. মাওলানা ছলিমু রহমান কমরী, সাবেক মুহাদ্দিস ও উপাধক্ষ্য, দারুল উলুম আলীয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম, *বার্ষিকী আয যিকরা ২০০০* খ্রি., দারুল উলুম আলিয়া মাদরাসার ইতিহাস ও ঐতিহ্য। পৃ. ১৯

পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালিন গর্ভনর আব্দুল মোনায়েম খানের মন্ত্রী সভার প্রাদেশীক শিক্ষা মন্ত্রী আমজাদ হোসেন প্রমুখ।[১]

ওয়াজেদিয়া কামিল এম.এ মাদরাসা

চট্টগ্রাম শহরের পাঁচলাইশ থানায় অবস্তিত ওয়াজেদিয়া মাদরাসা একটি প্রাচিন মাদরাসা। পাচঁলাইশ নিবাশী শাহ সুফি মাওলানা ওয়াজেদ আলী খান (১৮৬৯-১৯৩৪ খ্রি.), ১৯০০ খ্রি. এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩৯ খ্রি. এটি একত্রে দাখিল, আলিম ও ফাজিলের সরকারী মঞ্জুরী লাভ করেন। ১৯৫৪ খ্রি. পরীক্ষা কেন্দ্র চালু হয়। ১৯৫৫ খ্রি. কামিল হাদীস ১৯৭০ খ্রি. কামিল ফিকহ সরকারী মঞ্জুরী হয়। ১৯৩০ খ্রি. অধ্যক্ষ হন প্রতিষ্ঠাতার পুত্র মাওলানা আতিকুল্লাহ খান (১৯০৬-২০০৫খ্রি.), তিনি ১৯৭৯ খ্রি. অবসরের পর তার পুত্র জিয়ায়ুল হক খান (১৯৪৩-১৯৯২ খ্রি.) অধ্যক্ষ হন।[২] ১৯৯৩-১৯৯৫ অধ্যক্ষ ছিলেন-মাওলানা মুসলেহ উদ্দীন (১৯৭৮-২০১২খ্রি.); ১৯৯৫ খ্রি. হতে অধ্যক্ষ ছিলেন মাওলানা ইনামূল হক ওয়াজেদী। তিনি ২০১৪ ইনতিকাল করেন। তারপর অধ্যক্ষ ছিলেন মাওলানা আব্দুস সাত্তার আনোয়ারী। এই মাদরাসায় মুহাদ্দিস ছিলেন, মাওলানা কবির আহমদ (১৯৪৬-১৯৯৫ খ্রি.), বায়তুশ শরফের পীর মাওলানা আব্দুল জব্বার (র:) (১৯৩৩-১৯৯৮খ্রি.), মাওলানা কাজী নুরুল ইসলাম হাশেমী, মাওলানা হাদীস আহমদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামীক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. শফিকুল্লাহ, মাওলানা আব্দুর রহমান, মাওলানা আজীজুর রহমান, মাওলানা বজলুর রহমান, মুফতি রশিদ আহমদ, মাওলানা মুছা মুজাদ্দেদী, মাওলানা মীর হাফেজ গোলাম মুস্তফা প্রমুখ। আশির দশকে দূর দুরান্ত হতে হাদীস পড়ার জন্য ছাত্ররা এখানে ভিড় জমাত। এখান হতে অনেক আলিম ও মুহাদ্দিস বের হয়। এই মাদরাসার অসংখ্য কৃতী ছাত্রদের মধ্যে ওয়াজেদিয়া আলিয়া মাদরাসার অধ্যক্ষ জিয়াউল হক খান, চন্দনাইশ জাফরাবাদ মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা শরসুল ইসলাম হেলালী, মাওলানা কাযী নুরুল ইসলাম হাশেমী, রাঙ্গুনিয়া আলম শাহ পাড়া আলীয়া মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা আ.ন.ম. শসশুল আলম চৌধুরী, সিপাতলী আলিয়া মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা আজীজুল হক আল কাদেরী, বোয়ালখালী শকপুরা কামিল মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ মাওলানা নুর মুহাম্মদ, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসার প্রধান মুফতি মাওলানা ওবায়দুল হক নঈমী, ফেনী

---

১. অফিস রেকর্ড, দারুল উলুম আলিয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম, তথ্যদাতা- মাওলানা শাহ মুহাম্মদ ইসমাঈল, সাবেক সহ-সভাপতি, চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলীয়া মাদরাসা, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৪৫ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৫ খ্রি., মাওলানা আব্দুল গফুর (র:) জীবন ও কর্ম, মাওলানা এ. কে. এম. মাহবুবুর রহমান ও মাওলানা মোরশেদ খান পৃ. ১৬৭

২. মনিরুল ইসলাম রফিক, মাদরাসা শিক্ষা প্রসার ও উন্নয়নে কিংবদন্তী পুরুষ আল্লামা আতিকুল্লাহ খান, *মাসিক তাসনীম*, সংখ্যা: অক্টোবর ১৯৯৯ খ্রি., পৃ. ২৩

আলিয়া মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস, উপাধ্যক্ষ মাওলানা হাফেজ মুবিনুল হক, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মাদরাসার উপাধ্যক্ষ মাওলানা সগীর আহমদ উসমানী, গহিরা আলিয়া মাদরাসার মুহাদ্দিস মাওলানা মুহাম্মদ ইব্রাহিম হানাফী, ফতেহ নগর অদুদিয়া ফাযিল মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা সফওয়ানুল করিম, বুড়িশ্বর জিয়াউল উলুম ফাযিল মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা জাফর আহমদ ছিদ্দিকী প্রমুখ।[১]

চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদরাসা

এটি ১৮১০ খ্রি. প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩৯ খ্রি. এটি বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড এর অধীনে ফাযিল শ্রেণি পর্যন্ত মঞ্জুরী লাভ করে। এই মদরাসার বিস্তারিত বিবরণ অত্র অভিসন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে 'শিক্ষা ও নৈতিকতা প্রসারে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপন' শিরোনামে রয়েছে। এটি চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশের এক অনন্য ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করে।

জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল এম.এ মাদরাসা, চট্টগ্রাম।

চট্টগ্রাম মহানগরীর পাঁচলাইশ থানার ষোলশহর বিবিরহাটের পূর্ব পার্শ্বে এই প্রতিষ্ঠানটি অবস্থিত। পাকিস্তানের উত্তর পশ্চিম সিমান্ত প্রদেশের হাজারা জেলার অন্তর্গত হরিপুর শহর নিবাসী প্রখ্যাত বুজুর্গ হাজা আব্দুর রহমান চৌহরভী (র:) (১৮৪৩-১৯২৩ খ্রি) এর খলিফা মাওলানা ছৈয়দ আহমদ ছিরিকোটি (ইন্তেকাল ১৯৬১ খ্রি.) এলাকার শিক্ষানোরাগীদের সহযোগিতায় ১৯৫৪ খ্রি. এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৬২ খ্রি. ফাযিল শ্রেণির সরকারী মঞ্জুরী লাভ করে। কামিল হাদীস বিভাগ ১৯৭২ খ্রি. চালু হয়। ১৯৮৫ খ্রি. কামিল ফিকাহ বিভাগ খোলা হয়। হাদীস বিভাগ উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকিহ মাওলানা আবুল ফছিহ মুহাম্মদ ফুরকান (১৯১০-৯৯৭৭ খ্রি.)। বি.এ অনার্স খোলা হয় ২০১০ খ্রি.। অধ্যক্ষদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন চুনতী নিবাসী মাওলানা আবু তাহের মুহাম্মদ নাজের (১৯২২-১৯৮৫ খ্রি.), মাওলানা মুফতি মুজাফফর আহমদ (১৯২৫-১৯৯৭ খ্রি.), রাউজান নিবাসী মাওলানা হাবিবুর রহমান, সোবহানিয়া কামিল মাদরাসার সাবেক অধ্যক্ষ মাওলানা মুছলেহ উদ্দীন (১৯৩৮-২০১২ খ্রি.) এবং কুমিল্লা নিবাসী মাওলানা আব্দুল গফুর নোমানী প্রমুখ।

১৯৮০ খ্রি. ৩০ সেপ্টেম্বর হতে ২০১৩ খ্রি. পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৩৩ বছর অধ্যক্ষ ছিলেন মাওলানা জালাল উদ্দীন আল কাদেরী, ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ছিলেন উপাধ্যক্ষ ছগীর আহমদ ওসমানী এবং মুহাদ্দিস মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ সোলাইমান আনসারী। প্রধান মুহাদ্দিস ছিলেন আবুল ফসীহ

১. তথ্যদাতা মাওলানা জাহিদ হাসান, উপাধ্যক্ষ, ওয়াজেদী আলীয়া মাদরাসা ও মাওনালা সফওয়ানুল করিম, অধ্যক্ষ, ফতেহ নগর অদুদিয়া ফাজিল মাদরাসা।

মুহাম্মদ ফুরকান (১৯১০-১৯৭৭ খ্রি.) এখানে হাদীস চর্চায় যারা ছিলেন মাওলানা মুহাম্মাদ শফী উকাড়তী, মাওলানা ফজলুল করীম নকশবন্দী, মাওলানা মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান (১৯৩৮-১৯৮৯ খ্রি.), মাওলানা মুহাম্মাদ ইব্রাহিম (১৯২৯-১৯৮৯ খ্রি.) সাবেক প্রধান মুহাদ্দিস মাওলানা আব্দুল আউয়াল ফুরকানী (১৯৩২-২০০১ খ্রি.) মাওলানা মুহাম্মদ ছৈয়দ দায়েম উল্লাহ। মাওলানা মুহাম্মদ সিরাজ উদ্দীন ও কুমিল্লা নিবাসী মাওলানা আব্দুল হামীদ (জন্ম ১৯৩৪ খ্রি.) মাওলানা ওবায়দুল হক নঈমী, মাওলানা ছৈয়দ মুফতী মুহাম্মদ অছিয়র রহমান, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াজেদ ও মাওলানা মুহাম্মাদ সোলাইমান আনসারী, মাওলানা আবু তৈয়ব প্রমুখ।[১] ছৈয়দ আহমদ ছিরকোটি (র:) এর পর তাঁর পুত্র তৈয়ব শাহ (র:) এরপর তাহের শাহ মাদরাসার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। সার্বিক বিবেচনায় মাদরাসাটি দেশের খ্যাতিমান ও শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে খ্যাতি লাভ করে।[২] এখানে শিক্ষক কর্মচারী ৮৫ জন, ছাত্র ছাত্রী ৩০০০ এর অধিক।[৩]

গারাংগিয়া ইসলামিয়া কামিল এম.এ মাদরাসা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম

এই মাদরাসাটি চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলা সদর থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দক্ষিণে গারাঙ্গিয়া গ্রামে অবস্থিত। গারাংঙ্গিয়া নিবাসী হযরত হাফেজ হামেদ হাসান আলভী আজমগড়ী (১৮৭১- ১৯৫৯খ্রি.) এর অন্যতম খলিফা মাওলানা শাহ আব্দুল মজিদ (১৮৯০-১৯৭৭খ্রি.) এই মাদরাসাটি ১৯২০ খ্রি. প্রতিষ্ঠা করেন। এটি ১৯৩৮ খ্রি. আলিম, ১৯৪১ খ্রি. ফাযিল ১৯৮৪ খ্রি. কামিল (হাদীস) সরকারী মঞ্জুরী লাভ করে। ঊনবিংশ শতাব্দির ষাট ও সত্তর দশকে এটি চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশের অনন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে সমাদৃত ছিল। বর্তমানে সাতকানিয়া উপজেলার শ্রেষ্ট এবং একমাত্র কামিল (অনার্স-মাস্টার্স) মাদরাসা ১৯২০-১৯৬৯ খ্রি. পর্যন্ত সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা আব্দুল মজিদ বড় হুজুর (র:), তাঁর অবসরের পর তাঁর ছোট তাই মাওলানা আব্দুর রশীদ ছোট হুজুর (র:) (১৯০০-১৯৯৪খ্রি.) ১৯৬৯-১৯৭৭ খ্রি. পর্যন্ত অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৭৮-১৯৮০ পর্যন্ত মাওলানা আবু তাহের মুহাম্মন নাজের, ১৯৮০-১৯৮২ খ্রি. পর্যন্ত মাওলানা বদিউল আলম, ১৯৮২-১৯৮৩ খ্রি. পর্যন্ত মাওলানা আব্দুর রহমান, ১৯৮৩ খ্রি. আগস্ট হতে ১৯৮৩ খ্রি. অক্টোবর পর্যন্ত মাওলানা ফৌজুল কবির, ১৯৮৩ খ্রি. নবেম্বর হতে ১৯৮৪ খ্রি. জুন পর্যন্ত মাওলানা কবির

---

১. তথ্যদাতা মাওলানা ছগির আহমদ উসমানী, উপাধ্যক্ষ ও ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদরাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম। সাইয়েদ মুহাম্মদ আবু নোমান, *চট্টগ্রাম হাদীস চর্চা*, মনযিল ২০০৩, ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ, চট্টগ্রাম, পৃ. ৫৭-৫৮

২. ড. আহসান সাইয়্যেদ, *বাংলাদেশের হাদীস চর্চা উৎপত্তি ও বিকাশ*, প্রকাশক এর্ডন পাবলিকেশন, ঢাকা, প্রকাশকাল, ফেব্রুয়ারি ২০০৯, পৃ. ৬৫-৬৬

৩. অফিস রের্কড, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া মাদরাসা।

আহমদ, ১৯৮৪ খ্রি. নবেম্বর হতে ১৯৮৫ খ্রি. মে পর্যন্ত মাওলানা আব্দুল মন্নান অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৮৫ খ্রি. জুন হতে ০১ মার্চ ২০১২ পর্যন্ত সাতকানিয়া বারদোনা নিবাসী মাওলানা আব্দুল কাইয়ুম, ২ জুলাই ২০১২-২০ এপ্রিল ২০১৩ পর্যন্ত মাওলানা আবুল কালাম, ২১ এপ্রিল ২০১৩ হতে মাওলানা আব্দুল কাদের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। বর্তমান অধ্যক্ষ মাওলানা নূরুল আজীম, এই মাদরাসায় মুহাদ্দিস ছিলেন সাতকানিয়া নিবাসী মাওলানা মুহাম্মাদ আমীন। মাওলানা মুফতী সোলতান আহমদ, মাওলানা আব্দুল হালীম বোখারী, মাওলানা আব্দুর রহীম বোখারী, মাওলানা ফজলুল করিম, উপাধ্যক্ষ মাওলানা আমিনউল্লাহ ও ড. মাওলানা নিজাম উদ্দীন প্রমুখ।

এই মাদরাসার উল্লেখযোগ্য কৃতিছাত্র শাহ মাওলানা আব্দুর রশীদ (র:) ছোট হুজুর গারাংগিয়া, শাহ মাওলানা আব্দুল জব্বার (র:), মাওলানা মীর গোলাম মোস্তফা (র:), মাওলানা মুফতি সোলতান আহমদ (১৮৯৯-১৯৯২ খ্রি.), মাওলানা মুহাম্মদ আমীন (১৯২২-২০০০ খ্রি.), মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ আজাদ (১৯৩০-১৯৯৭ খ্রি.), সোবহানিয়া কামিল মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা মুছলেহ উদ্দীন (জন্ম ১৯৩৮ খ্রি.) মাওলানা মুবারক আহমদ, মাওলানা আব্দুল গনী বোখারী, মাওলানা আব্দুর রশীদ, মাওলানা ড. কবির আহমদ (সৌদি আরব), মাওলানা শামসুল ইসলাম এম-পি, অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল হাই ছিদ্দিকী, অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল কাইয়্যুম ও মাওলানা মুফতি আব্দুর রহমান(জন্ম- ১৯৪৫খ্রি.) প্রমুখ।[১]

রাঙ্গুনীয়া আলম শাহ পাড়া কামিল (এম.এ) মাদরাসা, চট্টগ্রাম

এই মাদরাসাটি চট্টগ্রাম জেলায় রাঙ্গুনিয়া উপজেলার আলম শাহ পাড়ায় মাওলানা আব্দুর রহমান ১৯৩৮ খ্রি. প্রতিষ্ঠা করেন। রাঙ্গুনিয়ার কৃতি সন্তান মাওলানা আ.ন.ম. শামসুল আলম চৌধুরী (জন্ম ১৯৫১) ১৯৭২ খ্রি. হতে ৩০ জুন ২০১০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘদিন অধ্যক্ষ থাকা অবস্থায় এ মাদরাসার বৈপ্লবিক পরিবর্তন করেন। এর পর মাওলানা নূরুন্নবী ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ছিলেন। এরপর মাওলানা আব্দুল হাই এক বৎসর অধ্যক্ষ ছিলেন। আবুলওফা মুহাম্মাদ হুসাইন তৈয়ব ও মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল ০১ জুন ২০১১ হতে ১২ মার্চ ২০১৩ পর্যন্ত- ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ছিলেন। মাওলানা মীর মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর ১৩ মার্চ ২০১৩ পর্যন্ত হতে অদ্যবধি অধ্যক্ষ হিসেবে আছেন। এটি কামিল হাদীস, তাফসীর, ফিকাহ ও আদব বিভাগ চালু রয়েছে সরকার অনুমোদিত একমাত্র কামিল মাদরাসা। দাখিল আলিম পর্যায়ে বিজ্ঞান, মুজাবিবদ, মাহির ও

---

১. অফিস রেকর্ড, গারাংগিয়া ইসলামিয়া কামিল মাদরাস, ড. আহসান সাঈদ, *বাংলাদেশে হাদীস চর্চা: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাম*, প্রকাশক অ্যার্ডন পাবলিকেশন, ঢাকা; প্রকাশকাল, ফেব্রুয়ারী ২০০৯, পৃ.৬০-৬১; আমদুল ইসলাম চৌধুরী, কতুবুল আলম, *সুলতানুল আউলিয়া হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মজিদ (রহ), বড় হুজুর (র:)*, গারাংগিয়া, প্রকাশিকা, আলহাজ্বা উম্মুল খাইর বেগম ও আলহাজজা উন্মুচ্ছফা বেগম, প্রকাশকাল, আগস্ট ২০০৪ খ্রি., পৃ. ৩৮,২৯,৪০,৪১ ও ৪২

হিফজুল কোরআন ইত্যাদি বিভাগও চালু আছে। ১৯৭৬ খ্রি. ফিকাহ, ১৯৮৪ খ্রি. তাফসীর, ১৯৮৫ খ্রি. আদব ও ১৯৮৭ খ্রি. হাদীস বিভাগ সরকারী মঞ্জুরী লাভ করে। ১৯৭৭ খ্রি. কামিল পরীক্ষা কেন্দ্র চালু হয়। সারা বাংলাদেশের ছাত্ররা এখানে লেখাপড়া করে। সার্বিক বিবেচনায় এটি দেশ সেরা একটি প্রতিষ্ঠান। ২০১০ খ্রি. ফাযিল অনার্স খোলা হয়। শায়খুল হাদীস মাওলানা নেছারুল হক (১৯২০-২০০৬ খ্রি.), মাওলানা আমিন খান রেজভী (১৯১৯-২০০২ খ্রি.) , মাওলানা শামসুল ইসলাম হেলালী (মৃত ১৯৯৯ খ্রি.), মাওলানা মুজিবুল হক (মৃত ২০০৮ খ্রি.), হাফেজ মাওলানা মুমিনুল হক, মাওলানা মাহবুবুল আলম ছিদ্দিকী (জন্ম ০১ মার্চ ১৯৬২ খ্রি.), মাওলানা মুফতী আব্দুর রহমান, মাওলানা আব্দুল হাই, মাওলানা হাফেজ ওহীদুল হক, উপাধ্যক্ষ মাওলানা ফরিদুল আলম (০১ নভেম্বর ১৯৪৯ খ্রি.), মাওলানা গিয়াস উদ্দীন তালুকদার, মাওলানা শফিউল কাদের, মাওলানা মুজিবুল হক ছিদ্দিকী প্রমুখ মুহাদ্দিস, মুফাস্সির, ফকীহ, আদীব হিসেবে উল্লেখযোগ।[১]

সোবহানিয়া কামিল (এম.এ) মাদরাসা, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামের কোতোয়ালী থানার পাথরঘাটা আসাদ গঞ্জ রোডে মুহাম্মদ আব্দুস সুবহান সওদাগর (১৮৮৩-১৯৬৭ খ্রি.), ১৯৫১ খ্রি. এটি প্রতিষ্ঠা করেন। এই মাদরাসা ১৯৫২ খ্রি. আলিম, ১৯৫৩ খ্রি. ফাযিল এবং ১৯৬৪ খ্রি. কামিল হাদীস সরকারী মঞ্জুরী লাভ করে।[২] বিশাল এলাকা জুড়ে এটি প্রতিষ্ঠিত। কামিল ফিকাহ চালু হয় ১৯৯০ খ্রি.। ২০১১ খ্রি. ফাযিল শ্রেণিতে ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে অনার্স খোলা হয়। মাওলানা ছৈয়দ মুহাম্মদ ৩ অক্টোবর ১৯৫১-৩১ ডিসেম্বর ১৯৫১ পর্যন্ত, ০১ জানুযারী ১৯৫২-০৩ জুন ১৯৫২ পর্যন্ত মাওলানা মুহাম্মদ শফিউর রহমান, মাওলানা মুহাম্মদ আজীজুর রহমান ০১ জুলাই ১৯৫২-৩০ ডিসেম্বর ১৯৫২, মাওলানা খাইরুল বশর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ০১ জানুযারী ১৯৫৩-২০ আগস্ট ১৯৫৩ পর্যন্ত, মাওলানা শমসুল হুদা (ইন্তেকাল ১৯৯৫খ্রি.), ২১ আগস্ট ১৯৫৩-৩১ ডিসেম্বর ১৯৭৫ পর্যন্ত, মাওলানা ফৌজুল কবির ০১ জুলাই ১৯৭৬-৩০ জুন ১৯৭৬ পর্যন্ত, মাওলানা ছৈয়দ শমসুল হুদা পূনরাই ০১ জুলাই ১৯৭৬-০৯ সেপ্টেম্বর ১৯৮৮ পর্যন্ত, চন্দনাইশ নিবাসী মাওলানা মুছলেই উদ্দীন (১৯৩৮-২০১২খ্রি.), ১৯৭৭-০১ আগস্ট ১৯৯৩ পর্যন্ত, মাওলানা জয়নুল আবেদীন ০১ জুন ১৯৯৩ হতে ৩০ জানুযারী ১৯৯৫ পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ছিলেন। মাওলানা মুছলেহ উদ্দীন পূনরাই ০৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫ হতে ২০০৩ খ্রি. সরকারী ভাবে অবসর নেয়ার পরেও পরিচালনা

১. অফিস রেকর্ড, রাঙ্গুনিয়া আলম শাহ পাড়া কামিল মাদরাসা ও মাওলানা শফিউল কাদের, উপাধ্যক্ষ, রাঙ্গনিয়া আলম শাহ পাড়া কামিল মাদরাসা।

২. অফিস রেকর্ড, সোবহানিয়া কামিল মাদরাসা ও তথ্যদাতা, মুহাম্মাদ হারুন, সোবহানিয়া কামিল মাদরাসা, আসাদ গঞ্জ, চট্টগ্রাম।

পরিষদ তাকে পাঁচ বছরের জন্য পুনরায় নিয়োগ দেয়ার ফলে ২০০৮ খ্রি. পর্যন্ত অধ্যক্ষ থাকেন। এরপর উপাধ্যক্ষ মাওলানা জুলফিকার আলী (জন্ম ০১ মার্চ ১৯৭১ খ্রি.), ০১ মে ২০০৮ হতে ১৯ জুন ২০০৯ পর্যন্ত ভাবপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ছিলেন। আনোয়ারা নিবাসী মাওলানা মুহাম্মদ হারুন (জন্ম ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ খ্রি.) ২০ জুন ২০০৯ হতে অদ্যাবধি অধ্যক্ষ পদে কর্মরত আছেন। মাওলানা আবুল ফছীহ মুহাম্মদ ফুরকান (১৯১০-১৯৭৭ খ্রি.), মাওলানা মুহাম্মদ আলী (১৯৩৫-১৯৯৩ খ্রি.), মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুছ (১৯৩৬-২০০১ খ্রি.), মাওলান আলী আহমদ রেজভী (১৯২৮-২০০০ খ্রি.), মাওলানা মুহাম্মদ শামসুদ্দীন (১৯৩১- ২০১০ খ্রি.), উপাধ্যক্ষ মাওলানা জয়নুল আবেদীন, মাওলানা আলা উদ্দীন (ইন্তেকাল ১৯৯৮খ্রি.), প্রমুখ মুহাদ্দিসরা হাদীস শিক্ষা দেন। বর্তমানে প্রধান মুহাদ্দিস মাওলানা মঈন উদ্দীন আশরাফী, উপাদক্ষ মাওলানা জুলফিকার আলী, মাওলানা নিজাম উদ্দীন রশিদী প্রমুখ আলিমরা হাদীস শিক্ষাদানে রত আছেন। এ মাদরাসার কামিল শ্রেণির গড় ছাত্র সংখ্যা ৮০/৯০জন।[১]

বায়তুশরফ আদর্শ কামিল (এম.এ) মাদরাসা, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম শহরের ডবলমুরিং থানার অর্ন্তগত ধনিয়ালা পাড়ায় হযরত শাহ মাওলানা আব্দুল জব্বার (র:) (১৯৩৩-১৯৯৮ খ্রি.) ১৯৮২ খ্রি. এটি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৮৬ খ্রি. দাখিল, ১৯৮৮ খ্রি. আলিম, ১৯৯৩ খ্রি. ফাযিল, ১৯৯৬ খ্রি. কামিল হাদীস বিভাগ খোলা হয়। আল্লামা নেছারুল হক (১৯২০-২০০৬ খ্রি.) এর মাধ্যমে কামিল শ্রেণির সবক উদ্বোধন করা হয়। ২০০৫ খ্রি. অধ্যক্ষ মাওলানা সাইয়েদ আবু নোমানের প্রচেষ্টায় তাফসীর বিভাগ চালু হয়। এখানে কম্পিউটার বিভাগ, দাখিল ও আলিম পর্যায়ে বিজ্ঞান বিভাগ চালু আছে। ১৯৯১ ও ২০০২ খ্রি. দুইবার বাংলাদেশ শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জাতীয় জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।[২] এই মাদ্রাসা দাখিল হতে কামিল সরকারি করেন বাইতুশ শরফের পীর সাহেব হযরহ মাওলানা শাহ কুতুব উদ্দীন (র:) এর ভাগিনা হযরত মাওলানা কাজী অধ্যক্ষ নাছির উদ্দিন (ম.জি.আ.)। হযরত মাওলানা আব্দুল জব্বার (র:) এর প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় ও কাজী সাহেরেব আন্তরিক প্রচেষ্ঠায় এই মাদরাসাটি দ্রুত কামিল স্তরে উন্নতি হয়ে সরকারি মঞ্জুরী লাভ করে।[৩] হযরত শাহ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল জব্বার (র:)

---

১. অফিস রেকর্ড, সোবহানিয়া কামিল মাদরাসা, আসাদগঞ্জ, চট্টগ্রাম, তথ্য দাতা. মাওলানা জুলফিকার আলী, উপাধ্যক্ষ, অত্র মাদ্রাসা।

২. অফিস রেকর্ড, বায়তুশ শরফ আর্দশ কামিল মাদরাসা।

৩. মাওলানা মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, *শিক্ষা ও সমাজসেবায় বায়তুশ শরফের অবদান* (চট্টগ্রাম : বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা, ২৮ নভেম্বর ২০১৭ খ্রি.), পৃ. ২২৬

(১৯৮২-১৯৯৭ খ্রি.) পর্যন্ত, শাহ মাওলানা কুতুর উদ্দীন (রহ) (১৯৯৭-২০০৪ খ্রি.) পর্যন্ত।[১] ০১ এপ্রিল ২০০৪ হতে ৩০ জুলাই ২০২২ পর্যন্ত ড. সাইয়েদ আবু নোমান অধ্যক্ষ ছিলেন। ৩১ জুলাই ২০২২ হতে ১৯ মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম ছিলেন। ২০ মার্চ ২০২৩ হতে অধ্যবধি অধ্যক্ষ আছেন আবু ছালেহ মুহাম্মদ ছলিম উল্লাহ। যারা এখানে হাদীস, তাফসীর, ফিকাহ বিভিন্ন বিষয়ে পাঠ দান করেছেন তাদের মধ্যে ৪ কয়েকজন হলো- শাহ মাওলানা আব্দুল জব্বার (রা), শাহ মাওলানা কতুর উদ্দীন (র:), শায়খুল হাদীস মাওলানা নেছারুল হক (র:), মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ আবু নোমান, শায়খুল হাদীস মাওলানা ফজলুল করিম, মুহাদ্দিস মাওলানা জয়নুল আবেদীন সাবেক উপাধ্যক্ষ মাওলানা আমিন উল্লাহ ,মাওলানা মুজিবুল হক সিদ্দিকী, মুহাদ্দিস মাওলানা জসিম উদ্দীন ও মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ জুনাইদ প্রমুখ। সারা দেশের ছাত্ররা এখানে অধ্যয়ন করে। দেশ সেরা ১০টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এটি। বার্ষিক ম্যাগাজিন আলো ফাযিল-কামিল ছাত্রদের উদ্যেগে আন নকীব, আশ শরফ নামে দেয়ালিকা প্রকাশিত হয়। ২০১৬ খ্রি. আল কোরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ এবং আল হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে ফামিল অনাস কোর্স এবং ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে উভয় বিষয়ে কামিল মাস্টার্স খোলার হয়। ইসলামী শিক্ষার প্রসারে এটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।[২]

নেছারিয়া কামিল (এম.এ) মাদরাসা, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম শহরের পাহাড়তলী উপজেলায় এটি মিরসরাই শাহের খালী নিবাসী মাওলানা মুফতী মুজাফফর আহমদ (১৯৮৫-১৯৯৭ খ্রি.) ১৯৭৮ খ্রি. প্রতিষ্ঠা করেন। এটি ১৯৮০ খ্রি. দাখিল, আলিম, ফাযিল মঞ্জুরী লাভ করে। ১৯৮৬ খ্রি. কামিল হাদীস মঞ্জুরী লাভ করে। ২০০২ খ্রি. দাখিলে বিজ্ঞান বিভাগ মঞ্জুরী লাভ করে। ০১/০৬/১৯৮১-০১/১১/১৯৯৭ পর্যন্ত অধ্যক্ষ ছিলেন মাওলানা মুফতী মুজাফফর আহমদ ০২/১১/১৯৯৭-৩০/০৫/২০০০ পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ছিলেন মাওলানা সাখাওয়াত হোসাইন। পরে ০১/০৬/২০০৭-৩০/১১/২০১১ পর্যন্ত তিনি নিয়মিত অধ্যক্ষ হিসেবে সরকারীভাবে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর অসময় ফাযিল অনার্স ২০১০ খ্রি. খোলা হয় হাদীস ও ফিকাহ বিষয়ে। ০১/১২/২০১১-৩১/০৭/২০১২ পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ এবং ০১/০৮/২০১২ হতে অদ্যাবধি অধ্যক্ষ আছেন মাওলানা মুহাম্মদ জয়নুল আবেদীন জুবাইর। যারা হাদীস পড়িয়েছিলেন বর্তমানে পড়াচ্ছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হল মাওলানা

---

১. *আলো*, সম্পাদক: মুহাম্মদ একরামুল হক, প্রকাশক: বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল মাদরাসা, প্রকাশকাল ০৫ অক্টোবর ২০২২, পৃ. ১১

২. অফিস রেকর্ড, বায়তুশ শরফ আর্দশ কামিল মাদরাসা, ধনিয়ালা পাড়া, চট্টগ্রাম।

মুফতী মুজাফফর আহমদ (১৯২৫-১৯৯৭ খ্রি.), মাওলানা সাখাওয়াত হোসাইন, মাওলানা আব্দুল গফুর, মাওলানা জয়নুল আবেদীন, মাওলানা মেশকাত উদ্দীন, মাওলানা ছৈয়দ মুহাম্মদ ইমদাদ উদ্দীন, মাওলানা রফিক উদ্দীন ছিদ্দিকী, মাওলানা কামাল উদ্দীন আজহারী ও মাওলানা এনামুল হক সিকদার প্রমুখ।[১]

সিতাকুন্ড কামিল (এম.এ.) মাদরাসা, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলা সদরে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পাশে অবস্থিত সীতাকুন্ড কামিল (এম.এ) মাদরাসা মাওলানা ওবায়দুল হক (১৮৫৬-১৯২১ খ্রি.) ১৮৮৬ খ্রি. প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি (১৮৮৬-১৯২১ খ্রি.) পর্যন্ত আমৃত্যু সুপারিন্টেনডেন্ট ছিলেন। মাওলানা জামালুল্লাহ ১৯২২-১৯৫০ খ্রি. পর্যন্ত সুপার ছিলেন। ১৯৩৯ খ্রি. মাদরাসা দ্বিতল ভবন হয়। ১৯৪৬ খ্রি. মাদরাসার হোস্টেল চালু হয়।[২] ফখরুল মুহাদ্দেসীন মাওলানা মুহাম্মদুল হক (১৯০২-১৯৮৮খ্রি.) ২৮/০৩/১৯৫০-১৯৮১ পর্যন্ত অধ্যক্ষ, ১৯৮৮ খ্রি. পর্যন্ত রেকটর ছিলেন। ১৯৬৭ খ্রি. এটি স্থায়ী মঞ্জুরী লাভ করে। ১৯৭৮ খ্রি. কামিল হাদীস চালু হয়। ১৯৮৬ খ্রি. সরকারী মঞ্জুরী লাভ করে। এদেরকে মাদরাসার আঙ্গিনায় দাফন করা হয় মাওলানা ফছিহুল আলম ১৯৮১-১৯৮৬ খ্রি. পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৮৬-১৯৯৯ খ্রি. পর্যন্ত মাওলানা এ. কে. এম শামসুদ্দীন, ১৯৯৯-২০০১ খ্রি. পর্যন্ত মাওলানা জামাল উদ্দীন আল মাদানী, অধ্যক্ষ পদে এবং মাওলানা আ.ন.ম ইকবাল হুসাইন ২০০১-২০০২ খ্রি. পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ছিলেন। ২০০২-২০০৪ খ্রি. পর্যন্ত অধ্যক্ষ ছিলেন ড. এ.টি.এম তাহের (জন্ম: ১৯৫৬ খ্রি.)। ২০০৫ খ্রি. ৩১ ডিসেম্বর হতে ২০১৯ খ্রি. অধ্যক্ষ ছিলেন মাওলানা মাহমুদুল হক (জন্ম ১৯৬০ খ্রি.)।[৩] এই মাদরাসায় যারা হাদীস শিক্ষা দানে নিয়োজিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে মাওলানা আবুল মোকারেম হাদীস আহমদ, অধ্যক্ষ মাওলানা মুছলেহ উদ্দীন, উপাধ্যক্ষ মাওলানা জয়নুল আবেদীন, উপাধ্যক্ষ মাওলানা নুরুল বারী, মাওলানা ফজলুল বারী ও মাওলানা আতিকুর রহমান প্রমুখ। মাওলানা মাহমুদুল হক, উপাধ্যক্ষ মাওলানা মুহিববুল্লাহ আজাদ, মুহাদ্দিস

---

১. অফিস রেকর্ড, নেছারিয়া কামিল (এম.এ) মাদরাসা, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম ও তথ্যদাতা: মাওলানা সাখাওয়াত হুসাইন, সাবেক অধ্যক্ষ, নেছারিয়া কামিল মাদরাসা ও মাওলানা এরফানুল হক, আরবি প্রভাষক, অত্র মাদরাসা, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।

২. মনোয়ার সাগর, *সীতাকুন্ডের ইতিহাস, সমাজ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য* (চট্টগ্রাম: স্বপ্নীল চাইল্ড ফাউন্ডেশন, ফেব্রুয়ারি ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ৯২-৯৫

৩. গবেষক সরাসরি তার থেকে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন।

মাওলানা ওসমান গণি, মাওলানা হুসাইন আহমদ (১৯৪৪-২০২৪) ও মাওলানা আমিনুল হক প্রমুখ।[১]

জামেয়া মিল্লিয়া আহমদিয়া কামিল (এম.এ) মাদরাসা নাজিরহাট, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলার নাজিরহাট বাজারের পূর্ব পাশের সড়ক সংলগ্ন বিশাল এলাকাজুড়ে এ মাদরাসা অবস্থিত।মাওলানা আহমদ উল্লাহ মাইজভান্ডারী (র:) (১৮২৫-১৯০৫ খ্রি.) এর নামানুসারে ফটিকছড়ির ফরহাদাবাদ গ্রামের বুর্জুগ মাওলানা আব্দুল হালীম (র:) (১৯০২-১৯৮৩ খ্রি.) ১৯৩৯ খ্রি. এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্যরা হলেন মাওলানা আফজল আহমদ চৌধুরী (১৯০৮-২০০৪), মাওলানা সুলাইমান (১৯০৬-১৯৯২), মাওলানা জালাল আহমদ ও মাওলানা ফোররুখ আহমদ (ইন্তেকাল ২০০৫) এ ছাড়া মাদরাসার জন্য যারা অবদান রাখেন, তোফায়েল আহমদ চৌধুরী, ডাঃ মাহমুদুল হক, সাবেক কেবিনেট সেক্রেটারী ও শিল্পমন্ত্রী এস.এম শফিউল আজম, আলহাজ্ব চুন্নু মিয়া চৌধুরী, আব্দুল বারী চৌধুরী, মির্জা আবু আহমদ ও আলহাজ্ব ফুলমিয়া সওদাগর।[২] ১৯৭৪ খ্রি. কামিল হাদীস বিভাগ চালু করে নেছারিয়া কামিল মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ মাওলানা মুফতী মুজাফফর আহমদ(১৯২৫-১৯৯৭) এর মাধ্যমে বোখারী শরীফের সবক উদ্বোধন করা হয়।[৩] ১৯৪৪ খ্রি. দাখিল, ১৯৪৭ খ্রি. আলিম, ১৯৫৫ খ্রি. ফাযিল, ১৯৭৯ খ্রি. কামিল হাদীস সরকারী মঞ্জুরী লাভ করে।[৪] মাওলানা আব্দুল হালিম ১৯৩৯-১৯৭২, কুমিল্লা নিবাসী মুহাদ্দিস মাওলানা আলী আজম (১৯৪১-২০০৫) ১৯৭৩-২০০৫ পর্যন্ত অধ্যক্ষ ছিলেন। বর্তমানে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে আছেন প্রতিষ্ঠাতার বড় ছেলে মাওলানা কামাল উদ্দীন (জন্ম ১৯৫৩ খ্রি.) এখানে যারা হাদীস শিক্ষা দিয়েছেন তাদের মধ্যে মাওলানা শায়খুল হাদীস আল্লামা নেছারুল হক (ইন্তেকাল ২০০৬খ্রি.), অধ্যক্ষ মাওলানা আলী আজম (১৯৪১-২০০৫), প্রধান মুহাদ্দিস মাওলানা মুজিবুল হক (ইন্তেকাল ২০০৮খ্রি.), শায়খুল হাদীস মাওলানা আব্দুল মোনায়েম (১৯২২-২০০১) মাওলানা ফয়জুল ইসলাম ও মাওলানা আহমদুর রহমান নদভী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে হাদীসের দরস দিচ্ছেন, প্রধান মুহাদ্দিস মাওলানা আব্দুস সালাম শরিফী ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস

---

১. ড. সাইয়েদ মুহাম্মদ আবু নোমান, *ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞান প্রচার ও প্রসারে চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলিয়া মাদরাসার অবদান* (প্রকাশক: জনাব আলহাজ্ব আবুল কালাম, প্রকাশকাল, জানুযারি ২০১৭ খ্রি.), পৃ. ৮৯

২. মাওলানা কামাল উদ্দীন, *মহিয়ানের সন্ধানে* (প্রকাশক, চারু প্রকাশ, প্রকাশকাল, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১০ খ্রি.), পৃ. ১৩-১৪

৩. তথ্য দাতা, মাওলানা কামাল উদ্দীন, ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, জামিয়া মিল্লিয়া আহমদিয়া কামিল মাদরাসা, নাজিরহাট, চট্টগ্রাম।

৪. অফিস রেকর্ড, জামিয়া মিল্লিয়া আহমদিয়া কামিল মাদরাসা, নাজির হাট, চট্টগ্রাম; ড. আহসান সাইয়েদ, *বালাদেশে হাদীস চর্চার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ* (ঢাকা : অ্যার্ডান পাবলিকেশন, ফেব্রুয়ারি ২০০৯ খ্রি.), পৃ ৬৬-৬৭

হাফেজ মুহাম্মদ শহীদ উল্লাহ, ফটিকছড়িতে এটিই একমাত্র কামিল মাদরাসা। ১৯৯৪ খ্রি. এটি জেলার শ্রেষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরকারী পুরস্কার লাভ করে।[১]

গহিরা এফ. কে. জামেউল উলুম কামিল (এম.এ) মাদরাসা, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম উত্তর জেলার উপজেলায় গহিরায় চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি মহাসড়কের পাশে অবস্থিত এই মাদরাসাটি হাটহাজারী উত্তর মেখল নিবাসী মাওলানা ছৈয়দ দোস্ত মোহাম্মদ (র:) (১৯০৯-১৯৫১খ্রি.) ১৯৩৮ খ্রি. প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৯৩৮-১৯৫১ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ছিলেন। এটি ১৯৪১ খ্রি. ফাযিল হয়।[২] ১৯৬১-১৯৯১ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠাতার বড় সন্তান মাওলানা ছৈয়দ মোহাম্মদ নুরুল মোনাওয়ার (জন্ম ১৯৩৯খ্রি.) অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৯০ খ্রি. কামিল হাদীস খোলা হয় যা ১৯৯৫ খ্রি. সরকারী মঞ্জরী লাভ করে। তিনি মাদরাসার ভৌত অবকাঠামো, ছাত্রাবাস নির্মাণ, দাখিল ও আলিম বিজ্ঞান বিভাগ খোলা ইত্যাদি বিষয়ে অসামান্য অবদান রাখেন। ১৯৯২-২০০০ পর্যন্ত মাওলানা গোলাম সরওয়ার মজুমদার, মাওলানা রুহুল আমীন কামাল ও ফটিকছড়ির মানুষ নানুপুর নিবাসী মাওলানা সৈয়দ আবু তালের মুহাম্মদ আলাউদ্দিন (জন্ম১৯৫৮খ্রি.) অধ্যক্ষ ছিলেন। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ছিলেন মাওলানা ফজলুল হক ইসলামাবাদী। ২০১২ সাল হতে অধ্যক্ষ আছেন মাওলানা ইব্রাহিম নঈমী।[৩]

ছিপাতলী জামেয়া গাউছিয়া মঈনিয়া কামিল এম.এ মাদরাসা, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম উত্তর জেলার হাটহাজারী উপজেলায় সিপাতলী গ্রামে এই মাদরাসাটি মাওলানা মুহাম্মদ আজীজুল হক আল কাদেরী ৩১ মার্চ ১৯৭৪ খ্রি. প্রতিষ্ঠা করেন। এটি ১৯৭৬ খ্রি. দাখিল ও আলিম এক সাথে স্বীকৃতি ও মঞ্জুরী লাভ করে। ১৯৭৮ খ্রি. ফাযিল, ১৯৮২ খ্রি. কামিল হাদীস, ১৯৮৮ খ্রি. কামিল (তাফসীর), ১৯৮৯ খ্রি. কামিল (ফিকহ) এবং ১৯৯০ খ্রি. কামিল (আদিব) বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড ঢাকা হতে স্বীকৃতি ও মঞ্জুরী লাভ করে। ২০১০ খ্রি. আল হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে অনার্স খোলা হয়। ১৯৭৪-২০০৮ পর্যন্ত অধ্যক্ষ ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মুহাম্মদ আজীজুল হক আল কাদেরী। তারপর তাঁর পুত্র মাওলানা আবুল ফারাহ মুহাম্মদ ফরিদ উদ্দীন ০১ এপ্রিল ২০০৮ হতে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করছেন। এখানে যারা হাদীস পড়িয়েছেন তাদের মধ্যে মাওলানা ফজলুল করিম মুজাদ্দেদী, মাওলানা ওয়াজীহুল্লাহ, মাওলানা আব্দুর রউফ, মাওলানা জয়নুল আবেদীন, মাওলানা আব্দুল মোনায়েম,

---

১. অফিস রেকর্ড, জামেয়া মিল্লিয়া আহমদিয়া আলিয়া মাদরাসার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, *মাদরাসা বার্ষিকী* ১৯৮২, পৃ. ৩৭

২. ড. আহসান সাইয়েদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

৩. অফিস রেকর্ড, গহিরা এফ. কে. জামেউল উলুম কামিল মাদরাসা।

মাওলানা মুছা ওবাইদী, মাওলানা শাহ আব্দুল মালেক ও মাওলানা আইয়ুব আলী আজমী প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ উল্লেখযোগ্য। এই মাদরাসার অনেক কৃতি ছাত্র ইসলামী শিক্ষা বিকাশে এবং দেশ ও জাতী গঠনে অবদান রেখে চলেছেন।[১]

শাহচান্দ আউলিয়া কামিল (এম.এ) মাদরাসা পটিয়া, চট্টগ্রাম

দক্ষিণ চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার পটিয়া পৌরসভার সদর ০৭ নং ওয়ার্ডের চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহা সড়কের পাশে প্রখ্যাত বুজুর্গ হযরত শাহচান্দ আউলিয়ার মাজারের পাশে এলাকার বিশিষ্ট আলেম মাওলানা নুরুল হক ১৯২৮ খ্রি. এ মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন। এলাকার একক কামিল মাদরাসা হিসেবে এটাকে গুরুত্বপূর্ণ ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধরা হয়। এটি ১৯৫২ খ্রি. দাখিল, ১৯৫৮ খ্রি. আলিম, ১৯৬১ খ্রি. ফাযিল, ১৯৮৩ খ্রি. কামিল হাদীস মঞ্জুরী লাভ করে। ১৯৪৭ খ্রি. এটি পরীক্ষা কেন্দ্র হয়। মাওলানা নুরুল হক ১৯২৮-১৯৫৫ খ্রি. পর্যন্ত প্রতিষ্ঠাতা সুপার। তারপর মাওলানা আব্দুর রহমান ও মাওলানা বজ্বল আহমদ কিছুকাল সুপার ছিলেন। মাওলানা মুছা মুজাদ্দেদী ১৯৫৬-১৯৭২ পর্যন্ত মাওলানা আব্দুর রউফ ১৯৭২-১৯৭৭ খ্রি. পর্যন্ত, মাওলানা আব্দুর রহীম ১৯৭৭-১৯৭৮ পর্যন্ত, মাওলানা এস.এম ইকবাল মোজাদ্দেদী (ভারপ্রাপ্ত) ১৯৭৮-১৯৮০ খ্রি. পর্যন্ত, চুনতী নিবাসী মাওলানা আবু তাহের মুহাম্মদ নাজের ১৯৮০-১৯৮১, মাওলানা ছলাহ উদ্দীন আল ইমামী ১৯৮১-১৯৮৪ খ্রি. পর্যন্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। কিছুকাল ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ছিলেন। মাওলানা সিরাজ উদ্দীন, মাওলানা মুছা মুজাদ্দেদী ১৯৮৫-১৯৮৭ খ্রি. পর্যন্ত, ১৯৮৭-১৯৮৮ খ্রি. পর্যন্ন্ত মাওলানা সিরাজ উদ্দীন (২য় বার ভারপ্রাপ্ত), মাওলানা ড. এ.টি.এম তাহের ১৯৮৮-২০০৩ পর্যন্ত এবং ২৮ মার্চ ২০০৩ হতে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন মাওলানা মুকতার আহমদ। ২০১৬-২০১৭ খ্রি.র শিক্ষা বর্ষে আল হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা হতে অনার্স খোলার অনুমতি লাভ করে। এই মাদরাসায় যারা হাদিসের খিদমত করেছেন এবং করছেন তাদের মধ্যে হেড মাওলানা মুছা মুজাদ্দেদী, হেড মাওলানা সিরাজ উদ্দীন, চুনতী নিবাসী মাওলানা শহিদুল হক হোসাইনী, পটিয়া নিবাসী মাওলানা সাইফুদ্দীন খালেদ উল্লেখযোগ্য।[২]

শাকপুরা দারুচ্ছুন্নাত জামেয়া মোজাদ্দেদীয়া কামিল (এম.এ) মাদরাসা,

১. তথ্যদাতা: মাওলানা আবুল ফারাহ মুহাম্মদ ফরিদ উদ্দীন,অধ্যক্ষ, ছিফাতলী গাউছিয়া মঈনিয়া কামিল (এমএ) মাদরাসা, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

২. অফিস রেকর্ড, শাহচান্দ আউলিয়া কামিল মাদরাসা, পটিয়া, চট্টগ্রাম।

বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম

দক্ষিণ চট্টগ্রাম বোয়ালখালী উপজেলার শাকপুরা চৌমুহনিতে চট্টগ্রাম কক্সবাজার মহাসড়কের পাশে এলাকার প্রাখ্যাত বুর্জগ শাহ মাওলানা রশিদ আহমদ (রা:) এর সন্তান এবং গারাংগিয়ার বড় হুজুর শাহ মাওলানা আব্দুল মজীদ (র:) এর (১৮৯৪-১৯৭৭) এর অন্যতম খলিফা মাওলানা নূর মোহাম্মদ (জন্ম ১৯৫২) ১৯৮০ খ্রি. এই মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এটি এলাকার একক কামিল মাদরাসা। এটি ১৯৪৮ খ্রি. দাখিল, ১৯৭৮ খ্রি. আলিম, ১৯৮৯ খ্রি. ফাযিল এবং ১৯৯৭ খ্রি. কামিল হাদীস মাদরাসা বোর্ড ঢাকা হতে মঞ্জুরী লাভ করে। তিনি ১৯৮০-২০১৪ পর্যন্ত অধ্যক্ষ ছিলেন। এ মাদরাসার উল্লেখযোগ্য মুহাদ্দিস হলেন, কুমিল্লা নিবাসী মাওলানা আব্দুর রহমান, বোয়ালখালী নিবাসী মাওলানা ছৈয়দ মুহাম্মদ জমীর উদ্দীন, রাউজান সুলতানপুর নিবাসী মাওলানা মুহাম্মদ এহসান উল্লাহ, রাঙ্গুনিয়া নিবাসী মাওলান মুহাম্মদ হারুন অর রশীদ এবং অত্র মাদরাসার কৃতি ছাত্র শাহ মোহাম্মদ আমানত উল্লাহ প্রমুখ। ইসলাম প্রচারে এটি উল্লেখ যোগ্য অবদান রেখে যাচ্ছে।[১]

কাগতিয়া এশাতুল উলুম কামিল (এম.এ) মাদরাসা রাউজান, চট্টগ্রাম

কাগতিয়া এশাতুল উলুম কামিল (এম.এ) মাদরাসা, রাউজান উপজেলার চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি সড়কের মুন্সি ঘাটস্থ রাউজান-নোয়া পাড়া সড়কে এলাকার সর্বজন প্রদ্ধেয় মাওলানা রুহুল আমীন ১৯৩২ খ্রি. এটি প্রতিষ্ঠা করেন। পরে এটির হাল ধরেন এবং উন্নতিতে অবদান রাখেন হালী শহরস্থ হাফেজ মুনির উদ্দীন (র:) এর অন্যতম খলিফা মাওলানা ছৈয়দ তাফজজল আহমদ মুনিরী। তার সময়ে ১৯৪৭ খ্রি. আলিম, ১৯৫৮ খ্রি. ফাযিল এবং ১৯৯৯ খ্রি. কামিল বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড হতে মঞ্জুরী লাভ করে। ২০১০ খ্রি. ফাযিল শ্রেণীতে আল হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে অনার্স খোলা হয়। দাখিল নবম শ্রেণিতে বিজ্ঞান ও কম্পিউটার বিভাগ চালু আছে।মাওলানা সৈয়দ তফজজল আহমদ মুনিরী দীর্ঘদিন সুপার ও অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর অবসরের পর তাঁর পুত্র মাওলানা ছৈয়দ মুনির উল্লাহ অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন।[২]

আহসানুল উলুম জামেয়া গাউছিয়া কামিল (এম-এ) মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম

বায়জীদ থানার আওতাধীন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের কুলগাও জালালাবাদ ওয়ার্ডে অবস্থিত এ মাদরাসাটি প্রখ্যাত মুহাদ্দিস মাওলানা কাযী নূরুল ইসলাম হাশেমী (১৯২৮ খ্রি.-২০২০

১. অফিস রেকর্ড, শাকপুরা দারুচ্ছুন্নাত কামিল (এম.এ) মাদরাসা বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
২. মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

খ্রি.) ১৯৬৪ খ্রি. প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৬৪-১৯৮৭ পর্যন্ত তিনি প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ছিলেন। তার পর তাঁর পুত্র কাযী আবুল বয়ান হাশেমী জন্ম (০৭ মে ১৯৬৭ খ্রি.) ১৯৮৭ হতে অধ্যক্ষ হিসেবে আছেন। ০১ জানুয়ারি ১৯৮৪ খ্রি. দাখিল, ১৯৮৬ খ্রি. আলিম স্বীকৃতি ও মঞ্জুরী লাভ করে। ১৯৯০ খ্রি. ফাযিল স্বীকৃতি ১৯৯৪ খ্রি. তা মঞ্জুরী লাভ করে। ২০০২ খ্রি. কামিল মঞ্জুরী প্রাপ্ত হয়। উল্লেখ যোগ্য মুহাদ্দিসগণ হলেন, প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ মাওলানা নুরুল ইসলাম হাশেমী, নেছারিয়া কামিল মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ মাওলানা মুফতি মুজাফফর আহমদ (১৯২৯- ১৯৯৭ খ্রি.) মাওলানা সিরাজুল ইসলাম, ফেনী নিবাসী মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুস সত্তার, মাওলানা আলী আহমদ রেজবী, টেকনাফের হ্নীনা নিবাসী মাওলানা খাইরুল বশর, ফটিকছড়ি সুয়াবিল নিবাসী মাওলানা শাহ আব্দুল মালেক মাওলানা খাইরুল বাশর হক্কানী, সাতকানিয়া নিবাসী মাওলানা আহমদ নজীর ও কুতুবদিয়ার মাওলানা ফজলুল করিম প্রমুখ।[১]

মিরসরাই লতিফিয়া কামিল (এম.এ) মাদরাসা, চট্টগ্রাম

ঢাকা-চট্টগ্রাম ট্রাঙ্ক রোডে পাশেই মিরসরাই উপজেলা সদরে প্রখ্যাত বুর্জুগ মাওলানা নূরুল হক ১৮৮৪ খ্রি. মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৮ খ্রি. দাখিল, ১৯৩১ খ্রি. ফাযিল, ০১ জুলাই ১৯৯৭ খ্রি. কামিল অনুমতি এবং ০১ জুলাই ২০০৫ খ্রি. স্বীকৃতি লাভ করে। এটি উপজেলার প্রাচীন দ্বীনি প্রতিষ্ঠান। যারা সুপার বা অধ্যক্ষ ছিলেন, (০১) ওবায়দুল হক (১৮৮৪-১৯২০) (০২) মাওলানা নুরুল হক লতিফী (১৯২০-১৯৩৯) (০৩) কাজী শাহ সুফী মাওলানা এনামুল হক লতীফী (১৯৪০-১৯৪২) (০৪) মাওলানা একরামুল হক লতিফী (১৯৪২-১৯৫৩) (০৫) মাওলানা শাহ তাজুল ইসলাম লতিফী (১৯৫৩-১৯৯০) (০৬) মাওলানা খায়ের আহমদ ভারপ্রাপ্ত (১৯৯০) (০৭) মাওলানা বজল আহমদ ১৯৯১ জানুয়ারী হতে মার্চ পর্যন্ত, (০৮) মাওলানা খায়ের আহমদ (ভারপ্রাপ্ত) ১৯৯১ খ্রি. এপ্রিল হতে ১৯৯৩ খ্রি. ডিসেম্বর পর্যন্ত, (০৯) মাওলানা ফজলুল হক ইসলামাবাদী (১৯৯৪-১৯৯৭) (১০.) মাওলানা নুরুন্নবী ফারুকী ভোরপ্রাপ্ত ১৯৯৮ খ্রি. জানুযারি হতে আগস্ট পর্যন্ত (১১) মাওলানা ছলাহ উদ্দীন আল ইমামী ১৯৯৮ খ্রি. সেপ্টেম্বর থেকে ২০০৫ খ্রি. অক্টোবর পর্যন্ত, (১২) মাওলানা নুরুন্নবী ফারুকী (ভারপ্রাপ্ত) ২০০৫ নভেম্বর থেকে ২০০৬ এর এপ্রিল পর্যন্ত, (১৩) মাওলানা হাফেজ জালাল উদ্দীন ২০০৬ খ্রি. মে থেকে ২০১১ খ্রি. জুন পর্যন্ত, (১৪) মাওলানা নুরুন্নবী ফারুকী (ভারপ্রাপ্ত) ২০১১ খ্রি. জুলাই থেকে ২০১২ খ্রি. সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, এবং (১৫) মাওলানা

১. অফিস রেকর্ড, আহসানুল উলুম জামেয়া গাউছিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম।

একরামুল হক ২০১২ খ্রি. অক্টোবর হতে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৪ খ্রি. এটি পরীক্ষা কেন্দ্র হয়।[১]

আধুনগর ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলার আধুনগর ইউনিয়নে চট্টগ্রাম কক্সবাজার মহা সড়কের পাশে দুই একর জমির উপর দেশের সুপ্রসিদ্ধ শিল্পপ্রতি আলহাজ্ব মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম ১৯৮০ খ্রি. এ মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন। এটি ১৯৮৯ খ্রি. দাখিল, ১৯৯৩ খ্রি. আলিম ও ১৯৯৬ খ্রি. ফাযিলের একাডেমি স্বকৃতি লাভ করে। ১৯৯৩ খ্রিঃ দাখিল, ১৯৯৪ খ্রি. আলিম, ২০০২ খ্রিস্টাব্দে ফাযিল পর্যায়ে এমপিও ভুক্ত হয়। এটি ১৯৮৯ খ্রি. প্রতিষ্ঠাতার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত "ইসমাইল আঞ্জুমান আরা ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট" এর অধীনে ১১ সদস্যসের ট্রাস্টী গভর্নিং বডি কর্তৃক পারিচালিত হয়ে আসছে। বর্তমানে এটি ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় এর অর্ধীনে পরিচালিত। ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষ হতে কামিল তাফসীর বিভাগে প্রাথমিক পাঠদানের অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে মাদরাসা শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর কামিল পর্যায়ে উন্নিত হয়েছে।[২] দাখিল হতে কামিল পর্যন্ত সরকারী করণে এবং মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতাকে মাদরাসা প্রতিষ্ঠার জন্য উৎসাহিত করতে স্বরণীয় অবদান রাখেন হযরত মাওলানা অধ্যক্ষ কাজী মোহাম্মদ নাছির উদ্দীন (ম.জি.আ.), খাদেম, হযরত শাহ সাহেব কেবলা (র:) লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম। সার্বিক বিবেচনায় বর্তমানে মাদরাসাটি দেশের শীর্ষস্থানীয় মাদরাসায় পরিণত হয়েছে। ইসলাম প্রচারে যোগ্য আলেম তৈরিতে এটি অনন্য অবদান রেখে চলেছে। এই মাদরাসায় যারা অধ্যক্ষ ছিলেন, মাওলানা মুহাম্মদ ফছিউল্লাহ, তত্ত্বাবধায়ক, ০১ জানুযারি ১৯৮৬-৩১ মে ১৯৮৬ পর্যন্ত, মাওলানা আ.ফ.ম. খালেদ হোসাইন, তত্ত্বাবধায়ক, ৩০ জুন ১৯৮৬ হতে ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭ পর্যন্ত, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক, ০১ অক্টোবর ১৯৮৭ হতে ৩১ মে ১৯৮৮ পর্যন্ত, মাওলানা আবু নঈম ছিদ্দিক আহমদ, অধ্যক্ষ ০৯ জুন ১৯৮৮ হতে ৩১ মার্চ ১৯৯৪ পর্যন্ত, যারা কামিল শ্রেণিতে পাঠ দান করান, অধ্যক্ষ মাওলানা আবু মুছা খালেদ জমীল, উপাধ্যক্ষ মাওলানা ওসমান গনি, মাওলানা তাহের আহমদ, মাওলানা মাহফুজুর রহমান, মাওলানা আরিফ উল্লাহ, মাওলানা মুর্শেদুল আলম প্রমুখ।[৩] মাওলানা মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল, অধ্যক্ষ ০১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ হতে ২৯ ফেব্রুয়ারী ২০১২ পর্যন্ত, মাওলানা মুহাম্মদ ওসমান গনী, ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, ০১ মার্চ ২০১২ হতে ১২ ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত, মাওলানা আবু মুছা মুহাম্মদ খালেদ জমীল, অধ্যক্ষ ১৩ ডিসেম্বর ২০১২ হতে অদ্যবধি। এই মাদরাসার উল্লেখযোগ্য কৃতিছাত্র শহিদ এডভোকেট

১. অফিস রেকর্ড, লতিফিয়া কামিল মাদরাসা, মিরসরাই, চট্টগ্রাম।
২. ২০২৫ খ্রি. একাডেমিক ক্যালেন্ডার, আধুনগর ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
৩. তথ্যদাতা মাওলানা আবু মুছা খালেদ জমীল, অধ্যক্ষ, আধনুগর ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

সাইফুল ইসলাম আলিফ, মাওলানা রাশেদুল হক, আরবী প্রভাষক অত্র মাদরাসা, মাওলানা দেলাওয়ার হুসেন, আরবী প্রভাষক, গারাংগিয়া রশিদিয়া মহিলা ফাযিল মাদরাসা ইত্যাদি।

পদুয়া আইনুল উলুম দারুচ্ছুন্নাহ কামিল মাদরাসা, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলার পদুয়া ইউনিয়ন বাজারের পাশে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক ঘেঁসে আল্লামা শাহ আবুল হাছনাত (র:), ০১ জানুয়ারী ১৯৬৬ খ্রি. এই মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন। ০১ জুলাই ১৯৭২ খ্রি. দাখিল, ০১ জুলাই ১৯৭২ খ্রি. আলিম, ০১ জুলাই ১৯৭৭ খ্রি. ফাযিল বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড ঢাকা হতে মঞ্জুরী লাভ করে। ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রি. ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা হতে কামিল ফিকাহ বিভাগে অধিভুক্তি লাভ করে। প্রতিষ্ঠা লগ্ন হতে যারা অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন-

০১.প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ আল্লামা শাহ আবুল হাসনাত (১৯৬৬-১৯৮৮)।

০২.মাওলানা মাহমুদুল হাসান আনসারী (১৯৮৮-১৯১৯)।

০৩. মাওলানা জামাল উদ্দীন ইউসুফ, ভারপ্রাপ্ত ১ ডিসেম্বর ২০১৯ হতে ২৪ জানুয়ারি ২০২১।

০৪.আ.ন.ম নোমান ২৫ জানুযারী ২০২১ হতে অদ্যাবধি। মাওলানা অধ্যক্ষ আ.ন.ম. নোমান, মাওলানা আব্দুল কাদের, মাওলানা আবুল কালাম বর্তমানে কামিল শ্রেণিতে পাঠ দান করেন।[১]

সুফিয়া নুরিয়া ফাযিল (ডিগ্রি) মাদরাসা , মিরসরাই, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম উত্তর জেলার মিরসরাই উপজেলার পশ্চিম মিঠানালায় ফুরফুরার পীর সাহেব মাওলানা আবুবকর ছিদ্দিকী (রহ:) এর খলিফা মাওলানা আব্দুল গণি (র:) (১৮৬১-১৯৭৬ খ্রি.) ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। এটি ১৯৫০ খ্রি. আলিম, ১৯৫২ খ্রি. ফাযিল, ১৯৮৩ খ্রি. আলিম বিজ্ঞান, ১৯৮৫ খ্রি. দাখিল বিজ্ঞান মঞ্জুরী পায়।[২] ১৯৫৩ খ্রি. হতে ১৯৮৫ খ্রি. পর্যন্ত বেসরকারী ভাবে কামিল ক্লাস চালু হলেও পরবর্তীতে মঞ্জুরী না হওয়ায় বন্দ হয়ে যায়। যারা অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন- (১৯০৪-১৯৬২) পর্যন্ত অধ্যক্ষ ছিলেন মাওলানা আব্দুল গণি, তারপর তাফসীরে মারেফুল কুরআনের লেখক মুফতী শফী (র:) এর জামাতা মাওলানা নূরুচ্ছালাম (ইন্তেকাল ২০১০খ্রি.) ১৯৬২-১৯৮৫ খ্রি. পর্যন্ত। মাওলানা আব্দুল গণি (র:) এর পুত্র মাওলানা সিরাজুল ইসলাম ১৯৮৫-১৯৯৩ পর্যন্ত। মাওলানা রেজাউল হক নিজামী ১৯৯৩-

১. তথ্যদাতা মাওলানা আ.ন.ম নোমান, অধ্যক্ষ, পদুয়া আইনুল উলুম দারুচ্ছুন্নাহ কামিল মাদরাসা, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

২. অফিস রেকর্ড, সুফিয়া নুরিয়া ফাযিল মাদরাসা, চট্টগ্রাম।

অদ্যাবধি।[১] এই মাদরাসার উল্লেখ যোগ্য কৃতি ছাত্র হল সাবেক অধ্যক্ষ মুফতী মাওলানা নুরুচ্ছালাম (ইন্তেকাল ২০১০) সাবেক অধ্যক্ষ মাওলানা সিরাজুল ইসলাম, কুমিল্লা সোনাকান্দা আলিয়া মাদরাসার সাবেক অধ্যক্ষ মুফতী মাওলানা মুজাফফর আহমদ (১৯২৫-১৯৯৭ খ্রি.) জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসার সাবেক প্রধান মুহাদ্দিস মাওলানা আব্দুল আউয়াল ফোরকানী (১৯৩২-২০০১ খ্রি.) ছোবহানিয়া কামিল মাদরাসার সাবেক মুহাদ্দিস ও ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদের সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ শামসুদ্দীন (১৯৩১-২০১০), সিতাকুন্ড কামিল মাদরাসার সাবেক শায়খুল হাদীস মাওলানা হাদীস আহমদ, ছোবহানিয়া কামিল মাদরাসার উপাধ্যক্ষ মাওলানা জয়নুল আবেদীন (জন্ম ০১ জানুযারি ১৯৪০) চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদরাসার শায়খুল হাদীস মাওলানা আব্দুল হাই নিজামী, ওয়াজেদিয়া কামিল মাদরাসার মুহাদ্দিস মাওলানা বজলুর রহমান, সীতাকুন্ড কামিল মাদরাসার সাবেক উপাধ্যক্ষ মাওলানা ফজলুল বারী,আবু তোরাব ফামিল মাদরাসার সাবেক উপাধ্যক্ষ মাওলানা নুরুল বারী, ময়মনসিংহ বাট্টজোড়া সিনিয়র মাদরাসার সাবেক অধ্যক্ষ মাওলানা বজলুস সোবহান, মিঠাছড়া ফাযিল মাদরাসার সাবেক অধ্যক্ষ মাওলানা ফজলুস সোবহান। সুফিয়া নুরিয়া ফাযিল মাদরাসার সাবেক উপাধ্যক্ষ মাওলানা নুরুল ইসলাম, সুফিয়া নুরিয়া সাবেক মুহাদ্দিস মাওলানা সুলতান আহমদ, ফেনী আলিয়া মাদরাসার সাবেক মুফাসিসর মাওলানা আব্দুস সত্তার, আবু তোরাব ফাযিল মাদরাসার বর্তমান অধ্যক্ষ মাওলানা শফিকুল ইসলাম নিজামী এবং সুফিয়া নুরিয়া মাদরাসার বর্তমান অধ্যক্ষ মাওলানা রেজাউল হক নিজামী প্রমুখ। ২০০৩ খ্রি. উপজেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচিত হয়।[২]

পতেঙ্গা ইসলামীয়া ফাযিল (ডিগ্রি) মাদ্রারাসা, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম মহানগরীর সর্ব দক্ষিণে পতেঙ্গা থানার বঙ্গোপসাগরের মোহনার পাদদেশে ১৯৭৪ খ্রি. ০৬ সেপ্টেম্বর এ মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ০১ জানুয়ারি ১৯৮২ খ্রি. দাখিল, ০১ জুলাই ১৯৮৫ খ্রি. আলিম এবং ০১ জুলাই ১৯৮৭ খ্রি. ফাযিল মঞ্জুরী হয়। দাখিল স্তরে বিজ্ঞান বিভাগ ও কম্পিউটার বিভাগ এবং পৃথক হিফজুল কুরআন বিভাগ চালু আছে। ১৯৭৪-১৯৮২ পর্যন্ত সুপার ছিলেন হাফেজ মাওলানা নুর আহমদ, ১৯৮২ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত অধ্যক্ষ ছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ জানে আলম। ০১ জানুয়ারি ২০১৩ হতে ০২ বছর তাঁর চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। ২০০৪ খ্রি. এটি চট্টগ্রাম বিভাগের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হয়। এটি

১. তথ্যদাতা মাওলানা রেজাউল হক নিজামী, অধ্যক্ষ, সুফিয়া নুরিয়া ফাযিল মাদরাসা, মিরসরাই, চট্টগ্রাম।
২. সুফিয়া নুরিয়া ফাযিল মাদরাসার ওয়েব সাইট থেকে প্রাপ্ত তথ্য।

ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতষ্ঠান।[১] মাওলানা আবুল হাসনাত মুহাম্মদ ইউসুফ এই প্রতিষ্ঠানের ১৯৯৫ খ্রি. হতে সভাপতি। তার অনেক অবদান রয়েছে।

ফতেহ নগর অদুদিয়া ফাযিল (ডিগ্রি) মাদ্রাসা, রাউজান, চট্টগ্রাম

রাউজানের নওয়াজিসপুর ইউনিয়নের ফতেহ নগর গ্রামে আলহাজ আব্দুল অদুদ চৌধুরী (১৯০১-১৯৭১) ০১ এপ্রিল ১৯৫৫ খ্রি. এটি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি আমৃত্যু মাদরাসার সভাপতি ছিলেন। মাদসার যাবতীয় ব্যায় বহন করতেন। তিনি অসামান্য অবদান রেখেছেন। এ মাদরাসার অধ্যক্ষ ছিলেন (০১) রাউজান নিবাসী মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদ ০১ এপ্রিল ১৯৫৫ হতে ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৫৯ পর্যন্ত, (০২) রাউজান চিকদাইর অধিবাসী মাওলানা আব্দুস সালাম ০১ অক্টোবর ১৯৫৯ হতে ৩০ এপ্রিল ১৯৬০ পর্যন্ত, (০৩) বরিশালের মাওলানা ওবায়দুল্লাহ ০১ মে ১৯৬০ হতে ৩০ মে ১৯৬১ পর্যন্ত, (০৪) মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদ, দ্বিতীয়বার ০১ জুন ১৯৬১ হতে ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত, (০৫) সাতকানিয়া নিবাসী মাওলানা শফিউল আলম ২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৫ হতে ৩০জুন ১৯৬৬ পর্যন্ত, ০৬. আনোয়ারা নিবাসী মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুস ৩০ জুলাই ১৯৬৬ হতে ১৯৬৮ হতে ৩০ জুন ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত, (০৭) ছাগলনায়ার মাওলানা ছৈয়দ আহমদ ০১ জুলাই ১৯৬৯ হতে ৩০ জুলাই ১৯৭২ পর্যন্ত, (০৮) বাঁশখালীর মাওলানা বজল আহমদ ০১ আগস্ট ১৯৭২ হতে ০৫ নবেম্বর ১৯৮০ পর্যন্ত, (০৯) ফটিকছড়ি নিবাসী মাওলানা আ.ন.ম আব্দুশ শাকুর ০৬ নবেম্বর ১৯৮০ হতে ৩০ নবেম্বর ১৯৮৪ পর্যন্ত, (১০) মাওলানা মুহাম্মদ মুজতবা ০১ ডিসেম্বর ১৯৮৪ হতে ৩০ নবেম্বর ১৯৮৬ পর্যন্ত, (১১) মাওলানা আ.স.ম আব্দুশ শাকুর ভারপ্রাপ্ত ০১ ডিসেম্বর ১৯৮৬ হতে ৩১ মে ১৯৮৮ পর্যন্ত, (১২) হাটহাজারী নিবাসী মাওলান এ. এ.এম সাফওয়ানুল করিম (জন্ম ১ সেপ্টেম্বর ১৯৫৭) ০১ জুন ১৯৮৮ হতে কর্মরত। এটি ০১ জুন ১৯৬৩ খ্রি. দাখিল, ০১ জানুয়ারি ১৯৬৯ খ্রি. আলিম ও ০১ জুলাই ১৯৭৭ খ্রি. ফাযিল মঞ্জুরী পায়। ১৫ বছর সভাপতি ছিলেন আলহাজ্ব ফরিদুল আলম চৌধুরী তার আমলে মাদবাসার বৈপ্লবিক উন্নতি হয়। ২০০১ খ্রি. মাদবাসার

১. অফিস রেকর্ড, পতেঙ্গা ইসলামীয়া ফাযিল মাদরাসা, চট্টগ্রাম, তথ্যদাতা: মাওলানা জানে আলম, অধ্যক্ষ, অত্র মাদরাসা, মাওলানা হোসাইন আহমদ: পতেঙ্গা ইসলামিয়া আলিয়া মাদ্রাসা পরিচিতি ও অবদান, *রহবর*, পৃ. ১৪

অধ্যক্ষ শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধান হিসেবে সনদ ও পুরস্কার লাভ করেন। মাদরাসার অধীনে হিফজখানাও আছে।[১]

পুইছড়ি ইসলামিয়া কামিল (এম.এ) মাদরাসা, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম জেলার বাশখালী উপজেলার পুইছড়ি ইউনিয়নের বিশিষ্ট শিল্পানোরাগী মরহুম ইজ্জত আলী চৌধুরী (১৮৫৫-১৯৪৭খ্রি.) ১৯১১ খ্রি. এই মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এই মাদরাসার যাবতীয় ব্যয় বহন করতেন। মাদরাসার জন্য ১৯৩০ খ্রি. ২০ একর উর্বর ধানি জমি ওয়াকফ করে রেজিস্ট্রিক করে দেন। যা মাদরাসার ভোগ দখলে বয়েছে। মিয়ানমারের আরকান, কক্সবাজারের টেকনাফ হতে অসংখ্য শিক্ষার্থী এখানে আসত। ১৯৩৮ খ্রি. মাদরাসাটি আলিম, ১৯৪৬ খ্রি. ফাযিল হয়। বর্তমানে কামিল চালু হয়েছে।

যারা সুপার/অধ্যক্ষ ছিলেন-

০১. মাওলানা মুহাম্মদ হোসাইন (বাঁশখালী) (১৯১১-১৯৯৭)

০২. মাওলানা আব্দুল কাদের (মনকিরচর) (১৯১৭-১৯২৫)

০৩. মাওলানা ফয়েজুল্লাহ (ঢেমুশিয়া) (১৯২৫-১৯৩০ সাল)

০৪. মাওলানা আবুল খায়ের (রামু) (৯৯৩০-১৯৪৬)

০৫. মাওলানা শফিকুর রহমান (প্রকাশ বড় হুজুর) (১৯৪৬-১৯৪৮)

০৬. মাওলানা জানে আলম (ফটিকছটি) (১৯৪৮-১৯৪৯ সাল)

০৭. মাওলানা আব্দুল হেসেন (বাঁশখালী) (১৯৪৯-১৯৫৩ সাল),

০৮. মাওলানা মুফতি ইউসুফ ইসলামাবাদী (ফতেহপুর) (১৯৫৩-১৯৫৬)

০৯. মাওলানা আব্দুর রহমান চৌধুরী (পুইছড়ি) (১৯৫৬-১৯৬০)

১০. মাওলানা এলাহী বখশ (প্রকাশ ছোট হুজুর) (১৯৬০-১৯৬২)

১১. মাওলানা শফিকুর রহমান (প্রকাশ বড় হুজর) (১৯৬২-১৯৬৪)

১২. মাওলানা এলাহী বকশ (প্রকাশ ছোট হুজর) (১৯৬৪-১৯৬৮)

১৩. মাওলানা আব্দুল লতীফ (ছনুয়া) (১৯৬৮-১৯৭৬)

১৪. মাওলানা শামসুল ইসলাম (পুঁইছড়ী) (১৯৭৬-১৯৮৫)

১৫. মাওলানা ক্বারী মাহমুদুর রহমান (১৯৮৫-১৯৮৬।

১৬. মাওলানা আব্দুল জব্বার কাদেরী (আনোয়ারা) (১৯৮৬-১৯৯৩)

১৭. মাওলানা মুজাফফর আহমদ (১৯৯৩-২০০২)।

---

১. তথ্যদাতা: মাওলানা এ. এ. এম সাফওয়ানুল করিম, অধ্যক্ষ অত্র মাদরাসা, অফিস রেকর্ড, ফতের নগর অদুদিয়া মাদরাসা, রাউজান, চট্টগ্রাম।

১৮. মাওলানা আশরাফুজজামান ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ (২০০২-২০০৪) ২০০৪-৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত নিয়মিত অধ্যক্ষ।

১৯. সাবেক উপাধ্যক্ষ মাওলানা মুশারফ হুসাইন ০১ জানুয়ারী ২০১৬ হতে ০১ মে ২০১৬ পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, ০২ মে ২০১৬ হতে অদ্যাবধি নিয়মিত অধ্যক্ষ। এ মাদরাসার উল্লেখযোগ্য কৃতি ছাত্র মাওলানা শফিকুর রহমান (প্রকাশ বড় হুজুর), মাওলান এলাহী বখশ (প্রকাশ ছোট হুজুর), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. আব্দুল করিম, বাংলাদেশ জামাতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্ম পরিষদ সদস্য মাওলানা মুমিনুল হক চৌধুরী প্রমুখ।[১] ২০১৭ খ্রি. ডিসেম্বরে ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় হতে কামিল হাদীস অনুমতি লাভ করে।[২]

বশিরিয়া আহমদিয়া ফাযিল (ডিগ্রি) মাদরাসা, সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম

দ্বীপ উপজেলা সন্দ্বীপের সদরে রহমতপুরে স্থানীয় শিক্ষানুরাগী জনাব বশীর উল্লাহ সাব-রেজীস্ট্রার ও ফেনী নিবাসী মুন্সি আহমদ উল্লাহ খান নায়েক ১৯০২ খ্রি. এটি প্রতিষ্ঠা করেন। কলকাতা আলিয়া মাদরাসার সাবেক প্রিন্সিপাল মাওলানা জিয়াউল হক (তিনি সন্দ্বীপের অধিবাসী ছিলেন) এর প্রচেস্টায় ১৩ ডিসেম্বর ১৯১২ খ্রি. দাখিল, আলিম ও ফাযিল এক সাথে সরকারী মঞ্জুরী লাভ করে। মাওলানা মুহাম্মদ মুছা এর সুপার ছিলেন। পরে হাফেজ মাওলানা আব্দুল মালেক ও হাতিয়া নিবাসী মাওলানা নিয়াজুর রহমান সুপারের দায়িত্ব পালন করেন। ২০ এপ্রিল ১৯৮৭ হতে অদ্যাবধি সন্দ্বীপ নিবাসী মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছ (জন্ম ০১ জানুয়ারী ১৯৬১) অধ্যক্ষ আছেন। ২০১৩ খ্রি. সন্ধিপে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হয়ে ১,০০,০০০ এক লক্ষ টাকা পুরস্কার লাভ করো।[৩]

জাফরাবাদ ফাযিল (ডিগ্রি) মাদরাসা, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম

দক্ষিণ চট্টগ্রামের চন্দনাইশ উপজেলার সর্ব দক্ষিণে বৈলতলী ইউনিয়নের সাঙ্গু নদীর অর্ধ কিলোমিটার উত্তরে বশরনগরের অধিবাসী চট্টগ্রাম দারুল উলুম কামিল মাদরাসার কৃতি ছাত্র মাওলানা মুফতী শফিউর রহমান ১৯৫৫ খ্রি. এই মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ০১ জানুয়ারি ১৯৫৮ খ্রি. দাখিল, ০১ জুলাই ১৯৬৪ খ্রি. আলিম ০১ জুলাই ১৯৮৫ খ্রি. ফাযিল মঞ্জুরী মঞ্জুরী লাভ করে। মাওলানা শফিউর রহমান প্রতিষ্ঠাতা সুপার হিসেবে ০১ জানু ১৯৫৫ হতে ২২ জুলাই

---

১. অফিস রেকর্ড, পুইছড়ী ইসলামীয়া কামিল মাদরাসা বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।

২. তথ্যদাতা: মাওলানা মুশাররফ হোসাইন, অধ্যক্ষ, পুইছড়ি ইসালামিয়া কমিল মাদরাসা, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।

৩. অফিস রেকর্ড, বশীরিয়া আহমদিয়া ফাযিল মাদরাসা, সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম; তথ্যদাতা: মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছ, অধ্যক্ষ, বশিরিয়া আহমদিয়া ফাযিল মাদরাসা, সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম।

১৯৫৭ পর্যন্ত ছিলেন। ২৩ জুলাই ১৯৫৭-৩১ মে ১৯৭২ পর্যন্ত মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন,(চরতী), ০১ জুন ১৯৭২ হতে ৩০ নবেম্বর ১৯৭৭ পর্যন্ত মাওলানা আবুল বশর (জাফরাবাদ) সুপার ছিলেন। এরপর খ্যাতিমান মুহাদ্দিস মাওলানা শামসুল ইসলাম হেলালী (জাফরাবাদ) ০১ ডিসেম্বর ১৯৭৭ হতে ৩০ ডিসেম্বর ১৯৮৪ পর্যন্ত, মাওলানা আব্দুর রউফ (বাঁশখালী) ২৫ জানুয়ারি ১৯৮৫ হতে ৩০ জুন ১৯৮৬ পর্যন্ত, মাওলানা সফওনুল করিম (হাটহাজারী মনদাকিনী) ০১ জুলাই ১৯৮৬ হতে ৩০ জুলাই ১৯৮৮ পর্যন্ত, মাওলানা আব্দুর রহমান (সাতকানিয়া) ০১ জুন ১৯৮৮ হতে ৩০ নবেম্বর ১৯৯১ পর্যন্ত, মাওলানা শামসুল ইসলাম হেলালী (২য় বার) ০১ ডিসেম্বর ১৯৯১ হতে ১৯ জুলাই ১৯৯৯ পর্যন্ত, মাওলানা ইউসুফ বিন নূরী (ভারপ্রাপ্ত) ২০ জুলাই ১৯৯৯ হতে ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০০ পর্যন্ত, মাওলানা বদি আহমদ (বাঁশখালী) ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০০০ হতে ১৭ মে ২০০৫ পর্যন্ত, মাওলানা এশফাকুর রহমান শওকী বাশখালী (ভারপ্রাপ্ত) ১৮ মে ২০০৫-২২ ডিসেম্বর ২০০৬, মাওলানা মুহাম্মদ আইয়ুব (কক্সবাজার) ২৩ ডিসেম্বর ২০০৬ হতে ৩১ জানা ২০১১ পর্যন্ত, মাওলানা এশফাকুর রহমান শওকী (ভারপ্রাপ্ত ২য় বার) ০১ ফেব্রুয়ারী ২০১১ হতে ৩০ মার্চ ২০১২ পর্যন্ত, মাওলানা মুহাম্মদ হোসাইন রুমি (চন্দনাইশ, ভারপ্রাপ্ত) ০১ এপ্রিল ২০১২-৩০ এপ্রিল ২০১২ পর্যন্ত, মুহাম্মদ সাইফুদ্দীন (বাংলা প্রভাষক, ভারপ্রাপ্ত) ০১ মে ২০১৩ হতে ৩০ মে ২০১৩ পর্যন্ত অধ্যক্ষ ছিলেন। মাওলানা আব্দুল গফুর ০১ জুন ২০১৩ হতে অদ্যাবধি।[১]

চট্টগ্রাম সলিমা সিরাজ মহিলা ফাযিল (ডিগ্রি) মাদরাসা, চট্টগ্রাম

দক্ষিণ চট্টগ্রামের চন্দনাইশ নিবাসী বিশিষ্ট সমাজ সেবক মরহুম এডভোকেট সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (১৯২০-১০/১২/১৯৯৫) চট্টগ্রাম শহরের কোতোয়ালী থানার জামালখান এলাকায় ০১ জানুয়ারি ১৯৮১ খ্রি. এই মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠাতা নিজের এবং স্ত্রীর নাম সলিমা খাতুন এর নাম মিল রেখে মাদরাসার নাম রাখেন সলিমা সিরাজ মহিলা মাদরাসা। এটি চট্টগ্রাম সিটির একমাত্র আলীয়া ধারার মহিলা ফাযিল মাদরাসা।

১ম-৫ম শ্রেণি পর্যন্ত ছাল-ছাত্রী অধ্যয়ন করে ৬ষ্ঠ হতে ফাযিল পর্যন্ত শুধু ছাত্রীরায় অধ্যয়ন করে। ০১ জানুযারি ১৯৯০ খ্রি. বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড হতে একাডেমিক স্বীকৃতি লাভ করে। ০১ জুলাই ১৯৯৩ খ্রি. সরকারী মঞ্জুরী লাভ করে। ০১ জুলাই ১৯৯৭ খ্রি. মাদরাসাটি আলিম, ০১ জুলাই ২০০৪ খ্রি. ফাযিল একাডেমীক স্বীকৃতি লাভ করে।[২] এই মাদরাসার অধ্যক্ষগণ হলেন, মাওলানা আনোয়ারুল ইসলাম, মাওলানা আজীজুল হক কুতুবী,

১. অফিস রেকর্ড, জাফরাবাদ ফাযিল মাদরাসা, চট্টনাইশ, চট্টগ্রাম।
২. অফিস রেকর্ড, সলিমা-সিরাজ মহিলা ফামিল (ডিগ্রি) মাদরাসা।

মাওলানা হুমায়ন কবির (১৯৯৩-১৯৯৮) খ্রি. জুন পর্যন্ত। মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রীস ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, মাওলানা এয়াকুব আলী খান (০১ জানু ১৯৯৭ হতে ০৬ ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত অধ্যক্ষ ছিলেন। তার আমলে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ছিলেন ২/৩ বৎসর মাওলানা শাহিনা বেগম। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মাদ মুছা। মাদরাসাটি দাখিলে ১১ এবং আলিমে ১৬ তম স্থান করে। এখানে প্রবীন শিক্ষকরা হলেন, শায়খুল হাদীস মাওলানা মকসুদ আহমদ, বিশিষ্ট মুহাদ্দিস মাওলানা ফোরকান উদ্দীন চৌধুরী, মাওলানা মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, মাওলানা মুহাম্মাদ ইদ্রীস, শাহেদা বেগম ও নিলুফার জাহান প্রমুখ উল্লেখ যোগ্য।[১] এটি নারী সমাজে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে অনন্য ভূমিকা রেখে চলছে। অনেক ছাত্রী এম.বি.বি.এস পাস করে ডাক্তার হয়েছে।

ফটিকছড়ি জামেউল উলুম ফাযিল (ডিগ্রি) মাদরাসা, চট্টগ্রাম

উত্তর চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলার পৌরসভা সদরের বিবিরহাট বাজারের পূর্বপাশে সুন্দরপুর নিবাসী প্রখ্যাত বুজুর্গ মাওলানা আমিন উল্লাহ (র:) মাদরাসাটি ১৯০৪ খ্রি. প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিনি প্রতিষ্ঠাতা সুপার ছিলেন। ১৯৩৭ হতে ১৯৭৭ পর্যন্ত মাওলানা আহমদ হুসাইন (১৯১৩ হতে ১৯৭৭ খ্রি.) অধ্যক্ষ ছিলেন। ০১ জুন ১৯৪০ খ্রি. দাখিল, আলিম ও ফাযিল শ্রেণি প্রথম অনুমতি লাভ করে। এরপর মাওলানা জালাল আহমদ, মাওলানা ছালাহ উদ্দীন আল ইমামী, মাওলানা এম. সিরাজুল হক (জন্ম ০১ মার্চ ১৯৫২) ১৯৭৮-১৯৮১ পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ এবং ০৭ সেপ্টেম্বর ১৯৮২-১৯৮৮ খ্রি.র মে পর্যন্ত অধ্যক্ষ ছিলেন। এরপর মাওলানা এস.এম ইকবাল মোজাদ্দেদী (০১ মার্চ ১৯৩৯খ্রি.) ১৯৮৯-১৯৯০ পর্যন্ত, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম (জন্ম ০১ জুলাই ১৯৫০ খ্রি.), মাওলানা আ.ন.ম. দেলাওয়ার হোসাইন ও মাওলানা তাজ উদ্দীন কয়েক বছর অধ্যক্ষ ছিলেন। ০১ জানুয়ারী ১৯৯৪ হতে অধ্যক্ষ মাওলানা ছৈয়দ ইব্রাহিম কাসেমী (জন্ম ৩১ আগস্ট ১৯৬৫ খ্রি.)। উল্লেখযোগ্য শিক্ষকগন, মাওলানা মুফতি নজির আহমদ, হালি শহরের প্রখ্যাত বুজুর্গ হাফেজ মুনির উদ্দীন (র:) এর খলিফা মাওলানা ছৈয়দ মীর আহমদ মুনিরী (১৯১৫-১৯৭৮), মাওলানা জানে আলম (১৯১৬-১৯৮৭), মুহাদ্দিস ও মুফতি মাওলানা জালাল আহমদ, মাওলানা আহমদ হুসাইন ভুজপুরী, মাওলানা ওয়াহিদুর রহমান, মাওলানা মুহাম্মদ নোমান, মাওলানা মাহমুদুল হক, মুহাদ্দিস মাওলানা দেলাওয়ার হুসাইন (১৯৩৫-২০০১) ও মাওলানা সুলতান আহমদ প্রমুখ। এ মাদরাসার উল্লেখযোগ্য কৃতি ছাত্র হল ফটিকছড়ির শাহ মাওলানা আহমদ উল্লাহ মাইজভান্ডারী (র:)

১. তথ্যদাতা, মাওলানা মুহাম্মদ মুছা, ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, সলিমা-সিরাজ মহিলা ফাযিল মাদরাসা, রেজাউল করিম, সিনিয়র শিক্ষক সলিমা-সিরাজ মহিলা ফাযিল মাদরাসা।

(প্রকাশ বড় মাওলানা সাহেব) এর ভাতিজা ও খলিফা মাওলানা গোলামুর রহমান মাইকভান্ডারী। (প্রকাশ ছোট মাওলানা সাহেব) (ওফাত ১৯৩৭) মাওলানা শাহ সৈয়দ মীর আহমদ মুনিরী (র:), আলজামিয়া কুরআনিয়া তালিমুদ্দীন মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা নুর আহমদ, মাওলানা জানে আলম, মাওলানা দেলাওয়ার হুসাইন, মাওলানা সুলতান আহমদ, মাওলানা এ.কে মাহমুদুল হক, ড. সাইয়েদ আবু নোমান, সাবেক অধ্যক্ষ বায়তুশ শরফ আদর্শ মাদরাসা, চট্টগ্রাম প্রমুখ। এটি ২০১৫ খ্রি. উপজেলার শ্রেষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচিত হয়।[১]

সন্দ্বীপ কারামতিয়া ফাযিল (ডিগ্রি) মাদরাসা, চট্টগ্রাম

বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী কাজী আব্দুল আহাদ খান বাহাদুর মৌলভী খবিরুল হক ও হাজী লুৎফর রহমান প্রমুখ ব্যক্তিগণ ১৯৪৯ খ্রি. এটি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রখ্যাত বুর্জুগ মাওলানা কারামত উল্লার জৈনপুরী (র:) এর নামানুসারে এর নামকরণ করা হয়। ১৯৫১ খ্রি. দাখিল ও আলিম এবং ১৯৭৮ খ্রি. ফাযিল মঞ্জুরী লাভ করে। ১৯৪৯ খ্রি. হাফেজ মাওলানা আসাদুল হক প্রথম সুপার হন। এরপর মাওলানা হাবীবুল্লাহ ১৯৭১-১৯৭৫ পর্যন্ত অতঃপর বিশিষ্ট মুহাদ্দিস মাওলানা কামাল উদ্দীন খান (যিনি রায়পুর আলিয়া মাদরাসার প্রিন্সিপাল ছিলেন) ১৯৭৫ হতে ১৯৮২ পর্যন্ত, রামগতি নিবাসী মুহিব্বুল্লাহ ১৯৮২-২০১৩ পর্যন্ত অধ্যক্ষ, মাওলনা সিরাজুল মাওলা (জন্ম ০১ মার্চ ১৯৬২) ১৫ জুন ২০১৩ হতে ০৭ ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ছিলেন। ০৮ ডিসেম্বর ২০১৪ হতে অধ্যক্ষ মাওলানা নাজের আহমদ। উল্লেখযোগ্য শিক্ষকগন হল- মাওলানা সোলাইমান, মাওলানা মুস্তফা কামাল, মাওলানা আব্দুল্লাহ, মাওলানা সুলতান আহমদ প্রমুখ। ১৯৮১ খ্রি. এটি সন্দ্বীপ উপজেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচিত হয়।[২] এছাড়া চট্টগ্রামের উপজেলা সমূহের মধ্যে বিভিন্ন মাদরাসা গড়ে উঠে। নিম্নে উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানের নাম ও প্রতিষ্ঠাকাল উল্লেখ করা হলো-

লোহাগাড়া উপজেলা

বড়হাতিয়া মিশকাতুল উলুম দাখিল মাদরাসা ১৯৪১, বড়হাতিয়া আয়েশা ছিদ্দিকা মহিলা দাখিল মাদরাসা ১৯৮৮,কুমিবাঘোন আখতার উলুম দাখিল মাদরাসা, চুনতী হাফেজীয়া আর্দশ মাদরাসা ১৯৯১, সাতগড় ইবতিদায়ী মাদরাসা, আধুনগর আখতারিয়া দাখিল মাদরাসা ১৯৭৫ , আধুনগর রশিদের ঘোনা হাফেজীয়া ইবতিদায়ী মাদরাসা ১৯৮৯, গৌড়স্থান আখতার উলুম দাখিল মাদ্রেরাসা ১৯৭৪, কলাউজান দারুচ্ছুন্নাহ আলিম মাদরাসা ১৯৬০, কলাউজান খতিবিয়া দাখিল মাদরাসা ১৯৯৩, শাহপীর ইবতিদায়ী মাদরাসা ১৯৮৩, ইলাহী মুহাম্মদী ইবতিদায়ী

১. অফিস বেকর্ড, ফটিকছড়ি জামেউল উলুম ফাযিল ডিগ্রি মাদরাসা, চট্টগ্রাম।
২. অফিস রেকর্ড, সন্দ্বীপ কারামতিয়া ফাযিল মাদরাসা, সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম।

মাদরাসা ১৯৮৪, পদুয়া মিশকাতুন্নবী দাখিল মাদরাসা ১৯৭৪, চরম্বা নোয়ারবিলা কাদেরিয়া আদর্শ দাখিল মাদরাসা ১৯৬৪, চরম্বা জামেউল উলুম দাখিল মাদরাসা ১৯৮৫, সুখছড়ি রহমানিয়া দাখিল মাদরাসা ১৯৮৯, আলহেরা দাখিল মাদরাসা ১৯৮৭, ধলিবিলা রহমানিয়া মাদরাসা ১৯৯০।

লোহাগাড়া ফাযিল মাদরাসাসমূহ

০১. বড়হাতিয়া এশাতুল উলুম ফাযিল মাদরাসা ১৯৪৬।

০২. আমিরাবাদ সুফিয়া ফাযিল (ডিগ্রি) মাদরাসা ১৯৪৭।

০৩. কলাউজান শাহ রশিদিয়া ফাযিল (ডিগ্রি) মাদরাসা ১৯৭৬।

০৪. লোহাগাড়া ইসলামিয়া ফাযিল মাদরাসা (ডিগ্রি) মাদরাসা ১৯৪৫।

০৫. দক্ষিণ সুখছড়ি খালেকিয়া ফাযিল (ডিগ্রি) মাদরাসা ১৯৭৫।

০৬. পুটিবিলা হামেদিয়া ফাযিল (ডিগ্রি) মাদরাসা ১৯৭৫।

০৭. চুনতী ফাতেমা বতুল মহিলা ফাযিল মাদরাসা ১৯৮২।

সাতকানিয়া উপজেলা

রাসুলাবাদ ফাযিল (ডিগ্রি) মাদরাসা ১৯৪৬, বাজালিয়া হেমায়তুল ইসলাম ফাযিল (ডিগ্রি) মাদরাসা ১৯৪৪, কেরানীহাট ফাযিল (ডিগ্রি) মাদরাসা ১৯৪৮, ছদহা খাইরিয়া আলিম মাদরাসা ১৯৭২, সৈয়দাবাদ দুদু ফকির আলিম মাদরাসা ১৯৭২, সোনাকানিয়া মজিদিয়া মাদরাসা ১৯৪৬ ইত্যাদি।[১]

১. ড. হেলাল উদ্দীন মুহাম্মদ নোমান, *চট্টগ্রামের আলিম সমাজ, জীবন ও কর্ম* (প্রকাশক: শাহনাজ বেগম, প্রকাশকাল: ২০১৬, খ্রি.), পৃ ২৩-২৪

চট্টগ্রাম জেলার কওমী মাদরাসা

সুদূর অতীতকালে পূর্ব ভারতের বিভিন্ন এলাকাতে বিশেষ করে ভারতের দেওবন্দ, সাহারানপুর, মুরাদাবাদ ও রামপুরা প্রভৃতি স্থানে প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাসমূহের অনুকরণে বাংলাদেশে সরকারি আওতাবহির্ভূত কতগুলো মাদরাসা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এসব মাদরাসা বাংলাদেশে কওমি, খারিজি বা দরসে নিজামি মাদরাসা নামে পরিচিত। এ সমস্ত মাদরাসায় কুরআন, হাদীস, তাফসির, ফিকাহ, কালাম এবং তৎসঙ্গে মানতিক বা তর্কশাস্ত্র, অলঙ্কারশাস্ত্র, ইসলামি আকাইদ, ফারায়িজ, ইসলামের ইতিহাস, 'আরবী সাহিত্য, ব্যাকরণ, ইলমে নাহু ও সরফ ইত্যাদি বিষয় পড়ানো হয়। আধুনিককালে মাতৃভাষা বাংলার পাশাপাশি, ইংরেজি, গণিত ও সমসাময়িক বিষয়, কোনো কোনো মাদরাসায় বর্তমানে পাঠদান করা হয়ে থাকে।[১] এসব মাদরাসা বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় নিজেদের পরিচালনায় কওমি মাদরাসা বোর্ডের অধীনে পরিচালিত হয়। শিক্ষার্থীরা নামমাত্র মূল্যে আবাসিকে অবস্থান করেন অথবা জায়গির থেকে পড়াশুনা করেন। স্থানীয় জনতা পারলৌকিক কল্যাণের জন্য স্বেচ্ছায় দান-খয়রাত করে মাদরাসা পরিচালনায় সহায়তা করে থাকেন। এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বেতন-ভাতা ও অনুদানের অর্থ স্থানীয় জনগণ ও দানশীলদের চাঁদার টাকা দিয়ে প্রদান করা হয়ে থাকে। তবে শিক্ষকদের যে বেতন দেয়া হয়ে থাকে তা জীবননির্বাহের জন্য মোটেও পর্যাপ্ত নয়। তবুও ইলমের প্রচার-প্রসার এবং পূণ্যের কাজ মনে করে তারা ইবাদতের অংশ হিসেবেই এসব মাদরাসাসমূহে শিক্ষকতা করে থাকেন। বর্তমান বাংলাদেশে ৪,০০০ টিরও বেশি কওমি মাদরাসা রয়েছে।[২] সমগ্র বাংলাদেশে হাতে গোনা কিছু মাদরাসা ব্যতীত কোনো মাদরাসারই শ্রেণিবিন্যাস নেই। বড় বড় কিছু কওমি মাদরাসা নয়টি শ্রেণিতে বিভক্ত করে তাদের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত করেন। উক্ত নয়টি শ্রেণি: (১) ইবতিদায়ি আউয়াল (২) ইবতিদায়ি সানি (৩) উসতা আউয়াল (৪) উসতা ছানি (৪) ছানুবি আউয়াল (৬) ছানুবি ছানি (৭) নেহায়ি আউয়াল (৮) নেহায়ি সানি (৯) তাকমিল।[৩] কোনো কোনো মাদরাসায় ১৫ শ্রেণিতে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্ত করা হয়ে থাকে। আর কোনো কোনো কওমি মাদরাসা শিক্ষাকে ১৬টি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করে থাকে। যেমন: মারহালাতুল ইবতিদাইয়াহ (প্রাইমারি), মারহালাতুল মুতাওয়াসসিতাহ (নিম্নমাধ্যমিক), মারহালাতুস সানুবিয়াহ উলিয়া (মাধ্যমিক),

১ প্রাগুক্ত পৃ. ৩৫৫

২ প্রাগুক্ত পৃ. ৩৫২

৩ প্রাগুক্ত পৃ. ৩৭৮; (দ্র. শ্রেণিসমূহের নাম ঢাকার লালবাগ জামেয়া-ই-কুরআনীয়া আরাবিয়ার রুটিন বোর্ড থেকে সংগ্রহ করা।

মারহালাতুল ফজিলত (স্নাতক) মারহালাতুত তাফসির (স্নাতকোত্তর)।[১] এ সমস্ত মাদরাসাগুলো স্থানীয় কয়েকটি মাদরাসা নিয়ে একটি বোর্ড গঠন করে পরীক্ষা ও ফলাফল তৈরি করে থাকে। তবে বর্তমানে পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলাফল সুষ্ঠুভাবে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বেসরকারি মাদরাসা তালিমি বোর্ড বা বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ বা বাংলাদেশ কওমি মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড নামে ১৯৭৮ খ্রি. একটি বেসরকারি শিক্ষা বোর্ড গঠিত হয়।[২] এ সমস্ত মাদরাসাগুলোতে 'আরবী ভাষা ও সাহিত্যচর্চা হয় নিজস্ব গতিতে, ফলে 'আরবী চর্চার বিকাশ ঘটে ব্যাপকভাবে।

চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ কওমী মাদরাসাসমূহ

আল জামিয়া আহলিয়া দারুল উলুম মঈনুল ইসলাম মাদরাসা, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম

হাকিমুল উম্মাত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র:) (১৮৬১-১৯৪৩) এর ছাত্র মাওলানা হাবিব উল্লাহ (১৮৬৫-১৯৪৬) মাওলানা ফজলুর রহমান গঞ্জ মুরাদাবাদী (র:) এর অন্যতম খলিফা মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদ (১৮৫০-১৯১০), মাওলানা আব্দুল হামিদ (১৮৭০-১৯২০) ও মাওলানা সুফী আজীজুর রহমান (১৮৬২-১৯২১) প্রমুখ মনিষীদের আপ্রাণ প্রচেষ্টায় ১৯০১ খ্রি. এই মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। মাওলানা রশিদ আহমদ গাংগুহী (র:) (১৮২৮-১৯০৫) এক খলিফা মাওলানা জমির উদ্দীন (র:) (১৮৭৮-১৯৪০) এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক যারা মহাপরিচালক ছিলেন মাওলানা হাবিবুল্লাহ-১৯০৯-১৯৪৩,মাওলানা আব্দুল ওয়াহাব ১৯৪৩-১৯৮৯, মাওলানা হাফেজ হামেদ ১৯৮১-১৯৮৭ খ্রি. হতে আল্লামা হুসাইন আহমদ মাদানী (র:) এর খলিফা আল্লামা মুফতি আহমদ শফি। ১৯০৮ সালে এই মাদরাসায় দাওরায়ে হাদীস খোলা হয়। মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী লিখেছেন, বাংলাদেশে প্রথম সিহাহ সিত্তাহর শিক্ষা এখানে দেয়া হয়। এটিই এখনো হাদীস শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র।[৩]

আল জামেয়া আল ইসলামিয়া জমিরিয়া কাসেমুল উলুম,পটিয়া, চট্টগ্রাম

১ প্রাগুক্ত পৃ. ৩৮৪; *বাংলাদেশ কওমি মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড*, ১৯৮৪, পৃ. ১৫

২ *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা*, পৃ. ৩৮৩

৩. আল-জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলূম মঈনুল ইসলাম কর্তৃক প্রকাশিত, *মাসিক আল-মুঈন*, ২০২৪ খ্রি. পৃ. ৫১

এটি পটিয়া উপজেলার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত। চরকানাই নিবাসী প্রখ্যাত বুযুর্গ মাওলানা মুফতী আজীজুল হক (১৯০৫-১৯৬১) স্বীয় মুর্শিদ মাওলানা জমীর উদ্দীন (১৮৭৮-১৯৪০) এর পরামর্শে ও নির্দেশনা মতে ১৯৩৭ খ্রি. এই মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়।[১]

১৯৪৬ খ্রি. দাওরায়ে হাদীস খোলা হয়। এই মাদরাসার মুহতামিম হিসাবে ছিলেন মুফতী আজীজুল হক (র:), মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুছ (র:), মাওলানা মুহাম্মদ হারুন ইসলামাবাদী (র:), মাওলানা নুরুল ইসলাম কদীম (র:), মাওলানা আব্দুল হালিম বোখারী (র:), মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযা, বর্তমানে মুহতামিম হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন, মাওলানা আবু তাহের নদবী। এখানে শায়খুল হাদীস ছিলেন আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রাহ:) এর ছাত্র মাওলানা আহমদ, নেজামে ইসলাম পার্টির সভাপতি বিশিষ্ট পর্লামেন্টেরিয়ান খতিবে আজম আল্লামা ছিদ্দিক আহমদ (র:), মাওলানা ইসহাক গাজী (র:), মাওলানা ফজলুর রহমান, মাওলানা আহমদ উল্লাহ, ২০২৫ খ্রি. শায়খুল হাদীস মাওলানা হাফেয আহমদুল্লাহ (র:) ইনতিকালের পর মুফতী শামসুদ্দীন জিয়া শায়খুল হাদীসের পদ অলঙ্কৃত করেছেন। এই মাদরাসার উল্লেখ্যযোগ্য বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও উসতাদগণ হলো-মাওলানা আবুল হাছান, মাওলানা উবায়দুর রহমান, মাওলানা আমির হুসাইন, মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ ইব্রাহিম, মাওলানা আলী আহমদ বোয়ালভী (র:), মাওলানা মুফতী আব্দুল রহমান, মাওলানা সুলতান যউক নদভী (র:), মাওলানা কারী মুহাম্মদ ইলিয়াছ প্রমুখ। এখানে অনেক ছাত্র লেখাপড়া করে।

আল জামিয়া আল আরবিয়া জিরি মাদরাসা, পটিয়া, চট্টগ্রাম

এটি পটিয়ায় জিরি গ্রামে অবস্থিত। বৃহত্তর চট্টগ্রামে এটি দ্বিতীয় প্রাচীন কওমী মাদরাসা। ১৯১০ খ্রি. (১৩২৮ হিজরী) জিরির প্রখ্যাত আলিম মাওলানা আহমদ হাছন (১৮৮২-১৯৬৭) এটি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২০ হতে দাওরায়ে হাদীস চালু হয়। যারা মুহতামিম ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আহমদ হাছন, মাওলানা মুফতী নুরুল হক, জিরি নিবাসী মাওলানা মুহাম্মাদ তৈয়ব, বর্তমানে মাওলামা খোবাইব। উল্লেখযোগ্য শায়খুল হাদীস, সন্দ্রিপ নিবাসী আব্দুল ওয়াদুদ, পটিয়ার হরিণ খাইন নিবাসী মাওলানা ছালেহ আহমদ, মুফতি নুরুল হক, চন্দ্রনাইশ নিবাসী মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক, মুফতী আজীজুল হক, মাওলানা এয়াকুব, মাওলানা নুরুল আলম, মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ, মাওলানা আহমদ উল্লাহ কাসেমী, মাওলানা মুফতি আহমদ উল্লাহ প্রমুখ। এ মাদরাসার উল্লেখযোগ্য কৃতি ছাত্র হলো: মাওলানা মুফতী আজিজুল হক, মাওলানা মুফতী নুরুল হক, মওলানা ছালেই আহমদ, মাওলানা আমির হোসাইন, মাওলানা মুফতী ইব্রাহিম, হাটহাজারী মাদরাসার শায়খুল আদব মাওলানা মুহাম্মাদ আলী, হাটহাজারী মাদরাসার

১. মওলানা আব্দুল হালীম বোখারী, মুহাদ্দিস, জামেয়া ইসলামিয়া কাসেমুল উলূম পটিয়া, সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, *মাসিক আত্ তাওহীদ বিশেষ সংখ্যা* (চট্টগ্রাম: জামেয়া ইসলামিয়া কাসেমুল 'উলূম পটিয়া, ১৯৮৭), পৃ. ৯

মুহাদ্দিস আব্দুস সালাম, মাওলানা দানেশ আহমদ, মাওলানা গাজী মুহাম্মদ ইসহাক, পটিয়া মাদরাসার ছাদরে মুহতামিম শাহ মাওলানা আলী আহমদ বোয়ালভী, মাওলানা তৈয়ব প্রমুখ।[১]

জামিয়া ইসলামিয়া আজীজুল উলুম, বাবুনগর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম শহর থেকে ৩২ কিলোমিটার উত্তরে ফটিকছড়ি উপজেলার বাবু নগর গ্রামে মাওলানা শাহ মুহাম্মদ হারুন বাবু নগরী এই মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম ছিলেন। বর্তমান মুহতামিম মুহাম্মদ মুহিবুল্লাহ বাবুনগরী। উল্লেখযোগ্য মুহাদ্দিসগণ হল, মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আমিন বাবু নগরী, মাওলানা ওবায়দুর রহমান, মাওলানা নুরুল হক, মুহাদ্দিস ইসহাক আল গাজী, আল্লামা সুলতান যওক নদভী, মাওলানা জোনাইদ বাবুনগরী, মাওলানা হারুন ইসলামাদী, মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুছ, মাওলানা মুহাম্মদ মুহিব্বুল্লাহ, মাওলানা হাবিবুল্লাহ, মাওলানা শফিউল আলম আজিমপুরী ও মাওলানা মুফতি মাহমুদুল হাসান প্রমুখ। এ মাদরাসা হতে মাসিক আল হারুন, আল আফকার, আল-কাইদ,আল-কলম, আস সাফাকা ও জাগরণ প্রভৃতি দেয়াল পত্রিকা প্রকাশিত হয়। জমজম নামে একটি বার্ষিক স্বরণীকা প্রকাশিত হয়।[২]

আল জামেয়াতুল ইসলামিয়া কাসেমুল উলুম, চারিয়া, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম নগরী হতে ২২ কিলোমিটার উত্তরে হাটহাজারী উপজেলার নাজির হাট রোড সংলগ্ন হাটহাজারী দারুল উলুম মইনুল ইসলাম মাদরাসার প্রথম শায়খুল হাদীস সন্দীপ নিবাসী মাওলানা সায়িদ আহমদ এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। চারিয়া নিবাসী মাওলানা আব্দুল জলিল এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠায় অনন্য অবদান রাখেন। প্রতিষ্ঠা সালেই দাওরায়ে হাদীস এখানে চালু হয়। তারপর পর্যায়ক্রমে নিচের শ্রেণি চালু হয়। তখন এখানে শতাবিক ছাত্র দাওরায়ে হাদীস পড়ত। যারা মুহতামিম ছিল, মাওলানা সাঈদ আহমদ, প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল জলিল, মাওলানা হাফিজ সোলাইমান, মাওলানা মুহামম্মদ হারুন, মাওলানা মুহাম্মদ আবু তালেব, মাওলানা বজল আহমদ, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ অদ্যাবধি। উল্লেখ যোগ্য মুহাদ্দিসগণ হলো, মাওলানা সাইয়েদ আহমদ, মাওলানা আব্দুল জলিল, মাওলানা মুহাম্মদ হারুন, মাওলানা মুহাম্মদ আবু তালিব, মাওলান মুফতি মুহাম্মাদ ইউসুফ ইসলামাবাদী,

---

১. শাহ মাওলানা আহমদ হাছান, *মাশায়েখে চাটগাম* (চট্টগ্রাম : ওয়াদুদী দারুল মোতালায়া, জিরি মাদরাসা, ১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ১২৯

২. তথ্যদাতা: মাওলানা মুহিব্বুল্লাহ, মুহতামিম আল জামিয়াতুল আজিজুল উলুম, বাবুনগর, আফিস রেকর্ড, আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া আজিজুল উলুম, বাবুনগর ও মাওলানা অলি আহমদ, মুহাদ্দিস, চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলিয়া মাদরাসা।

মাওলানা মুফতি ইজহারুল ইসলাম চৌধুরী, মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, মাওলানা মুহাম্মদ আবু নাছের, মাওলানা মুফতি আব্দুর রহমান, মাওলানা মুফতি কবির আহমদ, মাওলানা শেখ আহমদ, মাওলানা মুহাম্মদ নোমান প্রমুখ।[১]

আল জামিয়াতুল হামিদিয়া নাছেরুল ইসলাম মাদরাসা, ফতেহপুর, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম

হাটাহাজারী দারুল উলুম মঈনুল ইসলাম মাদরাসার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আব্দুল হামিদ শেষ বয়সে ১৯১৭ খ্রি. হাটহাজারী ফতেহপুর হাটহাজারী সড়কের পাশে এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ইন্তেকাল পর্যন্ত তিনি মুহতামিম ছিলেন। আরো যারা মুহতামিম ছিলেন, মাওলানা সুফি আব্দুল করিম, মাওলানা ইব্রাহীম, মাওলানা ইসমাঈল, প্রতিষ্ঠাতার পুত্র মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ ইউসুফ ইসলামাবাদী, মাওলানা মাহমুদুল হাসান অদ্যাবধি মুহতামিম আছেন। এখানে হিফজখানা, ফোরকানিয়া, মুতাফার্‌রাকাসহ জমাতে ইয়াযদাহুম হতে উলা (ফাযিল) পর্যন্ত চালু আছে। এখানে হাটহাজারী মাদরাসার সিলেবাস অনুসরণ করা হয়। ১ম-৭ম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলা, ইংরেজি, গণিত পড়ানো হয়।[২]

আল জামিয়াতুল আরবিয়া নছীরুল ইসলাম, নাজীরহাট, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম

এটি চট্টগ্রাম নগরের ৩০ কিলোমিটার উত্তরে ফটিকছড়ি উপজেলার নাজিরহাট নিবাসী প্রখ্যাত জমিদার আশরফ আলী চৌধুরী ও নাজিরহাট মিয়াজী বাড়ীর মাওলানা আজীজুর রহমান মিয়াজীর যৌথ প্রচেস্টায় ১৯১২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৪ সালে দাওরায়ে হাদীস খোলা হয়। যারা মুহতামিম ছিলেন, মাওলানা আজীজুর রহমান, মাওলানা নূর আহমদ, মাওলানা আব্দুল কাইয়ুম (ভারপ্রাপ্ত), মাওলানা হাফিজ শামসুদ্দীন, মাওলানা ইদ্রীস অদ্যবধি। উল্লেখযোগ্য শায়খুল হাদীসগণ হলো- মাওলানা এয়ার মোহাম্মদ, মাওলানা সাঈদ আহমদ, মাওলানা শওকাত আলী, মাওলানা আব্দুল হক ইসলামাবাদী, মাওলানা ইসহাক আল গাজী, মাওলানা আবুল হাসান, মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুস, মাওলানা জামাল উদ্দীন প্রমুখ। বর্তমানে যারা আছেন, মুহতামিম মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রীস, মুফতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান (নায়েবে মুহতামিন), মুহাদ্দিস হাফেজ মুহাম্মদ আনোয়ার, মুফতি মুহাম্মাদ ফখরুদ্দীন, মাওলানা মুহাম্মদ

---

১. অফিস রেকর্ড, আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া কাসেমুল উলুম, চারিয়া, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম ও তথ্যদাতা: মাওলানা অলি আহমদ, মুহাদ্দিস, দারুল উলুম আলিয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম।

২. অফিস রেকর্ড, আল জামিয়াতুল হামিদিয়া নাছেরুল ইসলাম মাদরাসা, ফতেহপুর, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

সলিমউল্লাহ, মাওলানা হাফিজ জাফর আহমদ, মাওলানা হাবিবুল্লাহ নদভী প্রমুখ। দাওয়াতুল হক নামে একটি পত্রিকা ১৯৯৩ খ্রি. হতে বের হয়।[১]

আল-জামিয়াতুল মাদানীয়া কাশেফুল উলুম মাদরাসা, শুলকবহর, চট্টগ্রাম

এটি চট্টগ্রাম নাগরীর কোতোয়ালী থানার শুলকবহর নিবাসী মুহতরম মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম ১৯৬৮ সালে প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম ২৯ বছর মুহতামিম ছিলেন রাঙ্গুনিয়া নিবাসী মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল। কথিত আছে পিঠে চাল, ডাল ও সিমেন্টের বস্তাও তিনি বহন করেছেন। বসুন্ধরা ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, ঢাকা ও শাহ জালাল ইসলামী ব্যাংক শরীয়া বোর্ডের পরিচালক, মাওলানা মুফতী আব্দুর রহমান, (১৯১৫-২০১৬) এ মাদরাসার মুহতামিম ছিলেন। এখানে ২০১০ সালে দাওরায়ে হাদীস খোলা হয়। উল্লেখ যোগ্য মুহাদ্দিসগণ হলেন- মুফতী আব্দুর রহমান, বাশখালী নিবাসী বর্তমান মুহতামিম মাওলানা আব্দুল জলিল, আনোয়ারা নিবাসী মাওলানা আব্দুর রহীম এবং ফটিকছড়ি আমতলি নিবাসী মাওলানা আহমদ গণি প্রমুখ। এখানে হিফজ্ব বিভাগ, নুরানী বিভাগ, কিরআত বিভাগ, মুতাফাররাকা বিভাগ, কিতাব বিভাগ, দাওয়াজ দাহুম হতে উলা (ফাযিল) পর্যন্ত ও হাদীস বিভাগ চালু আছে।[২]

আল-জামিয়া ইসলামিয়া হেমায়তুল ইসলাম মাদরাসা, কৈয়গ্রাম, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম শহরের শাহ আমানত সেতু হতে ০৫ কিঃ মিঃ পশ্চিমে পটিয়াস্থ কৈয়গ্রাম নিবাসী মাওলানা আশরফ আলী প্রকাশ মাস্টার আশরফ আলী ও জিরি মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আহমদ হাসান, একই গ্রামের হাটহাজারী মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতার মাওলানা হাবিবুল্লাহ -এর পরামর্শে ১৯০৭ সালে হেমায়াতুল ইসলাম নামে মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন। যা পরে কৈয়গ্রাম আল জামেয়াতুল ইসলামিয়া হেমায়াতুল ইসলাম নামে পরিচিত লাভ করে। তাহফিজুল কোরআন, শিশু শ্রেণি, ইবতিদায়ি স্তর, মুতাফাররাকা (হাফতুম-পানজুম), ৩ বছর মেয়াদী দাখিল স্তর, ২ বৎসর মেয়াদী আলিম স্তর, ২ বৎসর মেয়াদী ফাযিল স্তর (ছওয়ামউলা) ও ১ বৎসর মেয়াদী দাওরায়ে হাদীস। মাদরাসা বোর্ডের ১ম-৫ম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলা, ইংরেজী, গণিতসহ মৌলিক পাঠ্য বইগুলু পাঠ দান করা হয়। যারা মুহতামির ছিলেন, প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আশরফ আলী, মাওলানা অলি আহমদ, মাওলানা মাহবুব আলী, মাওলানা আশরফ আলী (২য় মেয়াদে), মাওলানা রশিদ আহমদ, বর্তমান মুহতামিম মাওলানা মুহাম্মদ হোসাইন। তিনি প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আশরফ আলীর সন্তান। উল্লেখযোগ্য মুহাদ্দিসগন- মাওলানা মুফতী

১. অফিস রেকর্ড, আল জামিয়াতুল আরবিয়া নছীরুল ইসলাম, নাজীরহাট, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
২. অফিস রেকর্ড, আল-জামিয়াতুল মাদানীয়া কাশেফুল উলুম মাদরাসা, শুলকবহর, চট্টগ্রাম।

মুহাম্মদ ইউছুপ ইসলামাবাদী, মাওলানা ইউসুফ চাতরী, মাওলানা মাসউদুল হক পটিয়া, মাওলানা সাঈদ আহমদ, খ্যাতিমান মুহাদ্দিস মাওলানা হারুন শাহ নগরী, ফটিকছড়ি নানুপুর নিবাসী মাওলানা মুজাহেরুল ইসলাম, মাওলানা আজীজুল হক আল মাদানী ও মাওলানা শেখ আহমদ প্রমুখ। উল্লেখযোগ্য কৃতিছাত্র, মাওলানা মুফতী আজীজুল হক, বগুড়া মাদরাসার মুহতামিম মাওলানা ইউসুফ, মিয়া খাঁন নগর মুজাহেরুল উলুম মাদরাসার মুহতামিম মাওলানা লোকমান প্রমুখ।[১]

আল জামেয়াতুল ইসলামিয়া ওবাইদিয়া, নানুপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম

উত্তর চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলার নানুপুরের প্রখ্যাত বুজুর্গ মাওলানা ওবায়দুল হক নানুপুর কালুমুন্সিরহাটে ১৮৯১ সালে তাঁর নিজস্ব জায়গায় নানুপুর হেমায়াতুল ইসলাম নামে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তার ইন্তেকালের পর মাদরাসাটি প্রায় বন্ধ হলে এটির সর্বশেষ মুহতামিম মাওলানা আমিরুদ্দীন ও মাওলানা মাহমুদ ওয়ালী উস্তাদের স্মৃতি ধরে রাখার জন্য এলাকার শিক্ষানুরাগী ফজলুর রহমান মাস্টারের সহায়তায় শাবরিদ খান জামে মসজিদে শিক্ষা কার্যক্রম পুনরায় শুরু করেন। মাদরাসার নতুন নাম করণ করা হয়, 'নানুপুর ওবায়দিয়া মাদরাসা'। পরে মুহতামিম হন মাওলানা জমির উদ্দীন (র:) এর খলিফা মাওলানা মুফতি আজিজুল হক। তিনি বর্তমান স্থানে স্থানান্তর করে নামকরণ করেন, 'ওবাইদিয়া হাফেজুল উলুম মাদরাসা'। তারপর মুহতামিম হন সুলতান আহমদ নানুপুরী। তাঁর আমলে ১৯৭৬ সালে দাওরায়ে হাদীস চালু করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় মাদরাসা বর্তমার অবস্থায় উন্নিত হয়। তাঁরপর মুহতামিম হন মাওলানা শাহ জমির উদ্দিন (র.)। এরপর মাওলানা সালাহউদ্দিন অদ্যাবদি মুহতামিম। উল্লেখযোগ্য শায়খুল হাদীস হলেন, মাওলানা মাসউদুল হক, মাওলানা হাফেজ হারুন, মাওলানা এয়ার মুহাম্মদ, মাওলানা শেখ আহমদ।[২]

আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া আল আরবিয়া মুজাহিরুল উলুম মাদরাসা, মিয়াখাঁন নগর, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে শহরে কোতোয়ালী থানার মিয়াখাঁন নগর নিবাসী মরহুম সুলাইমান ডিলার ও মরহুম সৈয়্যদুর রহমান ভারতের বালিয়া শহর দারুল উলুম দেওবন্দ্র নিবসী হাটহাজারী মইনুল ইসলাম মাদরাসার শায়খুল হাদীস আল্লামা ইব্রাহিম বুয়ালভী (র:) এর ওয়াজ শুনে মিয়াখাঁন নগরস্থ বেলাওয়ারখান মসজিদ সংলগ্ন এলাকায় মক্তব আকারে একটি দ্বীনি শিক্ষা চালু করেন। পরে জিরি মাদরাসার মুহাদ্দিস উক্ত প্রতিষ্ঠানে দারিত্ব নিয়ে ১৮ বছর পর্যন্ত গড়ে তুলেন।

---

১. অফিস রেকর্ড, আল জামেয়া ইসলামিয়া হেমায়াতুল ইসলাম মাদরাসা, কৈয়গ্রাম, তথ্যদাতা: মাওলানা আলী আহমদ, মুহাদ্দিস, দারুল উলুম আলিয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম।

২. অফিস রেকর্ড, আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া ওবাইদিয়া নানুপুর, চট্টগ্রাম। তথ্যদাতা: মাওলানা অলী আহমদ বিভাগীয় প্রধান, অনার্স বিভাগ, দারুল উলুম আলিয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম।

চট্টগ্রামের দানবীর খাঁন বাহাদুর মিয়াখাঁন ১৯৫১ সালে মাদরাসার জন্য জমি ওয়াকফ করে নতুন ভবন নির্মাণ করে মাদরাসা স্থানান্তর করা হয়। এরপর দানবীর মরহুম হাজী নেয়ামত আলী সওদাগরের পরিবারের পক্ষ হতে ১৯৮৩, ১৯৮৫ ও ১৯৯৮ সালে মাদরাসার নতুন ভবন, অজুখানা ও মসজিদ নির্মাণে অবদান রাখেন। [০৩] বর্তমানে হিফজুল কোরআন বিভাগ হতে দাওরায়ে হাদীস কামিল পর্যন্ত চালু আছে। মাওলানা ইসমাইলে পর মাওলানা সালেহ আহমদ, মাওলানা আমির হুসাইন, মাওলানা নূরুল ইসলাম, মাওলানা আবুল খাইর, মাওলানা আব্দুশ শুকুর, মাওলানা আব্দুল জলিল পর্যন্ত মুহতামিমের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি মাদরাসা হতে কোন বেতন ভাতা নেননি। অদ্যাবধি মাওলানা আব্দুল হাকিম মুহতামিম হিসেবে আছেন। উল্লেখযোগ্য মুহাদ্দিসগণ হলেন, মাওলানা মসউদুল হক, মাওলানা ছালেহ আহমদ, মাওলানা আমীর হুসাইন, মাওলানা সাইয়েদ আহমদ, মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক, রাঙ্গুনিয়া নিবাসী মাওলানা ইসহাক, মাওলানা আব্দুর রহমান, মাওলানা নুরুল ইসলাম, মাওলানা হোসাইন আহমদ, মাওলানা আব্দুল জলীল, মাওলানা ওহীদুল্লাহ, মাওলানা লোকমান হাকীম প্রমুখ।[১]

আল জামিয়াতুল উলুম আল ইসলামিয়া, লালখান বাজার, চট্টগ্রাম

বাঁশখালী উপজেলার চৌধুরী পরিবারের সন্তান মুফতী ইজহারুল ইসলাম চৌধুরী ১৯৮১ খ্রি. চট্টগ্রাম শহরের মাওলানা শওকত আলী রোডের লালখান বাজার পাহাড়ী এলাকায় ০৮ একর জায়গায় এটি প্রতিষ্ঠা করেন। অদ্যাবদি মুহতামিম হিসেবে আছেন। তার প্রচেষ্টার অল্প সময়েয় এটি দাওরায়ে হাদীস কামিল শ্রেণিতে উন্নিত হয়। ১৯৯৪ খ্রি. দাওরায়ে হাদীস চালু হয়। হিফজুল কুর'আন বিভাগসহ ১৫টি বিভাগ আছে। ২০০৫ খ্রি. তাখাসসুস ফীল ফিকাহ তথা উচ্চতর আইন গবেষণা বিভাগ ০৩ বৎসর মিয়াদী খোলা হয়। দাওরা উত্তীর্ণ ছাত্ররা এখানে ভর্তি হয়। ১৯৯৫ খ্রি. আয়েশা (রাঃ) মহিলা মাদরাসা এ প্রতিষ্ঠানের অধীনে প্রতিষ্ঠিত হয়। উল্লেখযোগ্য মুহাদ্দিসগণ- মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আলী, মাওলানা হাফিজ রফিক আহমদ, মাওলানা গোলাম কাদের, মাওলানা মুহাম্মদ ওমর, মুফতী ইজহারুল ইসলাম চৌধুরী, বাশখালী নিবাসী মাওলানা নুরুল হক, মাওলানা মুফতী রহিম উদ্দীন, মাওলানা মুফতি হারুন বিন ইজহার, মাওলানা ওবাইদুল হক, মাওলানা মুহাম্মদ হাসান, মাওলানা হাফেজ তৈয়ব ও

১. অফিস রেকর্ড, আল জামিনাতুল ইসলামিয়া আল আরবিয়া মোজাহেরুল উলুম, মিয়াখান নগর, চট্টগ্রাম: ও তথ্যদাতা: মাওলানা অলি আহমদ, মুহাদ্দিস, দারুল উলুম আলিয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম।

শিক্ষা পরিচালক মাওলানা মুছা বিন ইজহার প্রমুখ। 'দাওয়াত' নামক একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়।[১]

আল-জামিয়াতুল আরাবিয়া লিল বনীনা ওয়াল বানাত (বালক-বালিকা শাখা) হাইলধর, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা উপজেলার হাইলধর গ্রামে মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (র:) এর খলিফা মাওলানা রমিজ উদ্দীন ১৮৯৮ খ্রি. ১৩১৮ হিজরীতে হাইলধর বশিরুজজামান মেমোরিয়া স্কুলের উত্তর পার্শে মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠা করে তিনিই এর মুহতামিম হন। তাঁর পরে মাওলানা আব্দুল মালেক হালিম এর মুহতামিম হন। ১৯৮২ খ্রি. দাওরায়ে হাদীস চালু হয়। একমাত্র কওমি মহিলাদের দাওরা পর্যন্ত ব্যবস্থা আছে। এখানে তাহফীজুল কুরআন বিভাগ, ইসলামী কে.জী. ইবতিদায়ী বিভাগ, মুতাফাররকা বিভাগ, ৩ বৎসর মিয়াদী এদাদিয়া বিভাগে (দাখিল স্তর), সানুবিয়া বিভাগ (আলিম স্তর), কুল্লিয়াতুত তাফসীর (ফাযিল স্তর), এক বছর মিয়াদী কুল্লিয়াতুল হাদীস (কামিল স্তর) সহ বিভিন্ন বিভাগ চালু আছে। মাওলানা আহমদ হুসাইনও মুহতামিম ছিল। উল্লেখযোগ্য মুহাদ্দিসগণ- মাওলানা গাজী মুহাম্মদ ইসহাক, মাওলানা সাঈদ আহমদ, মাওলানা শওকত আলী, মাওলানা আনিস উল্লাহ, মাওলানা কলিম উল্লাহ, মাওলানা আখতারুজজামান, মাওলানা আলী আকবর, মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আলী প্রমুখ। এটি ০৬ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত।[২]

আল জামিয়া দারুল মা'আরিফ আল ইসলামিয়া, চট্টগ্রাম

মাওলানা সুলতান যওক নদভী (র:) ১৯৮৫ খ্রি. দেওয়ান বাজার লেইনের মরহুম হাজী মোজাহেরুল ইসলাম ছাহেবের মসজিদ সংলগ্ন ভাড়া বাসা হতে শুরু করে পরে চান্দ্রগাঁও হাজীর পুলে মরহুম সুফী মুহাম্মদ মিয়া কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মুহাম্মদিয়া জমিরিয়া কাসেমুল উলুম মাদুরাকাসাকে দারুল মা'আরিফ মাদরাসায় স্থানান্তির হয়।[০৪] ১৯৮৫ খ্রি. হতে ২০২৫ পর্যন্ত মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন। ১৯৯১ খ্রি. দাওরায়ে হাদীস এবং ১৯৯২ খ্রি. কুল্লিয়া চতুর্থ বর্ষ (আরবি সাহিত্ব বিষয়ে) চালু করা হয়। এখানে মাদরাসা বোর্ডের বাংলা, ইংরেজি, গণিত পড়ানো হয়। উল্লেখযোগ্য মুহাদ্দিসগণ-মাওলানা ইহসানুল হক সন্দিপী, মাওলানা মোজাহেরুল ইসলাম, মাওলানা মুজাফফর আহমদ, মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রীস, ড. মাওলানা রশীদ জাহেদ, প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দীন নদভী, মাওলানা মুহিববুল্লাহ বাকি

---

১. অফিস রেকর্ড, আল জামিয়াতুল উলুম আল ইসলামিয়া: লালখান বাজার, চট্টগ্রাম।

২. অফিস রেকর্ড, হাইলধর মহিলা মাদরাসা, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম ও তথ্যদাতা: মাওলানা অলি আহমদ, মুহাদ্দিস, দারুল উলুম আলিয়া মাদরাসা, চন্দ্রনপুরা, চট্টগ্রাম।

নদভী ও মাওলানা ওবায়দুর রহমান খান নদভী, মাওলানা কারী মুহাম্মদ ইলিয়াছ, মাওলানা মুহাম্মদ ফুরকান উল্লাহ খলিল, মাওলানা মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ, মাওলানা শহিদুল্লাহ কাউছার ও মাওলানা জসিম উদ্দীন নদভী প্রমুখ। এখানের ছাত্র বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর ডিগ্রি প্রাপ্ত। কৃতি ছাত্রের সংখ্যা ৫৫ জন।[১]

এখান থেকে "*আল হক*" নামে একটি মাসিক পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হয়। হাদীসের পাশাপাশি আরবী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা, পাঠদানে নতুনত্ব ও ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ এ মাদরাসার বৈশিষ্ট্য। এছাড়াও লোহাগাড়ায় রয়েছে রাজঘাটা হোসাইনুল উলুম মাদরাসা পুরাতন থানা, ছমদিয়া মাদরাসা, পদুয়া হেমায়াতুল ইসলাম মাদরাসা, ইত্যাদি।

১. আল্লামা মুহাম্মদ সুলতান যওক নদভী, *আমার জীবন কথা*, প্রকাশক, নদভী প্রকাশন।

তৃতীয় অধ্যায়
ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা রাসূলের যুগ থেকে বর্তমান

প্রথম পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সময় ইসলামী শিক্ষা

শিক্ষা ও সংস্কৃতির পরিচয়

শিক্ষা ও সংস্কৃতি একটি আরেকটির পরিপুরক। শিক্ষার মাধ্যমে সংস্কৃতি অর্জন হয়। সুশিক্ষাই সুষ্ঠু সংস্কৃতি সৃষ্ঠি হয়। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হল-

শিক্ষার পরিচয়

শিক্ষার পরিচয় সম্পর্কে *আল-মু'জমুল ওসয়াসীত* গ্রন্থাকার বলেন-

العلم هو ادراك الشيئ بحقيقته واليقين وهو نور يقذفه الله فى قلب من يحبه-

"কোন বিষয়ের বাস্তবতা সম্পর্কে নিশ্চত অবগত হওয়ার এবং এমন এক প্রকার নুর, আল্লাহ যাকে পছন্দ করেন তাকে প্রদান করেন।" *Oxford Dictionary* তে বলা হয়েছে- Education is a process of teaching, training and learning to improve knowledge and develop skill "শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞানের বিকাশ প্রশিক্ষণ ও উৎকর্ষ সাধন হয় এবং দক্ষতায় নিপুণতা অর্জিত হয়।"

মহাকবি মিলটনের মতে, Education is the harmonious development of body, mind and soul "দেহ, মন ও আত্মার সমন্বিত উন্নতি সাধনই শিক্ষা।"[১] মূলকথা, যার মাধ্যমে মানুষের অন্তর্নিহিত সত্ত্বার বিকাশ, পরিবেশের সাথে পরিচিত হওয়া, ব্যক্তি ও সমাজ উপকৃত হওয়া, দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক জ্ঞান ও গুণাবলী অর্জন করে একজন মানুষ হিসেবে নিজেকে বিকাশিত করা যায় তাকে শিক্ষা বলে।

ইসলামী শিক্ষার পরিচয়

কুর'আন ও হাদীসের মাধ্যমে যে জ্ঞান অর্জন হয় তাই ইসলামী শিক্ষা। অন্যভাবে বলা যায়, যেখানে পূর্ণাঙ্গ ইসলামকে শিক্ষা দেয়ার মাধ্যমে সত্য-মিথ্যা, হালাল-হারাম, ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ ইত্যাদি জেনে মানুষ নিজেকে এবং আল্লাহকে জানতে এবং চিনতে পারে তাই হলো ইসলামী শিক্ষা। যে শিক্ষা একাধারে যেমনি ইমাম, খতীব, ফকীহ, মুজতাহিদ, মুহাদ্দিস মুফাসসির ইসলামী চিন্তবিদও গবেষক জন্ম দেবে তেমনি অন্যদিকে খাটি মুসলিম বিজ্ঞানী, দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ, বিচারক, রাষ্ট্রদূত, সেনাপতি ও রাষ্ট্রপ্রধান সৃষ্টি করবে।

সংস্কৃতির পরিচয়

সংস্কৃতি অর্থ উত্তম বা উন্নতমানের চরিত্র। এর আরবি হল تمدن বা ثقافة ইংরেজি হলা Culture ব্রিটিশ নৃবিজ্ঞানী Edward Bernett taylor বলেন, Culture is the complex whole which includes knowledge belief art, moral, law and habits acquired by

---

১. ড. সাইয়েদ মুহাম্মদ আবু নোমান, *ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচার ও প্রসারে চট্টগ্রাম* (দারুল উলুম আলীয়া মাদ্‌রাসার অবদান, ২০১৭ খ্রি.), **পৃ. ৬৫**

men as a member of society. "সংস্কৃতি হলো মানুষের অর্জিত আচার, জ্ঞান, বিশ্বাস, কথা, নীতি আইন, প্রথা সংস্কার এবং অন্যান্য বিষয়ের দক্ষতা ও অভ্যাসের জটিল সমাবেশ। সমাজের একজন সদস্য হিসেবে মানুষ যা অর্জন করে।"[১] এক কথায় কোন জাতির বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনারই বিশেষ গুণান্বিত আঙ্গিকের বহিঃপ্রকাশকে সংস্কৃতি বলে। প্রত্যেক জাতির ভাষা পেশা, জীবনযাত্রা, ধর্ম ভৌগলিক সীমারেখা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে সংস্কৃতি গড়ে উঠে। প্রত্যেক জাতীর নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে সেই সংস্কৃতিতেই সে জাতি পরিচিত হয়।

ইসলামী সংস্কৃতির পরিচয়

ইসলামী বিধি বিধান মানব জীবনে বাস্তবায়নের ব্যবহারিক দিক হলো ইসলামী সংস্কৃতি। অধ্যাপক হাসান আইয়ুব বলেন, কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে পরিচালিত মানবজীবনের সকল কর্মকান্ড, ক্রিয়ালাপ ও আচরণই ইসলামী সংস্কৃতি।১

মোদ্দাকথা, পূর্নাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে উঠা সংস্কৃতিই ইসলামী সংস্কৃতি, মানবতা বিরোধী, সব সংস্কৃতিই অপসংস্কৃতি। অর্থাৎ ইসলাম নিয়ন্ত্রিত ইসলামী আইন দ্বারা পরিচালিত মানুষের জীবন পদ্ধতিই হল ইসলামী সংস্কৃতি।

রাসূলের যুগে ইসলামী শিক্ষা

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর যুগে কুর'আন, হাদীস, ফারায়েজ, চিকিৎসাশাস্ত্র, ইলমুল আনসাব (কুষ্ঠি গণণা) ও তাজবীদ পাঠ্যভুক্ত ছিল। যে শিক্ষক যে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ থাকতেন তিনি সেই বিষয়ে শিক্ষাদান করতেন। শারীরিক ব্যায়াম সম্পর্কেও তখন শিক্ষা দান করা হতো। শারীরিক ব্যায়ামের পাশাপাশি অশ্বারোহণ, তীরান্দাজী ও অভিযানমূলক কসরতও শিখানো হতো।[২] অতঃপর এ ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে মদীনার বাইরেও ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। মরুভূমির বেদুঈন এবং সভ্য নাগরিক ক্রমান্বয়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে লাগলো। ইসলামের ক্রমবর্ধমান জনশক্তি বৃদ্ধির সাথে এ শিক্ষাও দ্রুত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) জীবনের শেষ অধ্যায়ে আরব ভূখণ্ডের দূর-দুরান্ত পর্যন্ত ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে এবং শিক্ষার জন্য অবশ্যম্ভাবীরূপে একটি সুষ্ঠু কাঠামো তৈরির প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এ পরিকল্পনাধীনে প্রত্যেক গোত্রের লোকদের কুরআন হাদীস শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এ শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য প্রধানতঃ দু'টি পন্থা গ্রহণ করা হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর দরবার হতে সরাসরি বিশেষ শিক্ষা প্রাপ্তদের আঞ্চলিকভাবে বাইরে পাঠানো হত অথবা বিভিন্ন প্রদেশের গভর্ণরদেরকে নির্দেশ দেওয়া হতো তাঁরা যেন স্ব স্ব এলাকায় উপযুক্ত

---

১. E.B Taylor primitive culture, London: 1871

২. ড. মোঃ আব্দুস সাত্তার, ইসলামী শিক্ষার ক্রমবিকাশ ও উৎপত্তি, তা.বি., পৃ. ১৭

শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর দরবার হতে আমর ইবন হাজমকে যে সারগর্ভ নির্দেশ প্রদান করা হয়েছিল তাই অদ্যাবধি ইতিহাসে সংরক্ষিত আছে।[১]

রাসূলুল্লাহ (সা.) আল কুরআনের নির্দেশ অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালনার বিভিন্ন শিক্ষা সামাজিক ন্যায় বিচারের বিভিন্ন নীতিমালা অর্থনৈতিক বিভিন্ন কারবারের নিয়ম-কানুন, উত্তরাধিকার, বিবাহ-তালাক, পররাষ্ট্রনীতি, চিকিৎসা শাস্ত্র, তাজবীদ ও সামরিক শিক্ষা প্রভৃতি শিক্ষাক্রম পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করেন। ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর উদার নীতি ছিল। তখনকার সময় ফার্সী, হাবসী, হিব্রু ও রোমানদের ভাষা বিশ্বে সমাদৃত ছিল। সাহাবীগণ উক্ত ভাষাসমূহ শিখেছিলেন। যায়েদ ইবন ছাবিত ভাষাবিদ হিসেবে 'মীর মুন্সী' বলে আখ্যায়িত হন।[২]

খোলাফায়ে রাশেদার যুগ

খোলাফায়ে রাশেদিনের আমলে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও পরিধি ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে। খলিফাগণের নিকট রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর এই অমিয়বাণী ব্যাপকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রিয় নবী (সাঃ) বলেন,

بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ آيَةٌ

"তোমরা আমার পক্ষ থেকে একটি বাক্যও যদি জেনে থাকো, তা অন্যের কাছে পৌঁছিয়ে দাও।"[৩]

এ বাণীতে মুগ্ধ হয়ে তাঁরা শিক্ষার প্রচার ও প্রসারকে ব্যাপকতর করেন। প্রতিটি মানুষের কাছে জ্ঞানের আলো পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে প্রাণপণ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। তাদের ভয় ছিল যে, শিক্ষার প্রতি উদাসীনতার কারণে অন্যান্য জাতির ন্যায় আমরা যেনো পথভ্রষ্ট না হই।

খোলাফায়ে রাশেদিনের সময়ে শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে নও মুসলিমগণ এবং সাহাবীগণের ব্যাপক অবদান রয়েছে। কুরআন বা শিক্ষামূলক জ্ঞানকে প্রতিটি মানুষের কাছে অকাতরে পৌঁছে দিতেন। এ সময় শিক্ষাদানের বদলে বিনিময় গ্রহণ করা তাদের মূল্যবোধের পরিপন্থী ছিল। শিক্ষা প্রসারের এ আমলটি ছিল অনেক কষ্টসাধ্য, তবুও তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এই কোরবাণী ও ত্যাগ স্বীকার করেন। ঐতিহাসিকগণ ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষা প্রসারের এ সময়কে একটি যুগ হিসাবে অভিহিত করেন। ইসলামের আবির্ভাব হতে উমাইয়া খিলাফতের সূচনাকাল পর্যন্ত শিক্ষার এ ধারা অব্যাহত থাকে।[৪]

---

১. প্রাগুক্ত।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

৩. *সহীহুল বুখারী*, হাদীস নং ৩৪৬১

৪. ড. মোঃ আব্দুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

হযরত আবূ বকর (রা.) এর শাসনামলে ইসলামী শিক্ষা

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর তিরোধানের পর আবূ বকর (রা.) (৬৩২-৩৪খ্রি.) ইসলামী খিলাফতের খলীফা মনোনীত হন।[১] রাসূলুল্লাহ (সা.) এর শাসনামলে রাষ্ট্রীয়ভাবে গৃহীত প্রত্যেকটি কর্মকাণ্ড তিনি অব্যাহত রাখেন।[২] ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্বভার গ্রহণের সূচনালগ্নে ধর্মত্যাগী ও ইসলামের পরম শত্রু মিথ্যা নবীদের দমন করার পর তিনি ইসলামী জ্ঞান রাজ্যময় ছড়িয়ে দেয়ার জন্য সচেষ্ট হন। তিনি রাসূল (সা.) এর প্রচলিত মসজিদভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থাকে ব্যাপকতর করেন। পবিত্র কুরআন ও ধর্মীয় শিক্ষাই ছিল এর মূল বৈশিষ্ট্য।[৩]

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাহাবীগণ যে উৎকৃষ্টতর আদর্শের শিক্ষা অর্জন করেছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ পরিবারে, সম্প্রদায়ে ও সমাজে অর্জিত শিক্ষাধারা চালু রাখেন। এ সব নিবেদিত সাহাবীগণ ধর্ম ও রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর আদর্শ প্রচার, প্রসার ও সংরক্ষণকে জীবনের চেয়েও মূল্যবান মনে করতেন।[৪] অনেকেই ইসলামী শিক্ষা প্রচারের ন্যায় গুরুদায়িত্ব পালনার্থে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর ইনতিকালের পর সমগ্র বিশ্বে সফর করেন। সাহাবীগণ ফরয, ওয়াজিব সুন্নাতে রাসূল, হালাল-হারাম ইত্যাদি প্রচারে মনোযোগ দেন। বিশ্ববাসী এমন সত্যবাণীর প্রত্যাশায় অপেক্ষমান ছিল।[৫]

হযরত উমর (রা.) -এর শাসনামলে ইসলামী শিক্ষা

আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) এর তিরোধানের পর উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) মুসলিম জাহানের খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি বিজিত রাজ্যে সর্বত্র কুরআন শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি মুতাওয়াল্লী এবং ক্বারী নিয়োগ করে মাসিক বেতন নির্ধারণ করে দেন। যাযাবর বেদুঈনদের জন্য কুরআন মজীদ শিক্ষা বাধ্যতামূলক করে দেন।

মসজিদভিত্তিক প্রাথমিক ও ইসলামী শিক্ষা পাঠের পাশাপাশি লিখার সুব্যবস্থা করা হয়। লোকেরা যাতে সঠিক উচ্চারণ ও সঠিক ই'রাব সহকারে কুরআন মাজিদ আবৃত্ত করতে পারে সেজন্য আরবী সাহিত্য ও আরবী ভাষা শিক্ষা করাকে বাধ্যতামূলক করে নির্দেশ প্রদান করেন। বিজিত দেশে হযরত উবাইদা ইবন সাবিত (রা.) ও হযরত আবু দারদা (রা.) ইসলামী

---

১. কে. আলী, *মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস* (ঢাকা: আলেয়া বুক ডিপো, তা.বি.), পৃ. ১৩৮

২. ড. মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান, *কুরআন পরিচিতি* (ঢাকা: নুবালা পাবলিকেশন্স, ১৯৯২খ্রি.), পৃ. ১২

৩. ড. মোঃ আব্দুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬-৫৭

৪. মুফতী আমিমুল ইহসান, তারীখে ইসলাম, তা.বি., পৃ. ২

৫. ড. মোঃ আব্দুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

শরীয়তের তা'লীম দিতেন। মুসলমানরা তাঁদের দরবারে এসে ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করতেন। এ আমলে আল-কুরআন, আল-হাদীস ও ফিক্হ শাস্ত্রের জ্ঞানীদের মধ্যে বিশেষভাবে সমাদৃত ছিল। বিশিষ্ট সাহাবী আব্দুর রহমান ইবন কাসিম (রা.) সিরিয়াতে, আবদুল্লাহ ইবন মাকীল (রা.) ও ইমরান ইবন হুসাইন (রা.) বসরাতে, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) কুফায় এবং হাববাব ইবন জাবাল (রা.) মিসরে ফিক্হ শাস্ত্র বিষয়ে পাঠ দান করতেন।[১]

হযরত উসমান (রা.) এর শাসনামলে ইসলামী শিক্ষা

হযরত উসমান রা. (৬৪৪-৫৩ হি.) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি কুরআনের শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে পূর্বসুরী খলীফাদের অনুসরণে মসজিদ ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট নিয়মে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। তিনি মক্কা, মদীনা, কুফা, বসরা প্রতিটি স্থানে শিক্ষা দানের লক্ষ্যে নতুন নতুন কেন্দ্র গড়ে তোলেন। কুরআন ও হাদীসের জ্ঞানে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের দ্বারা বক্তৃতার ব্যবস্থা করে শিক্ষার্থীদের মাঝে জ্ঞান ছড়িয়ে দেয়ার সুব্যবস্থা করেন। এ আমলে মুসলিম জাহানে মসজিদ তৈরি করে সাহাবীদেরকে শিক্ষকতার দায়িত্বে বহাল করা হয়। এ যুগে বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রে মুসলিম জাহানের বিখ্যাত জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের বিশেষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল শিক্ষা সম্মেলনে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে জ্ঞান অন্বেষণকারীরা দলে দলে অংশ নিতেন এবং এ সব সম্মেলনে শিক্ষার বিভিন্ন দিক সহজ সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করা হতো যাতে সকলের বোধগম্য হয়।[২]

হযরত আলী (রা.) এর শাসনামলে ইসলামী শিক্ষা

ইসলামের চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রা.) ৬৫৬-৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম সাম্রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। এ আমলে মুসলিম সাম্রাজ্যে বিদ্যা শিক্ষার ব্যাপকতর প্রসার ঘটেছিল। তিনি বিদ্যা শিক্ষা অর্জনের জন্য মানুষকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে কিছু বাণী প্রদান করেন। তা হলো, বিত্তের চেয়ে বিদ্যা ভাল। বিত্তকে তুমি পাহারা দাও আর বিদ্যা তোমাকে পাহারা দেয়। বিত্ত খরচ করলে কমে, কিন্তু বিদ্যা বিতরণ করলে তা বেড়ে যায়। শিক্ষা অন্বেষণকালে যে মৃত্যুবরণ করে সে অমরত্ব লাভ করে। শিক্ষা মানব জীবনের অলংকার স্বরূপ। বিত্তের চেয়ে বিজ্ঞান বিষয়ে পারদর্শী মানুষ সমাজে সর্বাপেক্ষা সম্মানী। ফলে হযরত আলী (রা.)-কে ইসলামের একজন 'জ্ঞান পিপাসু' সাধক বলে অভিহিত করা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বিদ্যা শিক্ষার যে আলো জ্বালিয়েছিলেন তা লালন করে তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানকে ইসলামের বিজয় বেশে

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

২. ড. আব্দুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন। পবিত্র কুরআনের জটিল বিষয়ের উপর তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। এ আমলে বসরা ও কুফাতে অসংখ্য শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়। কুফা ও বসরাতে আরবী, ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব ও দর্শনের চর্চাসহ হস্তলিপি, আবৃত্তি ও কাব্যচর্চার অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হয়। পরিশেষে বলা যায় যে, ধর্মীয় প্রেরণার ফলে মুসলিমরা সূচনালগ্ন থেকেই শিক্ষা প্রসারে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। খোলাফায়ে রাশেদার আমলে সাধারণ সাহাবী থেকে আরম্ভ করে সরকারী কর্মচারী ও খলীফাগণ যেখানে অবস্থান করেছেন সেখানে শিক্ষালয় স্থাপন করেন শিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্যে খলীফাগণ অকাতরে অর্থ খরচ করতেন।[১] খোলাফায়ে রাশেদার যুগ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তাজবীদ, তাফসীর, আল-হাদীস, আসমাউর রিজাল, ফিক্‌হ, অলংকার শাস্ত্র, আরবী সাহিত্য, আরবী ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব, দর্শন শাস্ত্র, হস্তলিপি ইত্যাদি বিষয়সমূহ শিক্ষার সিলেবাসভূক্ত ছিল।

তাবেঈনদের যুগে ইসলামী শিক্ষা

তাবেঈনদের যুগে মসজিদে নববীর অনুকরণে মসজিদ ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থাই সর্বত্র প্রচলিত হয়ে পড়ে। যেখানেই কোন মসজিদ গড়ে উঠতো সে মসজিদকে কেন্দ্র করে একটি পাঠশালাও গড়ে উঠতো। মসজিদ ভিত্তিক এ শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে শিক্ষা দ্রুত সম্প্রসারিত হওয়ার সুযোগ ঘটে। কুরআন-সুন্নাহ ও সাহাবীদের কর্মময় জীবনাদর্শের আলোকে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারিক বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে সৃষ্ট সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করার বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে বৃদ্ধি পায়। ফলে ফিকহ শাস্ত্রের বিকাশ ঘটে এবং ইলমে ফিকহ ইসলামী শিক্ষা সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। ক্রমান্বয়ে ফিকাহ শাস্ত্রের পাণ্ডিত্যই ইসলামী শিক্ষার ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপনের মাপকাঠি হয়ে দাঁড়ায়।[২] এছাড়াও দামিশকের জামে মসজিদ জামি ইবন তুলুন এবং অন্যান্য জামি মসজিদও জ্ঞান চর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। এসব বিশাল মসজিদে গ্রন্থাবলী রাখার জন্য স্বতন্ত্র কক্ষ নির্মাণ করা হয়। এরূপ কতগুলো গ্রন্থাগারও স্থাপিত হয়েছিল যাতে প্রথম যুগের সে সব গ্রন্থাবলী সংরক্ষণ ছিল। সেগুলো হলো যুক্তি বিদ্যা, দর্শনশাস্ত্র, গণিত শাস্ত্র, জ্যোর্তিবিদ্যা, জ্যোতিষ শাস্ত্র, সংগীত বিদ্যা, রসায়ন, চিকিৎসা বিজ্ঞান ইত্যাদি।[৩]

উমাইয়া যুগ (৪১-১৩০ হি.) ইসলামী শিক্ষা

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬১, ৬০

২. ড. আব্দুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬

৩. সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩খ্রি.), ১৭শ খণ্ড, পৃ. ২৬৪

হাদীস সংকলন ও যাচাই বাছাইয়ের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে 'রিজালশাস্ত্র' পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত হয়ে পরে। আবার আল-কুরআনকে বিশুদ্ধভাবে পাঠের প্রয়োজনের ভিত্তিতে ইলমে ক্বিরাতও পাঠ্যসূচির তালিকাভুক্ত হয়ে যায়। এ সময় বহির্বিশ্বে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ার ফলে অনারবদেরকে আরবী ভাষা শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কেননা ইসলামের মৌলিক বিষয় কুরআন ও সুন্নাহ আরবী ভাষাতেই রচিত ছিল। ফলে আরবী ভাষার নিয়ম-নীতি শিক্ষার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় এভাবে ইলমে নাহু পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্তির বিষয়টিও প্রাথমিকভাবে এ সময়েই শুরু হয়।[১] উমাইয়া খলীফা উমর ইবন আব্দুল আজিজ মুসলিম জাহানের খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেই ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও সমৃদ্ধির দিকে মনোনিবেশ করে ইসলামী শিক্ষার পাঠ্যক্রম ও ইসলামের দ্বিতীয় উৎস রাসূলের হাদীস সংগ্রহের জন্য।

মুসলিম সাম্রাজ্যের সর্বত্র সরকারী ফরমান জারি করেন। রাজ প্রশাসক, আমলা-আমাত্য; প্রজাসাধারণের উদ্দেশ্যে বলেন, শিক্ষা-দীক্ষার জন্য তারা যেন পাঠদানের আসরে বসেন। তারা যা জানে না তা যেন জানতে পারে। কেননা জ্ঞান তখনই বিলুপ্ত হয় যখন তা রাজকীয় বা গোপনীয় রহস্যে পরিণত হয়।[২] তার শাসনামলে কুরআন, হাদীস ও ফিকহ প্রভৃতি বিষয়ের শিক্ষার পাঠ্যক্রম বিষয়বস্তু গ্রন্থাবদ্ধ হতে থাকে। পবিত্র মক্কায় আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) বহু সংখ্যক শিক্ষার্থীকে আল কুরআন, হাদীস, ফিকহ, ফারায়েজ ও আরবী ভাষা শিক্ষা দিতেন। বিভিন্ন আমির-ওমরা বা অভিজাত শ্রেণির সন্তানাদি পড়ানোর জন্য দ্বিতীয় মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। প্রশাসক ও অভিজাত শ্রেণির সন্তানাদির জন্য নির্দিষ্ট এসব ইসলামী শিক্ষা সাধারণতঃ গৃহভিত্তিক ছিল। এ জাতীয় ইসলামী শিক্ষা পিতা ও শিক্ষক পরামর্শ করে সন্তানের লেখা-পড়ার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি তৈরি করতেন এবং তদানুযায়ী লেখা-পড়া শিক্ষা দিতেন।[৩] উমাইয়া শাসকগণ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে বিজ্ঞান ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে সে যুগে মুসলমানদের অভাবনীয় উন্নতি ঘটে। এ সময়ই চিকিৎসা ও জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থাদি আরবীতে অনুবাদের রাজকীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। চিকিৎসা মাসার যাওয়াহ সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক প্রণালীর চিকিৎসা গ্রন্থ আরবীতে অনুবাদ করেন। এতদ্ব্যাতীত উমাইয়্যা যুগের প্রথম থেকে আব্বাসীয়দের যুগের সূচনা পর্যন্ত ইসলামী শরীয়ত সাহিত্য ও দর্শন সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরণের জ্ঞানের উপর রচনার কাজ সম্পাদিত হয়। অন্যান্য ভাষার জ্ঞানকে ও আরবী ভাষায় ভাষান্তর করা হয়। যার মাধ্যমে

---

১. প্রাগুক্ত।

২. ড. মোঃ আঃ সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪-৬৫

রচনা, সংকলন ও অনুবাদের দ্বারা আরবী সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞান এক বিরাট আকার ধারণ করে। উমাইয়া যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে কাজ হয়েছিল তাকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়।

১) ইসলামের প্রচার ও প্রসারের স্বাভাবিকভাবে জ্ঞানের যে সব শাখার উন্মেষ হয়েছিল যথা কুরআন সম্বন্ধীয় জ্ঞান, হাদীস, ফিকহ, ভাষা সংক্রান্ত জ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি এগুলোকে এক কথায় ইসলামী জ্ঞান বলা যেতে পারে।

২) ইসলামী সংস্কৃতিতে প্রসারতা আগমনের ফলে গ্রীক ও পারসিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থাদির অনুবাদের কাজও এ যুগে আরম্ভ হয়েছিল। এ জ্ঞানের বিষয়গুলোও মুসলিমরা কুরআন ও হাদীসের পরোক্ষ প্রভাবে চর্চা শুরু করেছিল। প্রাচীন সাহিত্য যা জাহেলী যুগে সৃষ্টি হয়েছিল যথা কবিতা, বাগ্মিতা ও ভাষা সম্বন্ধীয় বিষয়াদি। মোটকথা এ যুগে জাহেলী যুগের সাহিত্যের চর্চা পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়েছিল। এ যুগেই বিদেশী ভাষা থেকে বিজ্ঞান ও দর্শনের গ্রন্থাদি অনুবাদের কাজ শুরু হয়। এ যুগে উল্লেখিত বিষয় পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফলে আব্বাসীয় যুগ পর্যন্ত উলূমুল কুরআন, আল হাদীস, ফিকহ, যুক্তিবিদ্যা, জীবনী, ইতিহাস, সাহিত্য, কবিতা, ব্যাকরণ শাস্ত্র, চিকিৎসা, দর্শন, মানতিক, গণিত, জ্যামিতি ইত্যাদি পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভূক্ত ছিল।[১]

আব্বাসীয় যুগে ইসলামী শিক্ষা

ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার তৃতীয় যুগ শুরু হয় আব্বাসীয় রাজন্যবর্গের শাসন আমল থেকে, আব্বাসীয় শাসনকর্তা আবুল আব্বাস ৭৫০খ্রি. উমাইয়া খিলাফতের অবসানের পর মুসলিম সাম্রাজ্যে আব্বাসীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত করেন।[২] ৭৫০ থেকে ১২৫৮খ্রি. পর্যন্ত এ বংশের মোট ৩৭ জন শাসক মুসলিম সাম্রাজ্য পরিচালনা করেন। প্রথম ১০ জন খুবই যোগ্যতা সম্পন্ন শাসক ছিলেন।[৩]

আব্বাসীয় যুগে ইসলামী শিক্ষা ধারায় কিছু কিছু নতুন পদ্ধতির সংযোজন ঘটে। যদিও সে যুগে মসজিদসমূহে শিক্ষা-দীক্ষার নিয়ম প্রচলিত ছিল, তথাপি ইসলামী শিক্ষার গুণগত, মানগত, পরিবেশগত মান উন্নয়নের জন্য ভবন নির্মাণের নিয়ম চালু করা হয়।[৪] আলোচ্যযুগে মকতবসমূহে শিশুকিশোর দিগকে আল কুরআন তিলাওয়াত, প্রাথমিক লিখন, পঠন ও সাধারণ পর্যায়ের অংক পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল। স্পেনবাসীগণ আল কুরআন তিলাওয়াতের শিক্ষার

১. ড. আব্দুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

৩. প্রাগুক্ত।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩

সাথে কবিতা, প্রবন্ধ রচনা এবং আরবী ভাষার শিক্ষা প্রদানকেও শিশু-কিশোরদের পাঠ্যসূচির আওতাভুক্ত করেছিল। আল কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষার পর আরবী ব্যাকরণের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলীকে মৌখিকভাবে মুখস্থ করানো হতো। অভিধান ও ভাষা শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হতো। সাহাবী, তাবেঈ এবং ইসলামের ইমাম ও বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম ও তাঁদের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত শিক্ষার্থীদেরকে শ্রুতলিপির মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করা হতো। বিভিন্ন প্রকারের দীনী ইলম শিক্ষা ব্যতীত গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসা শাস্ত্র এবং সাধারণ বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থাও ছিল। বিভিন্ন বিজ্ঞান শিক্ষা ঐচ্ছিক ছিল। ইলমুল হাদীস এর গ্রন্থাবলীর মধ্যে সিহাহ সিত্তাহ–

সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনান আবী দাউদ, জামি' তিরমিযী, সুনান নাসাঈ, সুনান ইবন মাজা, মুওয়াত্তা ইমাম মালিক এবং অন্যান্য বহু গ্রন্থ অন্তর্ভুক্ত ছিল। হাদীস শাস্ত্রে বুৎপত্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীগণ *সুনানু বায়হাকী, মুসনাদু আহমদ ইবন হাম্বল, সুনানু দারা কুতনী, ইবন হামীদ রায্যায* প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করতো।[১] আব্বাসীয় শাসনামলে শিক্ষাধারায় রচনা সংকলনের পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। গ্রন্থাকারগণ স্বয়ং নিজেদের রচিত গ্রন্থাবলী পাঠদান করাতেন। তবে সে সময় গ্রন্থাবলী পাঠ এবং শ্রবণের অনুমতি ও সনদ প্রদানের প্রথা প্রথম যুগের তুলনায় অধিক গুরুত্বের সাথে প্রচলিত হয়। তাছাড়া সে সময়ের শিক্ষা ব্যবস্থায় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচিতে কিছু সুনির্দিষ্ট গ্রন্থাবলী নির্ধারণের ধারা প্রবর্তন করা হয়। প্রতিটি বিষয়ে যেসব পুস্তক বস্তুনিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য (Othentic) হিসেবে প্রমাণিত হয় সেগুলোকে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ নিয়মে পরবর্তীতে প্রতিটি বিষয়ের পাঠদানের জন্য আবার শ্রেণি ভিত্তিক সংক্ষিপ্ত পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি নির্ধারণ করে পৃথক পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ণ করা হয়। কিন্তু তবুও সুদীর্ঘ কালের আবর্তে পাঠ্যসূচির মধ্যে কিঞ্চিৎ অপ্রয়োজনীয় পুস্তকাদিরও অনুপ্রবেশ ঘটে যায়। তাই সব যুগেই পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচির সংশোধন বা পরিমার্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে।[২] মূলত আব্বাসীয় যুগেই শিক্ষার মান অনুসারে প্রথম শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণীত হয়। এতে সাধারণ জ্ঞান স্থান পায়। শিক্ষা ধারাকে ৩ ভাগে ভাগ করা হয় যথা:

ক. প্রাথমিক স্তর

খ. মাধ্যমিক স্তর

গ. উচ্চ শিক্ষা।[৩]

প্রাথমিক স্তর

---

১. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১৭শ খণ্ড, পৃ. ২৭৪; আবুল হাসান আলী নাদাভী, রিয়াসাত, তা.বি., পৃ. ১৪১

২. ড. আঃ সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪-৭৫

৩. প্রাগুক্ত।

এ স্তরে অক্ষরজ্ঞান, লিখন, পঠন এবং পর্যায়ক্রমে ব্যাকরণ, হাদীস, প্রাথমিক গণিত, কিছু ভাবমূলক কবিতা প্রভৃতি পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষায় মুখস্থের উপর বেশী জোর দেয়া হতো।[১]

মাধ্যমিক স্তর

মাধ্যমিক স্তরের মাদরাসাসমূহে কুরআন, হাদীস, ফিক্‌হ, ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন পুস্তক পাঠদান করা হতো।

উচ্চ শিক্ষা

উচ্চ শিক্ষা স্তরে কোন সীমাবদ্ধ পাঠ্যসূচি ছিল না। কুরআনের তাফসীর, হাদীসের ব্যাখ্যামূলক আলোচনা, আইন বা ফিক্‌হশাস্ত্র, ধর্মতত্ত্ব, ছন্দ ও সাহিত্য, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যামিতি, চিকিৎসাশাস্ত্র, প্রভৃতি পড়ানো হতো। তবে এক্ষেত্রে অধ্যাপকের নিজস্ব শিক্ষা পদ্ধতি অনুসৃত হতো।[২]

বাদশাহ মামুনুর রশীদের শাসনামলে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের দর্শন ও সাহিত্য আরবীতে অনুদিত হয়। এবং ঐসব দর্শনের আলোকে ইসলামী জীবনাদর্শকে মুল্যায়নের প্রবণতা দেখা দেয়। ফলে সেইসব দর্শনের আলোকে ইসলামী আক্বীদাহ বিশ্বাস, বিধি-বিধানের উপর নানা ধরণের নতুন নতুন প্রশ্ন উত্থাপিত হতে শুরু করে। এসব প্রশ্ন নিরসনের প্রয়োজনে যুক্তি ও দর্শনের আলোকে ইসলামী আক্বীদাহ বিশ্বাসকে নতুন করে উপস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, একারণে যুক্তি ও দর্শন শিক্ষা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এভাবে ইলমে কালাম নামে একটি নতুন বিষয়ের উদ্ভব ঘটে এবং তর্কশাস্ত্র ও ইলমে কালাম ইসলামী শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। এ সময় অনারবীয়দের মাঝে কুরআন ও হাদীস চর্চার প্রবণতা দেখা দিলে আরবী সাহিত্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায় এবং সাহিত্যে প্রাঞ্জলতা অর্জনের প্রয়োজনে 'সরফ' ও 'বালাগাত' শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ফলে এগুলোও ইসলামী শিক্ষা সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে।

বাদশাহ মামুনের যুগে বিভিন্ন দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমাহার ইসলামী দুনিয়ায় ঘটার ফলে ভূগোল, জ্যামিতি, সৌরবিজ্ঞান, রসায়ন, বস্তুবিজ্ঞান, গণিত ও চিকিৎসা সংক্রান্ত শিক্ষা-দীক্ষাও ইসলামী শিক্ষার সাথে অনেকখানি ঐচ্ছিক পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে। তবে আব্বাসী খিলাফতের প্রথমার্ধ পর্যন্ত হাদীস শাস্ত্রে পান্ডিত্য অর্জনই ইসলামী শিক্ষার ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপনের মানদন্ড বলে বিবেচিত হয়। আব্বাসী খিলাফতের শেষার্ধের দিকে এসে শিক্ষাধারা একটি নতুন খাতে প্রবাহিত হতে শুরু করে। শিক্ষা তখন বিষয়ের ভিত্তিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে

---

১. প্রাগুক্ত।

২. প্রাগুক্ত।

এবং একেক অঞ্চলে একেক বিষয়ের শিক্ষার জন্য প্রখ্যাত হয়ে পড়ে। যেমন-সিরিয়া ও মিসর হাদীস, তাফসীর ও রিজাল শাস্ত্রের জন্য প্রখ্যাত ছিল। স্পেন আরবী সাহিত্য ও ইতিহাসের জন্য, ইরান ও ইরাক দর্শন, ন্যায়শাস্ত্র ও চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়ের জন্য, খোরাসান ও মাওয়ারাউন নহর ফিকহ, উসুল ও তাসাউফের জন্য বিখ্যাত ছিল।[১]

পরিশেষে বলা যায় যে, উমাইয়া যুগ ছিল রাজ্য জয়ের যুগ আর আব্বাসী যুগ ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগ। এ যুগে মুসলমানদের কৃষ্টি, সভ্যতা ও জ্ঞানানুশীলন বিশ্ব সভ্যতার শীর্ষদেশে উন্নীত হয়েছিল। এ কারণে এ যুগকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের 'স্বর্ণযুগ' বলা হয়।

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : সুলতানী আমলে ইসলামী শিক্ষা

বৃটিশ আমলের পূর্বে বাংলাদেশে আরবী মাদরাসাসমূহের শিক্ষা পদ্ধতি ও পাঠ্যসূচি কি ছিল, শিক্ষার গতি-প্রকৃতি আর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি ছিল, তার উত্তর গবেষণা সাপেক্ষ। এ ব্যাপারে এ যাবৎ যতটুকু প্রকাশিত হয়েছে তার চাইতে অজানাই রয়েছে অনেক বেশি। এ উপমহাদেশের আরবী মাদরাসার ইতিহাস আলোচনায় সর্বপ্রথম উদ্দ্যেগী হন মাওলানা শিবলী নোমানী। তাঁর অনুসরণেই লখনৌর নাদওয়াতুল উলামা ও আযমগড়ের দারুল মুসান্নিফীনের বড় বড় আলেম সৈয়দ সুলায়মান নদভী আবুল হাসনাত নাদভী, সৈয়দ আব্দুল হাই প্রমুখ এ বিষয়ে স্বতন্ত্র নিবন্ধ ও বহু পুস্তক রচনা করেন। এ ধরনের আলোচনা হতে জানা যায় যে, বৃটিশ শাসনামলের পূর্বে এ দেশের মাদরাসাসমূহের শিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার চাইতে স্বতন্ত্র ধরণের ছিল। গোটা পাঠ্যসূচিকে কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়, যেমন বাৎসরিক, দ্বিবাৎসরিক ও ত্রৈবাৎসরিক। এবং সময়সীমা নির্ধারিত করে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। অতীতে তেমন কোন শ্রেণি বন্ধন বা বাধাধরা সময়-সূচির অনুশাসন ছিল না। তদানিন্তন কালে পাঠ্য বিষয়গুলোর জন্য বাছাই করা গ্রন্থসমূকে মানের দিক থেকে সাধারণত তিন ভাগে বিভক্ত করা হতো; উচ্চ মানের গ্রন্থ, মধ্যমানের গ্রন্থ ও নিম্নমানের গ্রন্থ।

গ্রন্থমানের ক্রমানুসারে পাঠ্যবিষয়াদির প্রত্যেকটি থেকে এক বা একাধিক গ্রন্থের সমন্বয়ে আদ্যোপান্ত পাঠসূচিকে কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হতো। এক শ্রেণিভূক্ত গ্রন্থ কয়টির অধ্যয়ন করা হলে শিক্ষার্থীদের উচ্চতর শ্রেণিতে উত্তীর্ণ বলে বিবেচনা করা হতো। এ শিক্ষা পদ্ধতি অনেকটাই এখনো উপমহাদেশের কওমী মাদরাসা সমূহে পরিলক্ষিত হয়। আধুনিক শ্রেণি বন্ধন, বাৎসরিক বা দ্বিবাৎসরিক অধ্যয়নসূচি, শিক্ষার্থীদের মর্জিমাফিক বিষয় নির্বাচন ইউরোপীয় সভ্যতার অবদান।

এ উপমহাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বেই মুসলিম বিশ্বের মধ্যে উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে ইসলামী তথা আরবী শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে উঠে। এগুলোর মধ্যে উপমহাদেশের উপর সব চাইতে বেশী প্রভাব পড়ে বাগদাদের দরসে নিযামিয়ার। দিল্লীতে মাওলানা আব্দুর রহীমের ইসলামী শিক্ষা পরবর্তী সময় শাহ ওলীউল্লাহর শিক্ষা ব্যবস্থা, লখনৌতিতে নিযামুদ্দীন সাহলাভীর দরসে নিযামিয়া প্রবর্তণের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত উপমহাদেশের আরবী শিক্ষার উপর বাগদাদের দরসে নিযামিয়ার গভীর প্রভাব কার্যকর ছিল।[১] নিযামুদ্দীন সাহলভী কর্তৃক প্রণীত সিলেবাস সম্পর্কে সরকার কর্তৃক প্রেরিত গোয়েন্দা রিপোর্টার 'জন পামর' তার রিপোর্টে দাবী করে বলেছেন যে, আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, যদি কোন অমুসলিমও এ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভ করে তাহলেও সে যথার্থ ভাবেই উপকৃত হবে। আরবী, উর্দ্দূ, ইংরেজী, ফারসী, জ্যামিতি,

১. ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, ঢাবি, পত্রিকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫, পৃ. ২৫-২৬

অংক, ভূগোল, প্রাচীন বিজ্ঞান, দর্শনসহ কওমী মাদরাসা নেসাবভূক্ত সকল কিতাবাদিই সেখানে পড়ানো হতো। শিক্ষা সিলেবাসে এতটাই ব্যাপকতা ছিল যে, হিন্দু ছেলেরাও সে প্রতিষ্ঠানে লেখা-পড়া করত বলে তারিখে দারুল উলূমে উল্লেখ রয়েছে।

মাওলানা শিবলী বাগদাদের দরসে নিযামিয়ার প্রভাব বর্ণনা করে বলেন-নিযামিয়ার প্রাণসঞ্চারক প্রভাব প্রত্যেকটি দেশকে অদ্ভুতভাবে প্রভাবিত করে। এ শিক্ষাপদ্ধতি প্রতিষ্ঠালাভ করে ইসলামের আবির্ভাব পঞ্চম শতকে। ষষ্ঠ শতকে স্পেন ছাড়া আর কোন দেশই এর প্রভাব থেকে মুক্ত ও বিচ্ছিন্ন থাকতে পারেনি। এতে অনুমিত হয় যে, উপমহাদেশের অন্যান্য অংশের ন্যায় বাংলাদেশের আরবী শিক্ষা ব্যবস্থাও বাগদাদের দরসে নিযামিয়ার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিল।[১] মুসলিম শিশুদের জন্য মক্তব বা মসজিদে প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হতো ধর্মীয় শিক্ষা দিয়ে। মসজিদের ইমাম হিসাবে শিক্ষার্থীদেরকে ইসলামের মৌলিক অনুশাসন এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান সম্পর্কে জ্ঞান দান করতেন। হিন্দু কবি মুকুন্দ রাম তার 'চন্ডীমঙ্গল' কাব্যে বলেন-প্রত্যেক মুসলিম মহল্লায় মক্তব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এখানে সমস্ত মুসলমান ছেলে-মেয়েকে ধর্মপ্রাণ মৌলবিগণ শিক্ষা দিতেন। ইসলামের মৌলিক অনুশাসন এবং অনুষ্ঠানাদি সম্পর্কে অবগত হতে হলে কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান হাসিল করা অপরিহার্য। কাজেই নি:সন্দেহে বলা যায় যে, বাংলার প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার পাঠ্যসূচিতে কুরআন ও হাদীসের পঠন পাঠন অন্তর্ভুক্ত ছিল।[২]

বাংলার সমগ্র মুসলিম শাসনামলে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদেরকে আরবী, ফার্সী ও বাংলা এ তিনটি ভাষা শিক্ষা করতে হতো। কুরআন ও হাদীস শিক্ষার জন্য আরবী ভাষা শেখা একান্ত প্রয়োজন। সমগ্র মুসলিম শাসনামলে ফার্সী ছিল রাষ্ট্র ভাষা। চাকুরীর জন্য ফার্সী ভাষা অনুশীলন অত্যাবশ্যক ছিল। বাংলা ভাষা বহু মুসলিম ও অমুসলিমদের মাতৃভাষা ছিল। ফলে বাঙালী মুসলমানদের মাতৃভাষা শিক্ষাকে অবহেলা করতে পারে নাই। চৈনিক দূত মাহুয়ান বাংলার ভাষা সম্পর্কে বলেন-"জনগণের ভাষা বাংলা, ফার্সীও এখানে বলা হয়।" প্রকৃত পক্ষে মুসলমান শাসনকর্তাগণ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির পৃষ্ঠপোষকতা করেন। ফলে বাংলা ভাষা বাংলার সুলতানী আমলে গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়।

বহু মুসলমান কবি বাংলা ভাষায় তাঁদের গ্রন্থ রচনা করেন। এসব তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে, মুসলিম আমলে ইসলামী শিক্ষার প্রাথমিক স্ত-রে কুরআন, হাদীস ও ফিকাহ আবশ্যকীয় বিষয় হিসাবে এবং আরবী, ফার্সী ও বাংলা ভাষা হিসাবে ছাত্রদের পাঠ্যসূচিভুক্ত ছিল। প্রাথমিক শিক্ষার পর আসে ছাত্রদের জন্য প্রাগ্রসর (মাধ্যমিক) শিক্ষার মূল বিষয়, আরো ব্যাপক ও

---

১. ড. শিবলী নুমানী, *মাকামাত এ শিবলী* (আযমগড়, ১৯৩২ খ্রি.), পৃ. ৪৩

২. প্রাগুক্ত।

বিশ্লেষণধর্মী করে প্রাগ্রসর ছাত্রদের কাছে উপস্থাপন করা হতো। কাজেই কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যামূলক আলোচনা প্রাগ্রসর শিক্ষার পাঠ্যসূচিভুক্ত ছিল। কুরআনের তাফসীর ও হাদীসের তাশরীহ এ পর্যায়ভুক্ত ছিল। প্রাগ্রসর শিক্ষার প্রধান বিষয় হিসাবে কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যামূলক আলোচনা তথা আইন শাস্ত্র অনুশীলনের উপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হতো। এসব বিষয় ছাড়াও লোকায়ত সাধারণ বিজ্ঞান, যেমন যুক্তিবিদ্যা, অংকশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা, আলকেমী বা রসায়ন, হিনদাসা বা জ্যামিতি, জ্যোতিষশাস্ত্র, তারীখ বা ইতিহাস এবং আরো অনুরূপ বিষয়ও শিক্ষার পাঠ্যসূচিভুক্ত ছিল। এ সম্পর্কে সম্রাট আকবরের দরবারে ঐতিহাসিক আবুল ফজলের সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন-"প্রত্যেক শিক্ষার্থীরই নীতিশাস্ত্র, গণিত, কৃষি, পরিমাপশাস্ত্র, জ্যামিতি, জ্যোতিষশাস্ত্র, চরিত্র নির্ণয়বিদ্যা, গার্হস্থবিদ্যা, সরকারী আইন-কানুন, চিকিৎসা বিদ্যা, যুক্তিবিদ্যা, উচ্চতর অংকশাস্ত্র, বিজ্ঞানসমূহ ও ইতিহাস ইত্যাদি পাঠ করা উচিৎ। এগুলোর প্রত্যেকটি বিষয়ই ক্রমে ক্রমে আয়ত্ত করা যেতে পারে।"

আবুল ফজলের বক্তব্য দৃষ্টে মনে হয় যে, ঐ সময়ে বাংলার শিক্ষায়তনসমূহে এ সমস্ত বিষয় পাঠ্যসূচিভুক্ত ছিল। প্রাগ্রসর শিক্ষার্থীগণ নিজের পছন্দ অনুযায়ী বিষয় নির্ধারণ করে এক বা একাধিক বিষয়ে অধ্যয়ন করে দক্ষতা অর্জন করার সুযোগ লাভ করতো।[১] ত্রিবেণী, দরসবাড়ী, পান্ডুয়া, মহিসুন, বাঘা এবং সোনারগাঁ মাদরাসা সমূহকে প্রথম শ্রেণির মাদরাসা বা উচ্চতর শিক্ষার প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করা যায়। এ সমস্ত শিক্ষায়তনে মাধ্যমিক স্তরের পঠিতব্য বিষয়সমূহ ছাড়াও চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাখা শবব্যবচ্ছেদ ও শরীর কাঠামো বিদ্যার পাঠ্যসূচিভুক্ত ছিল বলে ধারণা করা যায়।

গৌড়ের মাহদীপুরস্থ গুণমনত মসজিদে প্রাপ্ত শিলালিপিতে সুলতান জালাল উদ্দীন ফতেহ শাহকে (১৪৮১-১৪৮৭) 'কুরআন শরীফের রহস্য উঘাটনকারী এবং ধর্মীয় ও শারীরিক বিদ্যায় (চিকিৎসা বিদ্যা) পারদর্শী (revealer of the secrets of the Quran, learned in all branches of learning, both as regards religion and the (care of) bodies (i.e a physician) সম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।[২] বাংলার উচ্চতর শিক্ষায়তনে তাফসীর, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব এবং শরীর বিজ্ঞান পাঠ্য সূচিভূক্ত ছিল। এ উপমহাদেশে অন্যান্য অংশের মত বাংলাদেশের মাদরাসা সমূহে গ্রীক ও ইরানী চিকিৎসা শাস্ত্রের অধ্যয়ন করা হতো এবং এ শাস্ত্রমতে চিকিৎসা চালানো হতো।

উপরিউক্ত পাঠ্য বিষয় ছাড়াও তীর চালনা ও যুদ্ধ কৌশল বিদ্যা বাংলার উচ্চতর শিক্ষায়তনের পাঠ্যসূচিভুক্ত ছিল। মুহাম্মদ বুদাই কর্তৃক রচিত 'হিদায়াত আররামী' বা তীর চালনার

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩-৩৪

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪-৩৫

নির্দেশিকা প্রমাণ করে যে, তীর চালনা বিদ্যা এদেশের মাদরাসায় পাঠ্য সূচিভূক্ত ছিল।[১] বাংলার মসজিদ মাদরাসা ও অন্যান্য স্থাপত্য ইমারতের শিলাগাত্রে উৎকীর্ণ লিপির সাক্ষ্যে বলা যায় যে, ক্যালিগ্রাফি বা লিপিকলা একটি ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে মাদরাসার পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বৃটিশ পূর্ব যুগ পর্যন্ত ধাপে ধাপে আরবী মাদরাসা সমূহে যেসব পাঠ্যসূচি প্রবর্তিত ছিল, মৌলবী আবুল হাসনাত নদভী যুগের ক্রমানুসারে তা পাঁচ শ্রেণিতে বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেক বিষয়ের পাঠ্য গ্রন্থসমূহের নামও উল্লেখ করেন।

প্রথম যুগ

এ যুগটি হি. সপ্তম শতক ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে হি. দশম শতক ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত। মোটামুটি বলতে গেলে আরবী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রথম যুগটি দু'শতাধিক বছর স্থায়ী হয়। এ সময় ছরফ, নাহু, বালাগাত, ফিক্‌হ, উসূলে ফিক্‌হ, মানতিক, কালাম, তাসাওউফ, তাফসীর ও হাদীস এসব বিষয়ের শিক্ষা অর্জন ছিল সূধী সমাজে মর্যাদা লাভের মানদন্ড। এ যুগে ফিক্‌হ ও উসূলে ফিক্‌হ এ বুৎপত্তি অর্জন করাটা ছিল জ্ঞানের রাজ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী হওয়া। হাদীস বিষয়ে মাশারিকুল আনওয়ার অধ্যয়ন করাই যথেষ্ট বলে বিবেচিত ছিল। কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি 'মাসাবীহ' পড়েন তিনি হাদীস শাস্ত্রে বিশ্বের ইমাম উপাধি লাভের যোগ্য বিবেচিত হতেন। সাহিত্যের প্রতি কোন গুরুত্ব আরোপ করা হতো না। কেবল 'মাকামাত-ই-হারীরী' কণ্ঠস্থ করানো হতো।[২] হি. সপ্তম শতক থেকে নবম দশক পর্যন্ত পাঠ্যসূচিতে যে সব বিষয় ও গ্রন্থসমূহ অন্তর্ভূক্ত ছিল তা নিম্নরূপ:-

ইলমে নাহুতে	: *মিসবাহ, কাফিয়াহ, লবাবুল আলবাব, ইরশাদ*
ইলমে ফিকাহতে	: *হিদায়াহ*
উসূলে ফিকাহতে	: *মানার, শারহে মানার ও উসুলে বায়যাবী*
তাফসীরে	: *মাদারিকুত তানযীল, বায়যাবী ও কাশশাফ*
হাদীস শাস্ত্রে	: *মাশারিকুল আনওয়ার, মিসবাহুস সুন্নাহ*
আরবী সাহিত্যে	: *মাকামাত-ই-হারীরী*
মানতিক শাস্ত্রে	: *শরহে শামসিয়্যাহ*
কালাম শাস্ত্রে	: *ছাহায়েফ, তামহীদ-ই-আবুশ শাকুর*

১. A. Karim, Social History of The Muslims In Bengal. Dhaka, Asiatic society of Pakistan 1959, P. 80

২. আবুল হাসান আলী নদবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫-৮৬

তাসাউফে : *আওয়ারিফুল মাআরিফ, নাকদুন নুসূস, লামআত, ফুসূসুল হিকাম* ইত্যাদি।[১]

দ্বিতীয় যুগ

এ যুগটি ষোড়শ শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে সপ্তদশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এ যুগের পাঠ্যসূচি ছিল অনেকটা প্রথম যুগেরই অনুরূপ। তবে এ যুগে পূর্ববর্তী যুগের পাঠ্যসূচির সঙ্গে কাযী আয়ুদ রচিত 'মাতালী' 'মওয়াকিফ' ও সাক্কাকী রচিত 'মিফতাহুল উলুম' ও পাঠ্যভুক্ত করা হয়। এছাড়া ক্রমান্বয়ে *'শরহ-ই-মাতালী' 'শরহ-ই-মাওয়াকিফ' 'মুতওউয়াল' 'মুখতাসারুল মাআনী' 'তালবীহ' 'শরহ-ই-আকায়েদ-ই-নাসাফী' 'শরহ-ই-বিকায়াহ'* ও *'শরহ-ই-জামী''*ও সংযোজিত করা হয়।

এ যুগের সর্বশেষ ও সর্বাপেক্ষা খ্যাতনামা আলেম ছিলেন শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস-ই-দিহ্লভী (৯৫৬/১৫৪৯-১০৫২/১৬৪২ তিনি ৯৯৬/১৫৮৭খ্রি. মক্কা মদীনায় গমন করেন এবং সেখানে ৩/৪ বছর হাদীস শিক্ষা করে দেশে ফিরে আসেন। তিনি ও তাঁর পুত্রগণ উপমহাদেশে হাদীস শিক্ষা প্রবর্তণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। কিন্তু তাদের প্রয়াস আশানুরূপ সাফল্যমণ্ডিত হয়নি। নিয়তী এ কৃতিত্ব চিহ্নিত করে রেখেছিল পরবর্তী যুগের অপর এক মহান ব্যক্তিত্বের জন্য। তিনি হলেন শাহ ওলীউল্লাহ।

মোটকথা, আলোচনাধীন দ্বিতীয় যুগে উপমহাদেশে হাদীস ও আরবী সাহিত্যের শিক্ষা প্রসার লাভ করেনি। এ যুগে সাক্কাকী রচিত 'মিফতাহুল উলুম' এবং কাযী আয়ূদ লিখিত 'মাতালি'ও মওয়াকিফই জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গ্রন্থ বলে বিবেচিত হতো।[২]

তৃতীয় যুগ

এ যুগ ঈসায়ী সপ্তদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত। এ সময়ও আরবী মাদরাসাসমূহের পাঠ্য তালিকায় কিছুটা নতুন সংযোজন করা হয় এবং ইসলামী তথা আরবী ফারসী শিক্ষার উন্নতি বিধান করা হয়। এ যুগের সর্বশেষ ও সর্বাপেক্ষা খ্যাতনামা মনীষী ছিলেন শাহ ওলীউল্লাহ দিহলবী (১৭০৩-১৭৬২) তিনি তাঁর 'আল জুমউল লতীফ' নামক আত্মজীবনী চরিত গ্রন্থে সে যুগে প্রচলিত পাঠ্যসূচি বর্ণনা করে লিপিবদ্ধ করেন।

পাঠ্যসূচি নিম্নরূপ

ইলমুন নাহু : *কাফিয়া, শরহে জামী*

ইলমুল মানাতিক : *শরহে শামসিয়া, শরহে মাতালি*

---

১. ড. মুহা: আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

২ ড. আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭-২৮, আবুল হাসনাত নদভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭-৮৮

ইলমুল ফালসাফা : *শরহে হিদায়াতুল হিকমত*

ইলমুল কালাম : *শরহে আকাইদে নাসাফী, খেয়ালীর হাশিয়াহ, শরহে মাওয়াকিফ*

ইলমুল ফিকহ : *শরহে বিকায়া, হিদায়া, ইলমু উমুলিল ফিকহ হুসামী ও তাওযীহ-তালবীহ* অংশ বিশেষ।

ইলমুল বালাগাত : *মুখতাসারুল মা'আনী ও মুতাওয়াল*

ইলমুল হাইয়াত ওয়া হিসাব: কিছু কিছু প্রাথমিক কিতাব।

ইলমুত্তিব : *আল কানুন* (সংক্ষিপ্ত)।

ইলমুল হাদীস : *মিশকাতুল মাসাবীহ* (সম্পূর্ণ), *শামায়েলে তিরমিযী* (সম্পূর্ণ) *সহীহুল বুখারী* (অংশ বিশেষ)।

ইলমুত্ তাফসীর : *মাদারিক ও বায়যাভী*

ইলমুত তাসাওউফ ওয়াস্ সূলূক : *আওয়ারিফুল মা'আরিফ, রাসায়েলে নকশবন্দিয়া, শরহে রুবাইয়াতে জামী, শরহে লামআত* এর ভূমিকা এবং *নাকদুন নুসূস* এর ভূমিকা।

ঐ পাঠ্যক্রম শেষ করে শাহ ওলীউল্লাহ মদীনায় গমন করেন। তথায় কয়েক বছর শায়খ আবু তাহের মাদানীর নিকট হাদীস শিক্ষা করে দেশে ফিরে আসেন (১৭৩২) এবং সিহাহ-ই-সিত্তাহর শিক্ষাদান ও শিক্ষা প্রসারে জীবন উৎসর্গ করেন। তাঁর বংশের আলেমকুল এবং তাঁর শিষ্যগণও হাদীস তফসীর চর্চায় যুগসৃষ্টিকারী ভূমিকা পালন করেন। শাহ ওলীউল্লাহ স্বয়ং একটি পাঠ্য তালিকা প্রণয়ন করেছিলেন। কিন্তু তা জনপ্রিয়তা লাভে সক্ষম হয়নি। কারণ সে সময় মুসলিম শাসন পতনোন্মুখ ছিল বলে দিল্লীর শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষা ধারায় ভাটা পড়ে এবং লখনৌতে মোল্লা কুতুবুদ্দীন ও তদীয় পুত্র মোল্লা নিযামুদ্দীনের উদ্যোগে অপর একটি উদীয়মান ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠে। এছাড়া যুক্তি বিদ্যা ও দর্শনের প্রতি সে যুগীয় লোকের অনুরাগও ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছিল। তাই তারা দিল্লী স্কুলের হাদীস তাফসীর শিক্ষার প্রতি ততটা আকৃষ্ট না হয়ে লখনৌ কেন্দ্রের মানতিক-হিকমাত ভিত্তিক শিক্ষায় অনুরাগী হয়ে উঠে। আরবী ফারসী সাহিত্যের প্রতি সাধারণ শিক্ষার্থীদের কোন ঝোঁক ছিল না। পাঠ্য তালিকায়ও এ সাহিত্যদ্বয়ের জন্য কোন ব্যবস্থা ছিল না।[১] শাহ ওয়ালিউল্লাহ হি. দ্বাদশ শতকের শেষের দিকে সিহাহ সিত্তাকে শিক্ষা সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করেন।[২]

চতুর্থ যুগ

১ আবুল হাসানাত নদভী ঃ প্রাগুক্ত, পৃ: ৮৯-৯০

২ প্রাগুক্ত।

এ যুগের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মোল্লা নিযামুদ্দীন সাহলাভী। মোল্লা নিযামুদ্দীন ছিলেন শাহ ওয়ালীউল্লাহর সমবয়স্ক। শাহ ওলীউল্লাহর যুগে যে পাঠ্যসূচি প্রচলিত ছিল মোল্লা নিযামুদ্দীন তাতে অনেক কিছু পরিবর্তন সাধন করেন। পরিবর্তন সাধনের পর পাঠ্যসূচির যেরূপ দাঁড়ায় তা এই-

ইলমুস ছারফ	: *মীযান, মুনশায়িব, সারফে মীর, পানজগানজ, যুবদাহ, ফুসুলে আকবরী, শাফিয়াহ।*
ইলমুন নাহু	: *নাহুমীর, শরহে মিয়াতে আমিল, হিদায়াতুন নাহু, কাফিয়া ও শরহে জামী।*
ইলমুল মানতিক	: *সুগরা, কুবরা, ঈসাগুজী, তাহযীব, শরহে তাহযীব, সুল্লামুল উলুম এবং কুত্‌বী (মীর কুতবীসহ)।*
ইলমুল হিকমত	: *মাইবুযী, ছদরা ও শামসে বাযিগাহ।*
রিয়াযীতে	: *খুলাসাতুল হিসাব*
জ্যামিতি	: প্রথম অধ্যায়, *তাশরীহুল আফলাক* এবং *শরহে চিগমিনী* প্রথম অধ্যায়।
ইলমুল বালাগাত	: *মুখতাসারুল মা'আনী, মুতাওয়াল।*
ইলমুল ফিকহ	: *শরহে বিকায়াহ* প্রথম দু'খণ্ড, *হিদায়াহ* শেষ দু'খণ্ড।
ইলমু উসুলিল ফিকহ	: *নূরুল আনওয়ার, তাওযীহ-তালবীহ।*
ইলমুল কালাম	: *শরহে আকায়িদে নাসাফী, শরহে আকায়িদে জালালী, মীর যাহেদ* এবং *শরহে মাওয়াকিফ।*
ইলমুত তাফসীর	: *জালালায়ন* ও *বায়যাবী।*
ইলমুল হাদীস	: *মিশকাতুল মাসাবীহ।*

এ যুগে প্রণীত দরসে নিযামিয়া গোটা উপমহাদেশের আরবী শিক্ষার উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। লখনৌর দরসে নিযামিয়ার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ায় উপমহাদেশের বাগদাদের দরসে নিযামিয়ার প্রভাব হ্রাস পেতে থাকে।[১] ইষ্টইন্ডিয়া কোম্পানীর আমলে ১৭৮০খ্রি. কলকাতা মাদরাসা স্থাপিত হয়। তাতে ১৭৮১খ্রি. পর্যন্ত লখনৌর দরসে নিযামিয়া প্রচলিত ছিল এবং পরবর্তী সময় মাদরাসা-ই-আলীয়ার পাঠ্যসূচিতে কিছুটা রদ-বদল করা হলেও ১৮৯১খ্রি. পর্যন্ত কতকটা পরিবর্তন পরিবর্ধন সহকারে লখনৌর দরসে নিযামিয়াই তাতে প্রচলিত ছিল। মাদরাসা-ই-আলীয়া ছাড়া বাংলার কওমী মাদরাসাসমূহে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত মোটামুটি লখনৌর দরসে নিযামিয়াই প্রচলিত ছিল।

---

১. ড. আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯; আবুল হাসানাত নদভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০-৯১

লখনৌর দরসে নিযামিয়ার প্রভাব বর্ণনা করে ১৯৯১খ্রি. ১২ই নভেম্বর 'আন্‌নাদওয়া' (লখনৌ) পত্রিকায় মাওলানা শিবলী বলেন "ভারতের জ্ঞানচর্চার ইতিহাসে দরসে নিযামিয়া সবচাইতে গৌরবময় অধ্যায়। বর্তমান ভারতে কলকাতা থেকে পেশওয়ার পর্যন্ত জ্ঞান চর্চার যেসব ধারা প্রবাহমান রয়েছে সেসব এ উৎস থেকেই উৎসারিত। এ পদ্ধতিতে শিক্ষালাভ না করা ব্যক্তিকে আলেম বলে গণ্য করা চলে না। মেকি মুদ্রাকে যেমন টাকা বহির্ভূত বলে বিবেচনা করা হয়, তেমনি যে গ্রন্থটি দরসে নিযামিয়া বহির্ভূত, তাকে পাঠ্য তালিকাভুক্ত হওয়ার অযোগ্য বলেই মনে করা হয়।[১]

পঞ্চম যুগ

এ যুগ হচ্ছে ইসলামী শিক্ষার প্রতিষ্ঠানের পতনের যুগ। উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের (১৭৫৭-১৮৫৭) বাতি তখন ক্রমেই নিস্প্রভ হয়ে চলছিল। মুসলমানদের জ্ঞান ও শিক্ষার আসর অব্যবস্থা ও বিশৃঙ্খলার শিকার। এ যুগে যে পাঠ্যসূচি প্রণীত হয়েছে, মূলত: তা বিগত দরসে নিযামির বিকৃত পরিবর্তিত রূপ। এ যুগের শিক্ষা ব্যবস্থাও ছিল ত্রুটিপূর্ণ। তারপরও এখন পর্যন্ত এ পাঠ্যসূচিই প্রায় সকল মাদরাসায় প্রচলিত আছে। পাঠ্যসূচি নিম্নরূপ

ইলমুস সরফ	: *মীযান, মুনশায়েব, পাঞ্জগাঞ্জ, যুবদা, দস্তরুল মুবতাদী, ছরফে মীর*, বিগত অর্ধ শতাব্দী থেকে *ইলমুস সীগাহ, ফুসূলে আকবরী* এবং *শাফিয়া*।
ইলমুন নাহু	: *নাহবেমীর, শরহে মিয়াতে আমিল, হিদায়াতুন নাহু, কাফিয়া ও শরহে জামী।*
ইলমুল বালাগাত	: *মুখতাসারুল মা'আনী* (সম্পূর্ণ), *মুতাওয়াল মা'আনা কুলতু* পর্যন্ত।
ইলমুল আদব	: *নাফহাতুল ইয়ামান, সাবআ মুআল্লাকাত, দীওয়ানে মুতানাব্বী, দীওয়ানে হামাসা, মাকামাতে হারীরী।*
ইলমুল ফিকহ	: *শরহে বেকায়া* (প্রথমার্ধ) ও *হেদায়া* (দ্বিতীয়ার্ধ)।
ইলমু উসূলিল ফিকহ	: *নূরুল আনওয়ার, তাওযীহ, তালবীহ* এবং *মুসাল্লামুস সুবূত*। উসূলে ফিকহ এর কিতাব হলেও যে অংশটি পাঠ্যভুক্ত মূলত তা কালাম বিদ্যার অংশ।
ইলমুল মানতিক	: *ছোগরা, কোবরা, ইসাগুজী, কালা আকুলু, মীযানুল মানতিক, তাহযীব, শরহে তাহযীব, কুতবী, মীর কুতবী, মোল্লা হাসান, মোল্লা হামদুল্লাহ, কাযী মুবারক, মীর যাহেদ, গোলাম ইয়াহইয়ার*

১. ড. আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০; শিবলী নুমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

টীকাসহ, মোল্লা জালাল। কোথাও কোথাও *বাহরুল উলূম শরহে সুল্লাম*, *মীর যাহেদ* (আব্দুল আলীর টীকাসহ) এবং *সুল্লামের শারাহ মোল্লা মুবীন*।

ইলমুল হিকমত : এতে পাঠ্যভুক্ত রয়েছে *মায়বুযী*, *সদরা*, *শামসে বাযেগাহ*।

ইলমুল কালাম : *শরহে আকায়িদে নাসাফী*, *খেয়ালী* এবং *মীর যাহেদ উসূলে আম্মা*।

রিয়ায বা গণিত : *তাহরীরে উকালদাস*, (ইউক্লিডের জ্যামিতি) (*মাকামায়ে উলা*) *খুলাসাতুল হিসাব*, *তাসরীহ*, *শরহে তাসরীহ*, *শরহে অচীগসিনা*।

ফারায়েয : *শরীফিয়া*।

ইলমুল মুনাযারাহ : *মুনাযারা-ই-রাশীদিয়াহ*।

ইলমুত তাফসীর : *জালালায়ন*, *বায়যাভী* (অংশ বিশেষ)

উসূলুল হাদীস : *শরহে নুখবাতুল ফিক্‌র*।

ইলমুল হাদীস : *বুখারী*, *মুসলিম*, *মুওয়াত্তা*, *তিরমিযী আবু দাউদ*, *নাসাঈ*, *ইবন মাজা*।

এটা কারো অজানা নয় যে, আরবী ভাষা ও আরবী সাহিত্যে আধিপত্য অর্জিত হলে হাদীস তফসীরের জ্ঞানলাভ করাও সহজতর হয়ে উঠে। এ যুগে সে সুযোগটি ছিল সীমিত। মানতিক বা যুক্তি বিদ্যার জন্য নির্ধারিত সব কয়টি গ্রন্থই সকল প্রতিষ্ঠানে পড়ানো হতো। অথচ হাদীস ও সাহিত্যের জন্য পাঠ্যভুক্ত গ্রন্থগুলো সকল প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা দেয়া হতো না। তাই সাহিত্য পড়ার জন্য অনেক শিক্ষার্থীর নিজ দায়িত্বে স্বতন্ত্র শিক্ষকের আশ্রয় গ্রহণ করতে হতো। হাদীস বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্যও শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন হাদীসকেন্দ্রে সফর করতে হতো। এতে বুঝায় হাদীস ও আরবী সাহিত্যের গ্রন্থাবলী পাঠ্যসূচি বহির্ভূত ছিল।

পঞ্চম যুগের পাঠ্যসূচির ত্রুটি-বিচ্যুতি

১. এতে মানতিকের কিতাব প্রয়োজনের চাইতে অনেক বেশি ছিল। শুরু থেকে হিসাব করলে দেখা যাবে একই বিষয়ে ১৫ টি গ্রন্থ ছিল।

২. মানতিকের গ্রন্থগুলোতে মানতিকের বিষয় খুবই কম। মূলত এগুলোতে দর্শনই আলোচিত হয়েছে বেশী। অপ্রয়োজনীয় এসব বিষয়ের গোলক ধাঁধাঁয় পড়ে ছাত্ররা মূল বিষয়ের প্রতি খুব বেশী মনোযোগী হতে পারতো না।

৩. মানতিক বিষয়ে ১৫ টি গ্রন্থ থাকলেও তাফসীরের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে রাখা হয়েছে মাত্র দুটি গ্রন্থ জালালাইন ও বায়যাবী। বায়যাবীর মাত্র আড়াই পাড়া পাঠ্যভুক্তি, পূর্ণ

জালালায়ন অন্তর্ভুক্ত হলেও তা এত সংক্ষিপ্ত যে, কুরআন শরীফ এবং এর শব্দ সংখ্যা প্রায় সমান সমান।

৪. আদব ও আরবী জ্ঞানে পারদর্শিতার দ্বারা হাদীস-তাফসীর বুঝা সহজ হয়। কিন্তু এর অংশ খুবই সামান্য। বালাগাত তথা আরবী অলংকার শাস্ত্রের মাত্র দু'টি কিতাব অন্তর্ভুক্ত মুখতাসারুল মা'আনী ও মুতাওয়াল। মুতাওয়াল সামান্য অংশ পাঠ্যভূক্ত, মুখতাসারও সম্পূর্ণ পড়ানো হয় না। আরবী সাহিত্যের অবস্থাও একই।

৫. এতে ইতিহাস, ভূগোল, ইলমে এ'যাজুল কুরআনের মতো জরুরি বিষয় আদৌ অন্তর্ভুক্ত নেই।

পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি পর্যালোচনা

পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি পর্যালোনায় সংক্ষেপে বলতে গেলে শাহ ওলীউল্লাহ পূর্ব যুগে আরবী মাদরাসা সমূহে ফিকহ ও উসুলে ফিকহ (ফিকহশাস্ত্রের মূলনীতি) এর উপরই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হতো। তখন হাদীস, তাফসীর শিক্ষার প্রতি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের তেমন কোন লক্ষ্য ছিল না। আব্দুল হক মুহাদ্দিস দিহলবীই (১৫৫১-১৬৪২) সর্বপ্রথম মক্কা-মদীনায় হাদীসের তালীম গ্রহণ করেন (১৫৮৭) এবং তা স্বদেশে প্রচলিত করার প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু তা ফলপ্রসু হয়নি। পরিশেষে শাহ্ ওয়ালীউল্লাহর (১৭০৩-১৭৬২) উদ্যোগে দিল্লীতে যে শিক্ষাকেন্দ্র (রাহীমিয়া মাদরাসার বর্ধিত রূপ) গড়ে উঠেছিল তাতেই সত্যিকার অর্থে হাদীস ও তাফসীর শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করা হয়। কিন্তু এর সমসাময়িক লাখনৌতে দরসে নিযামিয়া প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় হাদীস ও তাফসীরের শিক্ষা কার্যক্রম অনেকটা ব্যহত হয়। কেননা লাখনৌ কেন্দ্রে যুক্তিবিদ্যা ও দর্শনের উপরই বেশি জোর দেয়া হতো। তবে এটাও স্বীকার করতে হবে যে, এখানকার শিক্ষার্থীদের মাঝে জ্ঞান লাভের অধিকতর যোগ্যতা ও আগ্রহের সৃষ্টি হতো। কারণ এ শিক্ষা পদ্ধতিতে প্রত্যেক বিষয়ের জটিলতম গ্রন্থগুলো পাঠ্যসূচির আওতাভুক্ত ছিল। দ্বিতীয়ত শিক্ষাদান ক্ষেত্রে গ্রন্থের ভাষা বা শব্দ চয়নের প্রতি তেমন জোর না দিয়ে বিষয়বস্তুর উপরেই জোর দেয়া হতো। এ যুগের অব্যবহিত পরবর্তী যুগে সাহিত্য, হাদীস ও তাফসীরের কয়েকটি গ্রন্থ পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু তখনো আরবী সাহিত্য বা হাদীস চর্চা প্রাধান্য লাভ করেনি।[১]

লাখনৌতে দরসে নিযামিয়ার প্রতিষ্ঠালাভের পূর্বে উপমহাদেশের আরবী প্রতিষ্ঠান সমূহে পাঁচশ বছর ধরে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিল, তার গতি প্রকৃতি ছিল ধর্মীয়। ধর্ম শিক্ষাদানই ছিল। সেগুলোর চরম ও পরম লক্ষ্য। তখন যুক্তিবিদ্যা ও দর্শনের শিক্ষা ছিল অতি অল্প। এসব

১. আবুল হাসানাত নদভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১-৯৩; ড. আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০-৩১, ডঃ আ.ই.ম. নেছার উদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩-৮৪

বিষয়ের জন্য শুধু কুত্‌বী পর্যন্তই শিক্ষা দান করা হতো। আবদুল্লাহ মুলতীই (মৃ. ৯২২/১৫১৬) সর্বাগ্রে যুক্তিবিদ্যা ও দর্শনের রেওয়াজ চালু করেন। পরবর্তী সময় মোল্লা কুতুবুদ্দীন শহীদ এ দু'টি বিষয়ের উন্নতি সাধন করেন। এতে একদিকে লাভ হলো যে, ইতিপূর্বে ফকীহদের মাঝে যে কঠোরতা ছিল তা অনেকটা হ্রাস পেলো।[১] পক্ষান্তরে আরবী শিক্ষার ধর্মীয় উদ্দেশ্য তথা হাদীস ও তাফসীরে জ্ঞান লাভের দিকটি ব্যহত হয়। এ শিক্ষা পদ্ধতিতে আরবী-ফার্সী সাহিত্যে পাঠ্যভূক্ত না থাকায় শিক্ষার্থীদের জন্য সাহিত্যিক যোগ্যতা হাসিলের দ্বার ছিল অনেকটা সংকুচিত। অপরপক্ষে 'নাহ্‌ব' ও সরফ এর প্রতি অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করায় পাঠকদের মাথার উপর অযথা গুরুভার পড়তো এবং শিক্ষার অন্তর্নিহিত দিকগুলোর উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতো।

এ শিক্ষা পদ্ধতির সমালোচনা করে মাওলানা উবায়দুল্লাহ উবায়দী বলেন-

We have seen in many works of modern logicians of lucknow that they have been actually led into a most ridiculous system of indulging in vain subtleties and captious contests. The excessive pursuit of it in our schools has been productive of fruitless quibbling and cavilling. It is indeed deplorable that this vain pedantic knowledge has so much engaged the attention of the learned moslems of India in later days that it has almost prevented them from pursuing other useful branches of learning.[২]

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, লখনৌর দরসে নিযামিয়ায় যেসব গ্রন্থ পাঠ্যভুক্ত ছিল সেগুলোর অধিকাংশই ছিল আরবী ভাষায় রচিত। এ শিক্ষা পদ্ধতিতে প্রধানত আরবী ভাষার মাধ্যমেই বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষাপ্রদান করা হতো। কিন্তু আরবী ভাষাজ্ঞান ও সাহিত্যজ্ঞান অর্জনের প্রতি কোন গুরুত্ব দেয়া হতো না। ফলে এ উপমহাদেশে দরসে নিযামিয়ার মাধ্যমে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের কোন উৎকর্ষ সাধিত হয়নি। আরবী গ্রন্থসমূহ পঠিত হতো ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। সাহিত্যিক বা সাধারণ জ্ঞানার্জনের দৃষ্টি কোন থেকে নয়। ধর্মনিরপেক্ষ যুক্তিবিদ্যা বা দর্শন যেটুকু শিক্ষা দেয়া হতো তা ছিল গ্রীকতত্ত্বধর্মী, যা শিক্ষার্থীদের প্রগতিশীল করা তো দূরে থাক বরং তাদেরকে নিয়ে যেতো মধ্যযুগের দিকে। অংক ছিল নগণ্য।

বৃটিশ পূর্ব যুগের ভারতীয় শিক্ষার গতি ও স্বরূপ কি ছিল তার আলোচনা রয়েছে ১৮৮২খ্রি. গঠিত হান্টার কমিশনের রিপোর্টে।

After the mussalman conquest, the mosque became in India, as in other countries of Islam, a centre of instruction and of literary activity, Education

১. ড. আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১-৩২; শিবলী নোমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫

২. ড. আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২; Reportof the Muslim Education advisory committee, 1934, P. 72

alike among the muhammadans and the Hindus was based upon religion, and was supported by edowments and bequests in Pios Usus.[১]

শিবলী নোমানী বলেন, শিক্ষার প্রসার লাভ করার কয়েকটি কারণ ছিল: শিক্ষা ছিল ধর্মের একটি জরুরী অঙ্গ। কুরআন-হাদীস ছিল ধর্মের ভিত্তি এবং এগুলো আরবী ভাষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলেই নাহব-সরফ, লুগাত, মা'আনী, জীবন চরিত বিদ্যা (আসমাউর রিজাল) কেও ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষার জরুরী অঙ্গ বলে মনে করা হতো। দর্শন ও ইলমে কালামের রূপ ধারণ করে ধর্মীয় শিক্ষার মর্যাদা লাভ করেছিল। সকল বিষয়ই ক্রমাগত এ পথে ধর্মীয় শিক্ষার সীমারেখায় প্রবেশ লাভ করে।[২]

১. প্রাগুক্ত।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে ইসলামী শিক্ষা

১৭৬৫ খ্রি. ১২ আগস্ট দ্বিতীয় শাহ আলম (১৭৫৯-১৮০৬) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাতে বাংলার দেওয়ানী সমর্পণ করেন। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কোম্পানী সরকার কর্তৃক তরিৎ কোন পরিবর্তন সাধন করা হয়নি। পূর্ববৎ ফার্সীই ছিল তাঁদের কোর্ট ভাষা। চিরাচরিতভাবে ইসলামী শরীয়ত অনুসারেই রাজস্ব ও বিচার বিভাগীয় আইন-কানুন প্রচলিত ছিল। উপস্থিত প্রশাসনিক প্রয়োজন মেটাবার লক্ষ্যেই ওয়ারেন হেষ্টিংস (১৭৭২-৮৫) ১৭৮০খ্রি. অক্টোবরে কলিকাতা মাদরাসা স্থাপন করেন। অন্যান্য ইসলামী প্রতিষ্ঠানের মত কলিকাতা মাদরাসায়ও ১৭৯০খ্রি. পর্যন্ত দরসে নিযামিয়া বলবৎ ছিল। ১৭৯১খ্রি. জিপম্যান এর অধিনায়কত্বে গঠিত সংস্কার কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী মাদরাসার পাঠ্যসূচিতে কিছুটা রদ বদল করা হয় এবং ১৮৭২খ্রি. পর্যন্ত মোটামুটি সেই পাঠ্য তালিকা-ই কলিকাতা মাদরাসা, হুগলী মাদরাসা এবং কলিকাতা মাদরাসার অধীন অন্যান্য প্রাইভেট মাদরাসাসমূহে বলবৎ থাকে।[১] সেই সময়ে কলিকাতা আলীয়া মাদরাসার শিক্ষাক্রম নিম্নরূপ-

ইসলামী শিক্ষার সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য (আর্ল কনফারেন্স ১৯৭০ হার্নেল কমিটি (১৯১৪) হার্লী কমিটি (১৯১৫) সামসুল হুদা কমিটি (১৯২১) মুমিন কমিটি (১৯৩১) মাওলা বকশ কমিটি (১৯৩৮) সৈয়দ মোআযযাম হোসেন কমিটি (১৯৬৮) গঠিত হয়েছিল। তার মধ্যে মোআযযাম কমিটি বাস্তবিক দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৬খ্রি. ৪ঠা জুলাই এ কমিটি গঠিত হয়।[২] উক্ত কমিটি গঠিত হয় ১৯ সদস্য বিশিষ্ট। এ কমিটি মাদরাসা সিলেবাস কমিটি হিসাবে আখ্যায়িত।[৩] ১৯৪৬খ্রি. ১২ই জুলাই কর্ম পদ্ধতি নির্ধারণের জন্য উক্ত কমিটি একটি সাধারণ আলোচনায় মিলিত হন। এ আলোচনা থেকেই ইসলামী শিক্ষার দুটি ধারা ওল্ড স্কীম ও নিউ স্কীমের সিলেবাস কারিকুলাম নিরীক্ষণের জন্য দুটি ভিন্ন উপ কমিটি গঠিত হয়।[৪]

ক. ফাজিল ২ বছর, খ. কামিল ২ বছর।

আলিম এবং ফাজিল শ্রেণিতে বাংলা এবং ইংরেজি এস, এস, সি সমপর্যায়ের হবে।[৫]

ফাজিল শ্রেণিতে আরবী সাহিত্য, আরবী গ্রামার ও কম্পোজিশন, হাদীস, উসূলুল হাদীস, তাফসীর, উসূলে তাফসীর, উসূলে ফিকহ, কালাম, আধুনিক দর্শন, মানতিক, তাসাউফ এবং

---

১. ড. মুহা: আব্দুল্লাহ, ঢা.বি. পত্রিকা, ফেব্রু/১৯৮৫, পৃ. ৩৩-৩৪

২. ড. আ: সাত্তার, বাংলাদেশে মাদরাসাশিক্ষা ও সমাজ জীবনের তার প্রভাব, ইফাবা-২০০৪, পৃ. ২২০

৩. (ক)বাংলাদেশ সরকার আদেশ নং ১৭২২। (খ) ড. মু সিকান্দর আলী ইবরাহীমী, *বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা অতীত ও বর্তমান* (ঢাকা জাকিয়া পাবলীকেশান্স, ১৯৯১ খ্রি.), পৃ. ৮৩

৪. ড. আ: সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১-২০২; Dr. Sekander Ali Ibrahimy, Reports on IslamicEducation and Madrasah Education in Bengal (Dhaka IFB 1985) volim-3, p-537

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬

নৈর্বাচনিক বিষয় বাংলা, ইংরেজি, উর্দু, ফার্সী অর্থনীতি, দর্জি বিজ্ঞান, কার্পেন্টারী এসব বিষয় হতে যে কোন একটি বিষয় নিতে পারবে।

কামিলঃ কামিল শ্রেণির পঠিত পূর্ণ সিলেবাস হতে পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে।

১. কামিল শ্রেণিতে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ পাঠ দান করা হবে।

ক. হাদীস ও তাফসীর

খ. ফিকহ ও উসূল

গ. আদব (আরবী সাহিত্য)

ঘ. ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

ঙ. ইসলামী দর্শন ও সূফীবাদ

চ. তাবলীগ

ফাজিল ও কামিল পরীক্ষায় নৈর্বাচনিক বিষয় হিসাবে মৌখিক পরীক্ষা ব্যবস্থা থাকবে। এ মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হবে প্রতি বিভাগের একটি কেন্দ্রে।

আলিম ও ফাজিল কোর্সের সাথে অতিরিক্ত ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত থাকবে (দর্জি বিজ্ঞান, কাঠের কাজ ইত্যাদি)।

পাকিস্তান আমল (১৯৪৭-১৯৭১খ্রি.)

পাক-ভারত উপমহাদেশে শিক্ষা বিস্তারে বৃটিশ সরকারের খুব বেশী আগ্রহ ছিল না। একমাত্র তাদের সুবিধে ও প্রয়োজন মেটাবার উদ্দেশ্যে তারা কিছু কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে। সুকৌশলে তারা কিছু সংখ্যক লোকদেরকে উচ্চ শিক্ষিত করে গড়ে তোলে। তাদের মাধ্যমেই তাঁরা অন্যের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের প্রতি আগ্রহী না হয়ে রাজ্য বাণিজ্য ও খৃষ্টান ধর্ম প্রচারে তারা অত্যন্ত উৎসাহী ছিল। এ দেশের শিক্ষার কল্যাণার্থে তারা তেমন কিছুই করেনি, যা করেছে তা তারা তাদের স্বার্থেই করেছে। বরং হিন্দু মুসলমান সময়ে যে সভ্যতা, সংস্কৃতি, শাসন কাঠামো ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৎকালীন শাসকরা ও জনসাধারণ এর সাহায্য সহযোগীতায় গড়ে উঠেছিল তাও তারা সুকৌশলে ধ্বংস করেছিল। এ দেশবাসীকে রাজ্য-বাণিজ্য, প্রশাসন, শিক্ষা, চাকুরি প্রভৃতি হতে সরিয়ে দিয়ে স্থানীয় জনগণের এক অসহায় অবস্থা সৃষ্টি করেছিল। মুসলমানরা জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল শাখায় অভূতপূর্ব উন্নতির স্বাক্ষর রেখেছিল। প্রায় অর্ধেক পৃথিবীর অধিকারী ছিল। শৌর্যবীর্যের এমন কি দাপটের সাথে রাজ্য শাসন করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। উপনিবেশিক শাসকরা মুসলমানদের এ গৌরবে ঈর্ষাপরায়ন হয়ে মুসলিম রাজ্য জয় করে তাদের শিক্ষার মাধ্যমে আরবী, ফার্সী ও উর্দু বিষয়গুলো সূকৌশলে পাঠ্যসূচি থেকে বিতারিত করে তাদের ভাষা চাপিয়ে দিয়েছিল। ফলে এদেশের মুসলমানরা সরকারী কর্মকান্ড হতে বিতারিত হয়ে অসহায় অবস্থায় পড়েছিল। পরাধীন জাতির ভাগ্যে যা ঘটার তার একশ

ভাগই ঘটেছে এ দেশের মুসলমানদের ললাটে। বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই ভারতবর্ষে গণজাগরণ প্রসার লাভ করে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং পরিণতি রাজনৈতিক জটিলতা ছাড়াও শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক অচলতার সৃষ্টি করে। ফলে এ দেশের সামাজিক ও সংস্কৃতিক জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এ পরিবর্তনের মুখেই আমরা বৃটিশ শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম হই। ফল স্বরূপ বৃটিশ ভারত বিভক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি সার্বভৌম রাষ্ট্র ১৯৪৭ খ্রি. ১৪ আগষ্ট জন্মলাভ করে। পাকিস্তান সার্বভৌম একটি দেশ। কিন্তু ভৌগলিক পরিবেশের বিবেচনায় পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের কোন সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যেত না। ভৌগলিক দুরত্ব বিচারে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যবধান সূদীর্ঘ ১২০০ মাইল ব্যাপী ভারতীয় এলাকা। পূর্ব পাকিস্তান হচ্ছে এক শস্য শ্যামল সবুজে ঘেরা নদী-নালা বিধৌত এক উর্বর ব-দ্বীপ আর পশ্চিম পাকিস্তান হচ্ছে দুর্গম পর্বত শ্রেণি ও বিস্তির্ণ মরু অঞ্চল। ধর্মীয় বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দু'অংশের অধিবাসীদের মধ্যে অনেক অনৈক্য বিদ্যমান ছিল।[১]

তৎকালীন পূর্ব বাংলা বর্তমান বাংলাদেশ একটি মুসলিম দেশের অংশ হওয়া সত্ত্বেও ক্ষমতাধর পাকিস্তানী প্রশাসন ইসলামী শিক্ষার প্রতি বৈরীভাব পোষণ করে। ইসলামী শিক্ষাকে উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতাভূক্ত করার কোন আগ্রহ তাদের দেখা যায়নি। ফল স্বরূপ ইসলামী শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের যে আশা দেশের সিংহভাগ তৌহিদী জনতা করে এসেছিল তা যেন অপূর্ণই রয়ে গেলো।[২]

ইসলামী শিক্ষার প্রতি পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর অনাগ্রহ অমনোযোগীতা ইসলামী শিক্ষার অনুরাগী ও সমর্থকদের মাঝে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ইসলামী শিক্ষার প্রতি পাকিস্তানী শাসকবলয় এর উদাসীনতা ছাত্র অভিভাবক জনতাকে ধীরে ধীরে আন্দোলনের দিকে ধাবিত করে। পরিশেষে ছাত্র-জনতা রাজপথে আন্দোলন শুরু করে।[৩]

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই ১৯৪৭খ্রি. নভেম্বর মাসে জাতীয় পর্যায়ে সারা দেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব ফজলুর রহমানের সভাপতিত্বে করাচিতে একটি শিক্ষা অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সেই অধিবেশনের সুপারিশমালার আলোকে দেশের সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্খার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ও সময়োপযোগী একটি শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নে সরকার প্রয়াসী হন। জনগণের অনুভূতির প্রতি অনুকুল সাড়া দিতে গিয়ে পূর্ব বাংলা সরকার ১৯৪৯খ্রি. ১৬ই মার্চ (এডুকেশন নং ৬৫৯ পত্রে) শিক্ষা সমস্যাকে ব্যাপকভাবে পর্যালোচনা

---

১. ড. মোঃ ইলিয়াস আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫-২৪৬

২. ড. আ: সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০; Dr. Sekandar Ali Ibrahimy, v-4. p-29

৩. প্রাগুক্ত, প. ২১০

করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদানের জন্য দেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও বিশিষ্ট সাংবাদিক মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খানের সভাপতিত্বে ১৭ সদস্যের একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি গঠন করেন। কমিটির সভাপতির নামানুসারে এটি আকরাম খান শিক্ষা কমিটি নামে পরিচিত।[১] কমিটির কর্ম পরিধির মধ্যে ইসলামী শিক্ষায় সর্বোত্তম পদ্ধতি নিরূপন করে সনাতনী স্কীম মাদরাসা পুনর্গঠিত মাদরাসা ও উচ্চ বিদ্যালয় এর সামগ্রিক পাঠ্যসূচির সকল উপাদান সুসমন্বিত করে ইসলামী ভাবধারা ও মূল্যবোধ প্রতিফলিত করার কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত ছিল।[২]

সাধারণ কমিটিকে সার্বিক সাহায্য ও সহযোগীতা করার লক্ষ্যে ও শিক্ষা সম্পর্কিত সমস্যাদির অনুপুযুক্ত বিচার বিশ্লেষণ করে আশু প্রয়োজনীয় সমাধান কল্পে নতুন সদস্য ও উপদেষ্টাদের নিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিটি দিকের উপর একটি মোট ৭টি সাব কমিটি গঠন করা হয়।[৩]

সাব কমিটিসমূহের রিপোর্ট প্রাপ্তির মূল কমিটি সেগুলো ১৯৫০খ্রি. একটি সুপারিশমালা দাখিল করেন।[৪]

ইসলামী শিক্ষা উন্নয়নে মাওলানা মুহাম্মদ আকরাম খাঁ কমিশনের সুপারিশসমূহ Reconstruction Committee ১৯০৭খ্রি. আর্ল কমিটি, ১৯০৯খ্রি. মাদরাসা কমিটি, ১৯১৫খ্রি. হার্লি কমিটি, ১৯২১খ্রি. শামসুল হুদা কমিটি, ১৯৩১খ্রি. মোয়াজ্জেম উদ্দীন কমিটির দীর্ঘ

---

১. পূর্ণাঙ্গ কমিটির সদস্যবৃন্দের নাম ১. মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, (সভাপতি) ২. ড. মোয়াজ্জেম হোসেন, ৩. মৌলভী মো: ইব্রাহীম খান, ৪. মাওলানা জাফর আহম্মদ উসমানী, ৫. মাওলানা রোকন উদ্দীন, ৬. মৌলভী আব্দুল হাকীম বিক্রমপুরী. ৭. খান বাহাদুর আব্দুল হাকীম, ৮. জনাব, এ, এফ, এম, আব্দুল হক, ৯. মৌলভী আলী নূর, ১০. জনাব এস, এম, কিউ, জুলফিকার আলী, ১১. জনাব মো: শামসুল হক, ১২. মিস রাবেয়া খাতুন, ১৩. মৌলভী মো: খ্রি.য়মান চৌধুরী, ১৪. জনাব এল আসাদ, ১৫. বাবু এস, এন, সেন গুপ্ত, ১৬. বাবু রাজ কুমার দাস, ১৭. রেভারেন্ড ব্রাদার জুড।

২. প্রাগুক্ত. পৃ:-২৬৮, ড. আ, ই, ম, নেছার উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮-৯৯

৩. সাব কমিটি যথাক্রমে:-১. খসড়া প্রশ্নমালা প্রণয়ন সাব কমিটি, ২. প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিকশিক্ষা সাব কমিটি, ৩. মাধ্যমিক শিক্ষা সাব কমিটি, ৪. মাদরাসাশিক্ষা সাব কমিটি, ৫. সংখ্যালঘু শিক্ষা সাব কমিটি, ৬. পরীক্ষা সাব কমিটি. ৭. নারী শিক্ষা সাব কমিটি। মাদরাসাশিক্ষা সাব কমিটির সদস্যবৃন্দ হলেন: মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খান, শিক্ষাবিদ-সাংবাদিক, মাওলানা জাফর আহমদ উসামানী, হেড মৌলভী-মাদরাসা-ই-আলীয়া, ঢাকা, ড. এস, এম, হোসাইন এম, এ, ডি, ফিল (অক্সফোর্ড), ভাইস চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ড. মো: সেরাজুল হক, এম, এ, পি, এইচ, ডি (লন্ডন) প্রধান, আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, মাওলানা রোকনুদ্দীন এম, এল, এ;মৌলভী এস, শরফুদ্দীন, এম, এ, বি, এল, অধ্যক্ষ ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ ঢাকা; জনাব এফ, এম, আব্দুল হক; মৌলভী এ, এস, মাহমুদ আহবায়ক এ সাব কমিটিতে উপদেষ্টা হিসাবে নিম্নোক্ত দু'জন দায়িত্ব পালন করেন ১. শামস উল উলামা মাও: আবু নসর মো: ওয়াহিদ, এম, এ, আই, ই, এস (অবসর প্রাপ্ত); ২. খান বাহাদুর মাও: এম জিয়াউল হক, এম, এ, অধ্যক্ষ মাদরাসা-ই-আলীয়া ঢাকা।

৪. আ, ই, ম, নেছার উদ্দীন, প্রাগুক্ত, ৯৮-৯৯

আলোচনা পর্যালোচনার পর ইসলামী শিক্ষার উন্নয়নের জন্য নিম্ন লিখিত সুপারিশসমূহ পেশ করেন। মাওলানা মুহাম্মদ আকরাম খা'র নেতৃতে East Bengal Education system Reconstruction Committee প্রণীত রিপোর্ট ১৯৫১খ্রি. সরকারের খেদমতে পেশ করা হয়। কমিটি মাদরাসা শিক্ষার সংস্কারের পটভূমি আলোচনা করতে গিয়ে ১৯০৭খ্রি. থেকে ১৯৪৭খ্রি. পর্যন্ত মাদরাসা শিক্ষা সম্পর্কিত যত কমিটি/কমিশন গঠিত হয়েছিল সেসব রিপোর্ট পর্যালোচনায় আনেন।

১. মাদরাসা শিক্ষার স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের কোর্সের সময়কাল হবে নিম্নরূপ:

ক) ফাজিল-৪ বছর খ) কামিল-৪ বছর।

২. মাদরাসা শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার মাধ্যম ও পরীক্ষাদানের ভাষা হবে নিম্নরূপ

ক) ফাজিল-উর্দু পূর্ণ কোর্স খ) কামিল-উর্দু পূর্ণ কোর্স।

৩. কামিল স্তরে ৬ টি গ্রুপে/বিষয়ে পাঠদান করা হবে এবং পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে গ্রুপ ভিত্তিক। গ্রুপভুক্ত বিষয়গুলোর যথাযথ পাঠদানের জন্য উপযুক্ত সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। বিষয়গুলো হবে নিম্নরূপ:

ক. হাদীস ও তাফসীর; খ. ফিকহ ও উসূল; গ. আদব (আরবী সাহিত্য); ঘ. ইসলামী দর্শন ও সুফীবাদ; ঙ. তাবলীগ (কম্পারেটিভ রিলিজিয়ন) ও চ. ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি।

৪. কামিল পরীক্ষায় পৃথক ১০০ নম্বরের গবেষণা মূলক দীর্ঘ নিবন্ধ সম্পর্কিত একটি বিষয় থাকবে। যাতে শিক্ষার্থীদের পঠিত বিষয়ে জ্ঞানের গভীরতা ও মূল চিন্তা শক্তির পরিমাপসহ তাদের নিজস্ব প্রকাশ ভঙ্গির যোগ্যতা নিরূপণ করা যায়।

৫. মাদরাসায় আলিম ও ফাজিল পর্যায়ের শিক্ষাক্রমে ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে তিনটি ভোকেশনাল বিষয় যথা ক্যালিওগ্রাফি, কম্পোজিটরশিপ ও সাংবাদিকতা অন্তর্ভূক্ত থাকতে হবে। তবে সমাপনী পরীক্ষায় সেগুলো অন্তর্ভুক্ত হবে না।

৬. মাদরাসায় বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে উৎসাহ দানের জন্য সরকার বিশেষ অনুদানের ব্যবস্থা করবেন। যাতে করে এ শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ নিশ্চিতকরা যায়। উপযুক্ত প্রশিক্ষণার্থীদের বিশেষ বৃত্তি দানের ওপর জোর দেয়া হয়।

মাওলানা আকরাম খানের সভাপতিত্বে পূর্ব বঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠন কমিটির সুপারিশের আলোকেই ১৯৬৫খ্রি. হতে প্রচলিত ও লালিত নিউ স্কীম মাদরাসাগুলো ক্রমান্বয়ে সাধারণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। অতীব দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, কমিটির কিছু কিছু সুপারিশ বাস্তবায়িত হয় তবে এ কমিটির সুপারিশমালার অধিকাংশই বাস্তবায়িত হয়নি। যা এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের জন্য দুর্ভাগ্যই বলতে হবে।[১]

---

১. ইলীয়াস আলী, প্রাগুক্ত, পৃ:-২৮০-২৮২; ড. আ, ই, ম নেছার উদ্দীন, প্রাগুক্ত, প. ৯৯-১০১

পূর্ব বঙ্গ মাদরাসা শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটি রিপোর্ট ১৯৫৬খ্রি.

(আশরাফ উদ্দীন চৌধুরী কমিটি ১৯৫৫)

পূর্ব বাংলার মাদরাসা শিক্ষা সংস্কার সাধনের লক্ষ্যে ২৯ নভেম্বর ১৯৫৫খ্রি. সিদ্ধান্ত মোতাবেক তদানিন্তন সরকার ২০ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করেন। পূর্ববঙ্গ শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটি নামে এ কমিটির সভাপতির নাম অনুসারে এটি আশরাফুদ্দীন চৌধুরী কমিটি নামে খ্যাত।[১]

এ কমিটির প্রথম সভা ১৮ ডিসেম্বর ১৯৫৫ ঈসায়ী ঢাকা শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়, সভাপতি বিস্তারিত আলোচনার পর কাজের সুবিধার্থে মৌলভী সৈয়দ মুয়াজ্জমুদ্দীনকে প্রধান করে ১৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি সাব কমিটি গঠন করেন। কাজের পরিধি বিবেচনা করে পরবর্তীতে আরও ৫ (পাঁচ) জন সদস্যকে কো-অপট করা হয়।[২]

সুপারিশমালা

১. উর্দুকে কামিল স্তরে বাধ্যতা মূলক করা হবে। ফার্সি/ইংরেজীর বিকল্প বিষয়ে সর্বস্তরে থাকবে।

২. মাদরাসা সিলেবাসে সাধারণ বিষয় যেমন, বাংলা, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল সাধারণ বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

৩. কামিল কোর্সে ৪টি গ্রুপ রয়েছে যথা (ক) হাদীস, (খ) তাফসীর, (গ) ফিকহ (ঘ) আরবী সাহিত্য। এ স্তরে আরেকটি গ্রুপ যথাক্রমে (ঙ) তুলনামূলক ধর্ম (Comparative Religion) অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করা হয়।

৪. ফাজিল স্তরে ইংরেজি, বাংলা, গণিত সাধারণ শিক্ষার প্রবেশিকা পরীক্ষার মানের সমতুল্য হবে, যাতে শিক্ষার্থীরা ফাজিল পাশ করার পর প্রয়োজনে সাধারণ শিক্ষার ইন্টারমিডিয়েট কোর্সে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেতে পারে।

৫. মাদরাসা শিক্ষার সিলেবাস এমনভাবে সংস্কার করা উচিত যাতে মাদরাসা শিক্ষার মূল কিতাব থেকে উচ্চ মানের শিক্ষাদানের অভীষ্ট লক্ষ্য অব্যাহত থাকে এবং সাথে সাথে সাধারণ শিক্ষার প্রয়োজনীয় বিষয়াদি কোর্সভুক্ত করা নিশ্চিত হয়। যাতে করে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা শেষে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারে।

৬. মাদরাসার বিভিন্ন শ্রেণি শিক্ষার মাধ্যম হবে নিম্নরূপ-

ক. ফাজিল স্তরে বাংলা অথবা উর্দু ব্যবহৃত হবে।

---

১. Dr. Sekander Ali Ibrahimi, V-3 p-316-317; ড. ইলীয়াস আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩; ড. আ, ই, ম, নেছার উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১

২. ড. আ, ই, ম নেছার উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩; ড. ইলীয়াস আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫

খ. কামিল স্তরে বাংলা অথবা উর্দু ব্যবহৃত হবে।

৭. বর্তমানের ন্যায় ফাজিল ও কামিল পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।[১]

পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সংস্কার কমিশন-১৯৫৭খ্রি.

(আতাউর রহমান খান কমিশন)[২]

১৯৫৭খ্রি. ৩ জানুয়ারি তৎকালীন চীফ মিনিষ্টার বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জনাব আতাউর রহমান খানকে চেয়ারম্যান করে সাত সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটি পেশ করেন।

১. নিউস্কীম মাদরাসা

নিউস্কীম মাদরাসা বা সংস্কার সাধিত মাদরাসা হাই মাদরাসা ও ইসলামিক ইন্টামিডিয়েট কলেজ শিক্ষা ব্যবস্থায় বিশেষ বিশেষ ইসলামিক বিষয় (যথা: আরবী, ফিকহ, ফারায়িজ ও আকাঈদ)সমূহের একটি স্বতন্ত্র বিভাগের ব্যবস্থা রেখে প্রচলিত সাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষার একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ নিউস্কীম মাদরাসা, শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করা হয়।

২. ওল্ডস্কীম মাদরাসা

ক. ১৯৫৫-৫৬খ্রি. 'মাদরাসা এডুকেশন এডভাইজারী কমিটি' ও ১৯৫২খ্রি. 'এডুকেশনাল রিকনষ্ট্রাকশন কমিটি' এর সুপারিশের ভিত্তিতে আরাবী ও উর্দু উভয় বিষয়ই বাধ্যতামূলক পাঠ্য হিসাবে ওল্ডস্কীম মাদরাসায় চালু থাকবে।

খ. ওল্ডস্কীম মাদরাসায় বাধ্যতামূলক বিষয় হিসাবে ইংরেজি বাংলা ও গণিত একাদশ স্তর পর্যন্ত সিলেবাসভুক্ত করা হয়। যাতে উপযুক্ত শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনে পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয় ও টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউটে ভর্তি হতে পারে।

গ. শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা এবং সবার জন্য সুনির্দিষ্ট ও একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় বাধ্যতামূলক থাকবে।[৩]

জাতীয় শিক্ষা কমিশন ১৯৫৯ খ্রি. (এস, এম, শরীফ কমিশন)

১৯৫৮খ্রি. ৩০ ডিসেম্বর (বাইও নং ১৬/০৯/৫৮ খ্রি) পাকিস্তান সরকার জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। জনাব এস, এম, শরীফ পশ্চিম পাকিস্তান সরকারকে চেয়ারম্যান করে ১১ (এগার) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠিত হয়।

১৯৫৯খ্রি. ৫ জানুয়ারি পাকিস্তানের তদানিন্তন প্রেসিডিন্ট ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খান কমিশনের উদ্বোধন করেন। এ অনুষ্ঠানে কমিশনের সদস্যদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা প্রসঙ্গে

---

১. ড. আ. ই. ম. নেছার উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩-১০৪

২. ড. ইলিয়াস আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭

৩. ড. আ. ই. ম. নেছার উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫-১০৬

প্রেসিডিন্ট প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন ও সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন এবং আধ্যাতিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যমানসমূহ আরো সুষ্ঠুভাবে প্রতিফলিত হতে পারে এমন একটি জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য অনুরোধ জানান।

এ কমিশন দীর্ঘদিন কাজ করার পর সরকারের নিকট একটি রিপোর্ট পেশ করেন। এতে মাদরাসার বিলেবাস সম্পর্কে মন্তব্য ও সুপারিশ দাখিল করেন।

১. মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থার শুরু হতেই আরবী শিক্ষা দান করা হয়। আল কুরআন, তাফসীর, হাদীস এবং ফিকহ শিক্ষা দানও এ শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত।

২. ১৯১৫-১৬খ্রি. সাধারাণ বিদ্যালয়ের পাঠ্যসমূহের বিষয়সমূহ মাদরাসায় পাঠ্যভুক্ত করা হয়। এ সংস্কার কর্মসূচি বহু মাদরাসায় অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু অনেকগুলো মাদরাসায় পূর্বের ন্যায় পুরাতন শিক্ষাসূচির অনুসরণ করতে থাকে। ফলে মাদরাসাসমূহ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। যথা ওল্ডস্কীম মাদরাসা ও নিউস্কীম মাদরাসা। নিউস্কীম মাদরাসাগুলো ধাপে ধাপে পূর্ব পাকিস্তানে প্রচলিত সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি হওয়ায় সম্প্রতি সরকার প্রচলিত স্কুলের সাধারণ শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

ওল্ডস্কীম মাদরাসাগুলোর আধুনিক জীবনের চাহিদা অনুযায়ী গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছে। গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, প্রাথমিক বিজ্ঞান, ইংরেজি ও বাংলাকে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।[১]

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭-১০৮

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা

চীন দেশে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে "তুমি যদি স্বল্পতম সময়ে ফল লাভ করতে চাও তাহলে মওসুমী ফসলের চাষ কর; তবে তুমি ফসল পাবে একবার মাত্র, আর যদি দশ বছর ধরে ফল পেতে চাও তাহলে চাষ কর ফলদার বৃক্ষের। আর যদি তুমি শতাব্দীকাল ধরে ফল পেতে চাও তাহলে মানুষের চাষ কর।"[১]

বলা বাহুল্য মানুষের চাষ মানে হলো একটি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন। এ শিক্ষা ব্যবস্থার উপরই কোন জাতির ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রাসাদ বিনির্মিত হয় এবং এ ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সভ্যতাই বিশ্বের দরবারে কোন জাতির মর্যাদা নির্ণয়ের প্রধান সূচক।

১৯৭১খ্রি. ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা এবং ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ফসল স্বরূপ পৃথিবীর মানচিত্রে প্রতিষ্ঠিত হলো বর্তমান বাংলাদেশ। প্রায় সহস্রাধিক বছর যাবৎ এ দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, নৈতিক বিকাশ, সুনাগরিক হিসাবে চরিত্র গঠনে, দেশাত্মবোধের দৃঢ়তায় এবং আধ্যাত্মিক ও ইহ-পারলৌকিক মুক্তির দিশারী হিসাবে ইসলামী শিক্ষা এক অবিস্মরনীয় ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশের একজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদের মতে, "শিক্ষার প্রসঙ্গকে কখনই জাতীয় ও সামাজিক প্রসঙ্গ থেকে এবং বিশেষভাবে পরিবেশের প্রশ্নকেও তেমনি বৃহত্তর প্রশ্নগুলো থেকে বিশেষত শিক্ষার মানের প্রাসংগিক প্রশ্ন থেকে আলাদা করে দেখা যায় না। শিক্ষার মান ও শিক্ষার পরিবেশ বিচ্ছিন্ন প্রসঙ্গত নয়ই; বরং ওতপ্রোতভাবে পরস্পর বিজড়িত। তেমনি শিক্ষা বিষয়ক কোন পরিকল্পনাই জাতীয় পরিকল্পনা থেকে আলাদা নয়। যে কোন চিন্তাশীল ব্যক্তির কাছে এটা একটা সহজ সত্য যে, শিক্ষাঙ্গনে যে অবস্থা চলছে তা সরাসরি জাতীয় জীবনের সর্ব ক্ষেত্রেই তার সুফল ফলবে। শিক্ষাঙ্গনও তার ব্যতিক্রম নয়।[২] প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন, আমাদের দেশে শিক্ষার উন্নয়ন এর লক্ষ্যে কম কমিটি-কমিশন গঠিত হয়নি। পাকিস্তান আমলের শরীফ কমিশন ছাড়াও 'Report of the commision on student problems and welfare' ১৯৬৬ (নূর খান কমিশন) এবং পাকিস্তানের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী জনাব মুহাম্মদ শামস-উল-হক এর The new education policy of the governmet of pakistan (march 1970) এছাড়াও স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন (কুদরত-এ-খুদা কমিশন) মে ১৯৭৪খ্রি.) বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি রিপোর্ট (১৯৭৬-৭৮) ও পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটি রিপোর্ট

---

১ প্রফেসর আবু বকর রফিক আহমদ, একটি আদর্শ ইসলামী শিক্ষার রূপরেখার আলোকে আমাদের মাদরাসাশিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার প্রস্তাবনা, জাতীয় শিক্ষা সেমিনার সংকলন, ১৯৯৭, পৃ. ১০৬

২ আ.ই.ম. নেছার উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭; ১৯৭৯ খ্রি. শিক্ষা সপ্তাহ পালন উপলক্ষে একটি প্রবন্ধ, ড. আব্দুল বারী, (সাবেক ভিসি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়) এ মন্তব্য করেন।

১৯৮৬খ্রি. প্রণীত ও প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৮৭খ্রি. ও ১৯৯৭খ্রি. বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠিত হয় এবং কমিশনগুলো তাদের রিপোর্ট পেশ করেছে। এ ছাড়াও ১৯৭৬খ্রি. জাতীয় শিক্ষা সেমিনার এবং ১৯৭৮খ্রি. জাতীয় শিক্ষা পরিবেশ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ কেন্দ্রে এবং বিভিন্ন বিভাগ, জেলা ও মাহকুমা পর্যায়ে শিক্ষা ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠান ও ব্যাপক আলোচনা এবং মতবিনিময়ের মাধ্যমে অন্তবর্তীকালীন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে (১৯৭৯ঈসায়ী)। উল্লেখিত রিপোর্টগুলোর মধ্যে একটা সাধারণ যোগসূত্র এবং আন্তরিকতা সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষা ক্ষেত্রে আমাদের বিভিন্ন সমস্যার বিশদ আলোচনা এবং এগুলো সমাধানের অনেক বাস্তবসম্মত দিক নির্দেশনা এগুলোতে বিদ্যমান।

ইসলামী শিক্ষার ধারা বাংলাদেশে তিন ধরণের ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে। যেমন-

ক. কওমী মাদরাসা শিক্ষা (অধিভুক্তি প্রক্রিয়াধীন)

খ. আলীয়া মাদরাসা শিক্ষা (ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত)

গ. বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ইসলামী শিক্ষা (সরকারী/ বে-সরকারী) স্নাতক ও স্নাতকোত্তরসহ।

ক. কওমী মাদরাসা শিক্ষার সিলেবাস

কাওমী মাদরাসায় প্রধানত ইসলাম ধর্মীয় শাস্ত্র যেমন কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিকহ, কালাম এবং তৎসঙ্গে মানতিক বা তর্কশাস্ত্র, অলঙ্কার শাস্ত্র, ইসলামী আকাঈদ, ফারায়েজ, ইসলামের ইতিহাস, আরবী সাহিত্য, আরবী ব্যাকরণ, ইলমে নাহু ও সরফ ইত্যাতি পাঠ্যভুক্ত। এছাড়াও উর্দূ ও ফার্সীসহ আধুনিক কালে মাতৃভাষা, গণিত ও ইংরেজীও সকল মাদরাসায় পাঠদান করা হচ্ছে।[১] হি. ১৩৯৯ সালের ১৯৭৮খ্রি. এপ্রিল মাসে বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ নামে কাওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড গঠিত হয়।

কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়কে মারহালাতুল ফাযিলাত (২ বছর মেয়াদী ডিগ্রি স্তর) ও মারহালাতুত তাকমীল (২ বছরমেয়াদী মাষ্টার ডিগ্রি) বলা হয়। গবেষণামূলক শিক্ষা-হাদীস, তাফসীর, ফিকহ, আরবী সাহিত্য, ইসলামের ইতিহাস, ইলমুল কালাম, ইসলামী দর্শন, অর্থনীতি, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, পৌর বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা।[২]

খ. দেশের সকল স্বীকৃতিপ্রাপ্ত মাদরাসা জন্য

ইসলামিক ইউনিভার্সিটি এমন্টমেন্ট এ্যাক্ট ২০০৬ এর ৭-এর ২৫ অ (র) ধারা মোতাবেক গঠিত কারিকুলাম কমিটি এ্যাকাডেমিক অর্ডিন্যান্সের আলোকে ফাযিল স্নাতক পাস/অনার্স ও

---

১ ড. ইলিয়াছ আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০১

২ ড. নেছার উদ্দিন, পৃ. ১৪২, সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও কর্মসূচি, বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ (ঢাকা ১৯৯৭) পৃ. ১৪, ১৫

কামিল স্নাতোকত্তর কোর্সসমূহের বিস্তারিত সিলেবাস প্রণয়ন করে এবং একাডেমিক কমিটির অনুমোদনের জন্য পেশ করে।

ফাযিল বি, এ/বি.এস.এস/বি.বি.এস/বি.এস.সি পাস কোর্সে ১৪০০ মার্কসের জন্য পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণীত হয়। তন্মধ্যে আবশ্যিক বিষয়ে ৮০০ মার্কস এবং ঐচ্ছিক বিষয়ে ৬০০ মার্কস থাকে। কামিল এম.এ হাদীস/ তাফসীর/ফিকহ/আদব বিভাগের প্রথম পার্ট ৫০০ এবং দ্বিতীয় পার্ট ৫০০ মার্কসের জন্য পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণীত হয়।

ফাযিল বি.এস.সি/বি.এ/বি.এস.এস/বি.বি.এস পাস কোর্সের আবশ্যিক বিষয়সমূহ এক ও অভিন্ন হবে। আবশ্যিক বিষয়সমূহ হল-

(১) বাংলা ভাষা

(২) ইংরেজি

(৩) ৩ (তিন) পত্র বিশিষ্ট ২টি আবশ্যিক বিষয়

অ. উলূমুল কুরআন ওয়াল হাদীস

ক. প্রথম পত্র (তাফসীরুল কুরআন)

খ. দ্বিতীয় পত্র (আল-হাদীস)

গ. তৃতীয় পত্র (আল-আকাইদ আল-ইসলামিয়্যাহ)

ই. উলূমুল আরাবিয়াহ ওয়াশ শরীআহ

ক. প্রথম পত্র (কমিউনিকেটিভ আরবী)

খ. দ্বিতীয় পত্র (আল-ফিকহ)

গ. তৃতীয় পত্র (উসূলুল ফিকহ)

ফাযিল বি.এ/বি.এস.এস/বি.এস.সি পাস কোর্সের জন্য নিম্নবর্ণিত ঐচ্ছিক বিষয়সমূহ হতে ৩ (তিন) পত্র বিশিষ্ট যে কোন ২(দুই)টি বিষয় গ্রহণ করতে হবে, যার মার্কস হবে (3x2x 100)=600

ফাযিল বি.এ/বি.এস.এস. পাস কোর্সের ঐচ্ছিক বিষয়সমূহ নিম্নরূপ

ক. বাংলা/ইংরেজী/আরবী প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্র

খ. ইতিহাস/ইসলামের ইতিহাস/ইসলামিক স্টাডিজ/আদ-দাওয়াহ আল-ইসলামিয়্যাহ- প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্র

গ. দর্শন/মনোবিজ্ঞান/ভূগোল/গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান-প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্র

ঘ. অর্থনীতি/ইসলামি অর্থনীতি/ব্যাংকিং/গার্হস্থ্য অর্থনীতি-প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্র

ঙ. সমাজ বিজ্ঞান/সমাজকর্ম/লোক প্রশাসন/রাষ্ট্র বিজ্ঞান-প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্র

ফাযিল বি.বি.এস পাস কোর্সের ঐচ্ছিক বিষয়সমূহ হবে নিম্নরূপ

ক. হিসাব বিজ্ঞান-প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্র

খ. ব্যবস্থাপনা- প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্র

গ. যে কোন ১টি (মার্কেটিং/ইন্সুরেন্স ও ব্যাংকিং/ফিন্যান্স/পরিসংখ্যান/কম্পিউটর বিজ্ঞান) প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্র

ফাযিল বি.এস.সি পাস কোর্সের ঐচ্ছিক বিষয়সমূহ নিম্নরূপ

ক. পদার্থ বিজ্ঞঅন-প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্র

খ. রসায়ন/প্রাণ রসায়ন-প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্র

গ. গণিত-প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্র

ঘ. উদ্ভিদ বিজ্ঞান/প্রাণিবিদ্যা-প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্র

ঙ. পরিসংখ্যান-প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্র

চ. কম্পিউপর সায়েন্স-প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্র

ছ. ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান-প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্র

জ. মনোবিজ্ঞান-প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্র

ঝ. মৃত্তিকা বিজ্ঞান-প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্র

কামিল এম. এ হাদীস/তাফসীর/ফিকহ/আদব শ্রেণির সিলেবাস

ক. (i) কামিল এম. এ. হাদীস প্রথম পার্ট

প্রথম পত্র (*সুনান আবি দাউদ ও মুসতালাহুল হাদীস*)

দ্বিতীয় পত্র (জামি তিরমিযী)

তৃতীয় পত্র (সুনান ইবন মাজাহ ও শরহ মাআনিল আছার)

চতুর্থ পত্র (তারীখুল ইসলাম ও তারীখু ইলমি হাদীস)

(ii) কামিল এম. এ হাদীস দ্বিতীয় পার্ট

প্রথম পত্র-(সহীহ আল-বুখারী প্রথম পার্ট)

দ্বিতীয় পত্র-(সহীহ আল-বুখারী দ্বিতীয় পার্ট)

তৃতীয় পত্র-(সহীহ মুসলিম)

চতুর্থ পত্র-(সুনান নাসাঈ ও উলূমুল হাদীস)

খ.(i) কামিল এম. এ তাফসীর প্রথম পার্ট

প্রথম পত্র-(উলূমুত তাফসীরুল কুরআন)

প্রথম পত্র-(তাফসীর ইবন কাছীর)

তৃতীয় পত্র-(সাফওয়াতুত তাফাসীর)

চতুর্থ পত্র-(আত-তাফসীর ওয়াল মুফাস্সীরুন)

(ii) কামিল এম. এ তাফসীর দ্বিতীয় পার্ট

প্রথম পত্র-(তাফসীর আল-কাশ্শাফ)

প্রথম পত্র-(তাফসীর আল বায়দাবী)

তৃতীয় পত্র-(তারীখুত তাফসীর)

চতুর্থ পত্র-(আসবাবু নুযূলিল কুরআন)

গ. (i) কামিল এম.এ ফিকহ প্রথম পার্ট

(ii) কামিল এম.এ ফিকহ দ্বিতীয় পার্ট

প্রথম পত্র-(আল-ফিকহ আলা-ইসলামী প্রথম পার্ট)	প্রথম পত্র-(আল-ফিকহ আল-ইসলামী দ্বিতীয় পার্ট)
প্রথম পত্র-(উসূলুল ফিকহ প্রথম পার্ট)	প্রথম পত্র-(উসূলুল ফিকহ দ্বিতীয় পার্ট)
তৃতীয় পত্র-(তারীখু ইলমিল ফিকহ)	তৃতীয় পত্র-(তাবাকাতুল ফুকাহা)
চতুর্থ পত্র-(আল-কাওয়াইদুল ফিকহিয়্যাহ)	চতুর্থ পত্র-(ফিকহুল ইকতিসাদ)
	(ii) কামিল এম. এ আদব দ্বিতীয় পার্ট
ঘ. (i) কামিল এম. এ আদব প্রথম পার্ট	প্রথম পত্র-(আল-আনছারুল হাদীস আল-আরবী)
প্রথম পত্র-(আল-আনসারুল কাদীম আল-আরবী)	
প্রথম পত্র-(আন-নাযমুল কাদীম আল-আরবী)	প্রথম পত্র-(আন-নাযমুল হাদীস আল-আরবী)
তৃতীয় পত্র-(তারীখুল আদাবিল আরাবী)	তৃতীয় পত্র-(আন নকদুল আরবী ওয়া ফিকহুল লুগাহ)
চতুর্থ পত্র-(আল-বালাগাত আল উরূজ ওয়াল কাফিয়া)	চতুর্থ পত্র-(তারীখুল আদাবিল আরাবী আল-হাদীস)

কওমি মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড (বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ) এর পাঠ্য তালিকা

মারহালাতুল ফযীলত (স্নাতক ডিগ্রি)

২বছরঃ প্রথম বর্ষ (ত্রয়োদশ শ্রেণি)

১. তাফসীর: তাফসীরু জালালায়ন প্রথম খণ্ড
২. তাফসীর: তাফসীরু জালালায়ন দ্বিতীয় খণ্ড
৩. ফিকহ (আইন ও নীতিশাস্ত্র): আল-হিদায়া তৃতীয় খণ্ড
৪. উছূলুল ফিকহ: মুসাল্লামুস সুবূত
৫. উছূলুত তাফসীর: আল ফাওযুল কাবীর
৬. আরবী সাহিত্য (প্রাচীন ও আধুনিক আরবী): দিওয়ানে হামাসাহ, সাবউল মুয়াল্লাকাহ্, মুয়াল্লাকাহ হিকমত (দর্শন), হিদায়াতুল হিকমাত, মাইবুযী, হুজ্জাতুল ইসলাম।
৭. ইলমুল কালাম: ইলমুল কালাম
৮. অর্থনীতি: ইসলামের অর্থনীতি-প্রথম ভাগ

মারহালাতুল ফযীলত (স্নাতক ডিগ্রি)

দ্বিতীয় বর্ষ (চতুর্দশ শ্রেণি)

১. হাদীস: মিশকাত শরীফ-প্রথম অর্ধেক
২. হাদীস: মিশকাত শরীফ-দ্বিতীয় অর্ধেক

৩. তাফসীর: তাফসীরু বায়জাভী শরীফ প্রথম পারা

৪. ফিকহ (আইন ও নীতিশাস্ত্র): আল-হিদায়া-তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড

৫. ইলমুল কালাম: শরহু আকাইদিন নাসাফী ও ফেরাকে বাতেলা

৬. উছূলুত তাফসীর: আল ইতকান

৭. ইতিহাস: তাহরীকে দেওবন্দ

৮. অর্থনীতি

৯. উছূলুল হাদীস: শারহু নুখবাতিল ফিকার

মারহালাতুত তাকমীল (স্নাতকোত্তর ডিগ্রি)

১ বছর: দাওরায়ে হাদীস

১. হাদীস-সহীহুল বুখারী প্রথম অর্ধেক

২. হাদীস-সহীহুল বুখারী দ্বিতীয় অর্ধেক

৩. হাদীস-সহীহ মুসলিম প্রথম অর্ধেক

৪. হাদীস-সহীহ মুসলিম দ্বিতীয় অর্ধেক

৫. হাদীস-জামেউত তিরমিযী প্রথম অর্ধেক

৬. হাদীস-জামেউত তিরমিযী দ্বিতীয় অর্ধেক

৭. হাদীস-সুনানু আবী দাউদ পূর্ণ

৮. হাদীস-ইবনি মাজাহ পূর্ণ

৯. হাদীস-নাসাঈ পূর্ণ

১০. হাদীস-শরহু মায়ানিল আসার পূর্ণ

১১. হাদীস-মুআত্তা ইমাম মালিক পূর্ণ

১২. হাদীস-মুআত্তা ইমাম মুহাম্মদ পূর্ণ

ইলমুত তাজভীদ ওয়াল ক্বিরাআত-এর উচ্চ শিক্ষার নেছাব

২ বছর: প্রথম বর্ষ

১. মশক-সূরা ক্বাফ থেকে সূরা নাস পর্যন্ত

২. তাজভীদ-জামালুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে মাককিয়াহ

৩. হিফজ-আম্মাপারা

৪. নাযেরা-প্রথম পাঁচ পারা

দ্বিতীয় বর্ষ

১. মশক-২৯ নং পারা বিশেষ পদ্ধতিতে

২. তাজভীদ-জামালুল কুরআন

৩. হিফজ-২৯ নং পারা

৪. নাযেরা-ষষ্ঠ পারা হতে পূর্ণ কুরআন শরীফ। উল্লেখ্য যে, ক্বিরাআতের ঘণ্টা হবে ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিটের।[১]

১ বেফাকুল মাদারিস থেকে সরবরাহকৃত সিলেবাস।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়-এর ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সিলেবাস

Dhaka University

(বিএ অনার্স)

(Semester and Letter Grade System)

No.	Year	Semester	Course No	Course Title	Credit Hours
01.	1st Year	1st Semester	BIS 101	Introduction to Islam and Islamic Dawah	04
02.			BIS 102	Introductory Knowledge of the Quran, Principles and History of Tafsir Literature	04
03.			BIS 103	Al-Sirat al Nabawiyyah and History of the Caliphs	04
04		2nd Semester	BIS 104	Bengali	04
05.			BIS 105	Economy, Finance, Banking and Insurance in Islam	04
06.			BIS 106	English	04

No.	Year	Semester	Course No	Course Title	Credit Hours
07.	2nd Year	3rd Semester	BIS 201	Quranic Studies	04
08.			BIS 202	Social System, Family Welfare and Aesthetics in Islam	04
09.			BIS 203	Sociology and Anthropology	04
10.		4th Semester	BIS 204	Sunnah in Practical Life	04
11.			BIS 205	Political Science	04
12.			BIS 206	Political System and Human Rights in Islam	04

No.	Year	Semester	Course No	Course Title	Credit Hours
13.	3rd Year	5th Semester	BIS 301	Study of Al-Tafsir	04
14.			BIS 302	Study of Al-Kalam and Muslim Philosophy	04
15.			BIS 303	Sufism and Some Prominent Sufis	04

16.			BIS 304	Introduction to Islamic Law, Personal Law and Law of Inheritance in Islam	04
17.		6th Semester	BIS 305	International Relations in Islam, Islam and Contemporary Issues	04
18.			BIS 306	Computer Literacy	04
19.			BIS 307 (a) or	Arabic Literature, Grammar, Translatin and Composition	04
20.			BIS 307 (b)	Islamic Civilization and Culture, Ethics and Values in Islam	04
21.			BIS 308	Modern History of the Sulim World and Organizations	04
22.	4th Year	7th Semester	BIS 401	Study of Hadith	04
23.			BIS 402	Principles of Economics and the Economy of Bangladesh	04
24.			BIS 403	History of Muslim Spain and Muslim Contribution of Science and Technology	04
25.			BIS 404	Bangladesh Studies	04
26.		8th Semester	BIS 405	Principle sand History of Hadith Literature	04
27.			BIS 406	Study of Religions	04
28.			BIS 407	Principles and History of Islamic Jurisprudence	04
29.			BIS 407	history of Islam	04
30.			BIS 408 (a) or BIS 408 (b)	Lies and Thoughts of Muslim Thinkers of the World	04

M.A. Group-A

No.	Semester	Course No.	Course Title		Credit Hours
01.	1st Semester	MIS 501	Part-A	Tafsir Al-Baidawi: Surah Al-Fathia and Surah Al-baqara, 1-5 Ruku (from Verse 1 to 46	04
			Part-B	Tafsir Al-Baidawi: Surah-al-Baqara, 16 Ruku (from verse 47 to 141)	

02.		MIS 502	Study of al-hadith (al-jami al-Sahih li-al-Bukhari and Sahia Muslim)		04
			Part-1	Al-Jami al-Sahih li-al-Bukhari: Bab-al-Wahi, Kitab al-Magazi and Kitab al-Riqaq	
			Part-B	Sahih Muslim: kitab al-Iman, Kitab-al-ImrImarat and Kitab al-Zuhad	
03.		MIS 503	Jtudy of al-Hadith (jami al-Tirmidhi and Sunna-al-Nasayi)		04
			Part-A	Jami al-Timidhi: Abwab al-Taharat, Abwab al-'Ilm and Abwab al-Manaqib	
			Part-A	Sunan Al-Nasayi: Kitab al-Salat, Kitab Manasik al-Hajj nad Kitab Adab al-Qada	
04		MIS 504 or	Ulum al-Quran		04
			Part-A	Al-Itqan: Chapters-1, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 35, 42, & 43	
			Part-B	Al-Itqan: Chapters- 47, 64, 65, 66, 67, 69m 72, 77, 78, 79 & 80	
05		MiS 505	Teaching and Research Methodology		04
			Part-A	Teaching Methodology	
			Part-B	Research Methodology	
06.		MIS 506	Study of al-Tafsir (Tafsir Ibn Kathir)		04
			Part-A	Tafsir Inb Kathir: Surah al-Nisa, 1-10 Ruku (from verse 1 to 76)	
			Part-B	Tafsir Ibn Kathir: Surah al-Ma-ieda, 1-10 Ruku (from verse 1 to 77)	
07		MiS 507	Study of al-Hadith (sunan Abu Daud And Ali Tahawi)		04
			Part-A	Sunan Abu Daud: Kitab al-Sawm and Kitab al-akat	
			Part-B	Al-Tahawi: Kitab al-Buya, Kitab al Hibawa al-Sadaqat and Kitab al-Ziyadat	
08		MIS 508	Study of al-Hadith (Al-Muatta and Sunan Ibn		04

			(Majah)		
			Part-A	Al-Muatta: Kitab al-Nuzurwal Aiman, Kitab al-Nikah, Kitab al-Talq, Kitab Al-Shufa and kitab al-Jami	
			Part-B	Sunan Ibn Majah: Kitab al-Luqta, Kitab al-Hudud, Kitab al-Diyat and kitab al-Fitan	
09		MIS 509 or	Da'wah in the Quran and Sunnah and Dawah in Modern Wordl		04
			Part-A	Da'wah in the Quran and Sunnah	
			Part-B	Da'wah in Modern World	
10.		MIS 510	Evolution and Philosophy of Religion and Comparative religion		04
			Part-A	Evolution and Philosophy of Religion	
			Part-B	Comparative Religion (Islam, Buddhism, Christianity, Hindisum, Judaism and Zoroastrianism)	

M.A. Group-B

No.	Semester	Course No.	Course Title		Credit Hours
01.	1st Semester	MIS 501	Study of Al-Tafsir al-Baidawi and Tafsir Ibn Kathir)		04
			Part-A	Tafsir Al-Baidawi: Surah al-Fatiha and Surah al-Baqara,, 1-5 Ruyku (from verse 1 to 46)	
			Part-B	Tafsir Ibn Kathir: Surah al-Nisa, 1-10 Ruku (Verse 1-76)	
02.		MIS 502	Study of al-Fiqh (Al-Hidaya)		04
			Part-A	Al-Hidaya: Kitab al-Taharat, Kitab al-Salat and Kitab al-Sawm	
			Part-B	Al-Hidaya: Kitab al-Hajj, Kitab al-Buyu and Kitab al-Wasiyat	
03.		MIS 503	Communication, Planning and Development in Islam		04
			Part-A	Communication in Islam	
			Part-B	Planning and Development in	

				Islam	
04		MIS 504 or	Teaching and Research Methodology		04
			Part-A	Teaching Methodology	
			Part-B	Research Methodology	
05.		MIS 505	Psychology and Public Administration in Islam		04
			Part-A	Psychology in Islam	
			Part-B	Pubic Administration in Islam	
06.		MIS 506	Study of al-Hadih (Al-Jami al-Sahih li-al-Bukhari and Sahih Muslim)		04
			Part-A	Al-Jami al=Sahih li-al-Bakhari: Bab-al-Wahi, Kitab al-Magazi and Kitab al-Riqaq	
			Part-B	Sahih Muslim: Kitab al-Iman, Kitab al-Imrant and Kitab al-Zuhad	
07	2nd Semester	MIS 507	Evaluation and Philosophy of Religion and Comparative Religion		04
			Part-A	Evolution and Philosophy of religion	
			Part-B	Comparative Religion (Islam, Buddhism, Christianity, Hinduism, Judaism and Zoroastrianism)	
08.		MIS 508	History of Sufish in Bangladesh and Some Prominent Sufis (1201 – up to the Date)		04
			Part-A	History of Sufism in Bangladesh and Some Prominent Sufis (1201-1800)	
			Part-B	Some Prominent Sufis of Bangladesh (1801- up to the date)	
09.		MIS 509 or	Trade, Commerce and Business Studies in Islam		04
			Part-A	Trade and Commerce in Islam	
			Part-B	Business Studies in Islam	
10.		MIS 510	Scientific Indications in the Holy Quran and Hadith		04
			Part-A	Scientific Indications in the Holy Quran and Hadith	

			Part-B	Scientific Indications in the Holy Quran and Hadith	

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

(বিএ অনার্স)

প্রথম বর্ষ

১০১– আল কুরআনুল কারীম: (সূরা আম্বিয়া, সূরা কাসাস, সূরা সফ্, সূরা ফাতহ্, সূরা হুজরাত) ১০২– আল হাদীস (নাসাঈ: কিতাবুত তাহারাত, কিতাবুল মানাসিক) ১০৩–সীরাতুন্নবী (সাঃ) ১০৪ – মুসলিম পারিবারিক আইন ও উত্তরাধিকার আইন ১০৫ – ইসলামী আদর্শবাদ ১০৬ – মুসলিম দর্শন ও দার্শনিক মতবাদ ১০৭–আরবী ভাষা ও সাহিত্য ১০৮ – ইংরেজী ভাষা সাহিত্য।

দ্বিতীয় বর্ষ

২০১–তাফসীর (জালালায়ন: সূরা আল আনফাল, সূরা আর রুম, সূরা ইয়াসীন, সূরা আর রাহমান, সূরা আল-ওয়াকিয়াহ) ২০২–আহকামূল কুরআন: সূরা আন্ নূর ২০৩–হাদীস: (ইব্ন মাজাহ: কিতাবুস সুন্নাহ, কিতাবুল আতইমা ও কিতাবুল লিবাস) ২০৪– আল্ ফিকহ ২০৫–উসূলে হাদীস ২০৬–তারীখুত তাফসীর ও তারীখুল ফিকহ ২০৭–ইসলামের ইতিহাস ২০৮–কম্পিউটার শিক্ষা ২০৯–ইসলামী অর্থনীতি।

তৃতীয় বর্ষ

৩০১–তাফসীরে কাশ্শাফ: সূরা আলে ইমরান ৩০২–আল হাদীস (জামি'উত তিরমিযী: আবওয়াবুস সালাত) ৩০৩–উলূমূল ফিকহ ৩০৪–উলূমুল কালাম ৩০৫–আসমাউর রিজাল ৩০৬–ধর্মের ইতিহাস ৩০৭–ইসলামী ব্যাংক ও বীমা ব্যবস্থা ৩০৮–আধুনিক মুসলিম বিশ্বও সংস্থা ৩০৯–সমকালীন চিন্তা ও ইসলাম।

চতুর্থ বর্ষ

৪০১– তাফসীরে ইবন কাসীর: (সূরা আন নিসা)৪০২–আল-হাদীস (সহীহুল বুখারী: কিতাবুল ইলম, কিতাবুল বদউল খালক, কিতাবুল আকীদা, কিতাবুল যাবাহিহ, কিতাবুল আযাহী) ৪০৩–আল হাদীস (মুসলিম: কিতাবুল আকযিয়াহ, কিতাবুল ইসরাত, ও ফাযাইলুস সাহাবা) ৪০৪–আল হাদীস (আবু দাউদ: কিতাবুস সওম, কিতাবুল জিহাদ, ও কিতাবুল আদব) ৪০৫–আল ফিকহ (হেদায়া) ৪০৬–উলুমূল কুরআন ৪০৭– ইসলামে রাষ্ট্রনীতির মূলনীতি ৪০৮–বিজ্ঞানে মুসলিমদের অবদান ৪০৯–ইসলামী দাওয়াহ ৪১০–বাংলাদেশ স্টাডিজ।

এম এ (গ্রুপ –এ)

৫০১–আল হাদীস (বুখারী শরীফ: বাদউল ওহী, কিতাবুল মাগাযী, ও কিতাবুর রিকাক) ৫০২–আল হাদীস (মুসলিম শরীফ: কিতাবুল ঈমান, কিতাবুল হজ্জ, ও কিতাবুর রিকাক) ৫০৩–ফিকহুল হাদীস (শরহে মাআনীউল আছার: কিতাবুল বুয়ুউ, কিতাবুল হিবা ওয়াস সাদাকাহ, ও কিতাবুয যিয়াদাহ) ৫০৪–তাফসীরুল কুরআনঃ (আহকামুল কুরআন লিকুরতুবী: সূরা আন নিসা ও সূরা আল মায়িদাহ) ৫০৫–তারীখুল হাদীস ৫০৬–ইসলামে রাষ্ট্রনীতি ৫০৭–ধর্মতত্ত্ব ও তুলানমূলক ধর্ম ৫০৮–গবেষণা পদ্ধতি।

এম এ (গ্রুপ বি)

১–তাফসীরুল কুরআনিল কারীম (বায়যাভী: সূরা আল ফাতিহা ও সূরা আল বাকারা) ২–আল হাদীস (বুখারী শরীফ: কিতাবুত তাফসীর, তিরমিযী শরীফ, আবওয়াবুত তাফসীর) ৩– ইজাজুল কুরআন ৪–ইসলামে অপরাধী আইন ৫– আল কুরআনে বৈজ্ঞানিক নিদর্শন ৬– ইসলামে ব্যবসা ও বাণিজ্য ৭–তাফসীর এবং প্রখ্যাত মুফাসসিরদের তাফসীর পদ্ধতি ৮–গবেষণা পদ্ধতি।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (বিএ অনার্স)

প্রথম বর্ষ

১০১–আল কুরআনুল কারীম ১০২–আল-হাদীস ১০৩–আদ দাওয়াহ আল ইসলামিয়্যাহ ১০৪– ইসলামের ইতিহাস ১০৫–ব্যবহারিক আরবী ১০৬–বাংলাদেশ স্টাডিজ।

দ্বিতীয় বর্ষ

২০১–আত তাফসীর (কাশশাফ: সূরা আল ফাতিহা, সূরা আলে ইমরান) ও অসূলুত তাফসীর ২০২-আল হাদীস ২০৩-আল ফিকহ ও আল-ফারাইয ২০৪–আরবী গদ্য ২০৫–মুসলিম দর্শন ও দার্শনিক ২০৬-ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের ইতিহাস।

তৃতীয় বর্ষ

৩০১–আত তাফসীর ও অসূলুত তাফসীর ৩০২-আল হাদীস (আবু দাউদ; কিতাবুল মানাসিক, কিতাবুস সিয়াম, কিতাবুত তালাক, কিতাবুস সুন্নাহ) ৩০৩–আল ফিকহ (কিতাবুল বুয়ুউ, কিতাবুশ শুফা, কিতাবুল ওয়াকফ্) ও উসূলূল ফিকহ ৩০৪–উলূমূল কুরআনুল ও উলূমূল হাদীস ৩০৫–বালাগাত ও ইযাজুল কুরআন ৩০৬ – আল কালাম ৩০৭ –সিরাতুন্ নববী ৩০৮–ধর্মের ইতিহাস।

চতুর্থ বর্ষ

৪০১–তাফসীর; (বায়যাভী: সূরাআন নিসা, রাওয়ায়েউল বয়ান, সূরা আন নূর, সূরা আল আহযাব) ৪০২-হাদীস; (বুখারী: বাদলূল ওহী, কিতাবুল ইলম); (মুসলিম: মোকাদ্দামা কিতাবুল ঈমান) ৪০৩–ফিকহ (কিতাবুল অসায়া, কিতাবুল হজ্জ, কিতাবুল হুদুদ)ও তারিখে ইলমিল ফিকহ ৪০৪– তাসাউফ ৪০৫–ইসলামী আদর্শবাদ ৪০৬–ইসলামী অর্থনীতি ৪০৭–গবেষণা পদ্ধতি ৪০৮–সমকালীন মুসলিম বিশ্ব।

৫০১–তাফসীর-১; (বায়যাভী: সূরা বাক্বারা) ৫০২–তাফসীর-২; (ফী-যিলালিল কুরআন: মোকাদ্দামা ও সূরা ইসরা) ৫০৩–হাদীস-১; (বুখারী শরীফ: কিতাবুল মাগাযী, কিতাবুল মানতিক ও কিতাবুত তাফসীর) ৫০৪–হাদীস-২; (মুসলিম শরীফ: কিতাবুল হুদুদ, কিতাবুল আকীদাহ, কিতাবুল লিবাস ওয়ায ্যিনা) ৫০৫–হাদীস-৩; (নাসাঈ: কিতাবুত তাহারাত, কিতাবুন নিকাহ, কিতাবু ইসরাতিন নিসা) ৫০৬–হাদীস-৪; (তাহাভী: কিতাবুত তালাক ও কিতবুল বুয়ুউ) ৫০৭– তুলনামূলক ফিকহ ৫০৮– ইসলামী সভ্যতার ইতিহাস ৫০৯ – সমকালীন মতবাদ ও ইসলাম ৫১০–শিক্ষা ও বিজ্ঞান মুসলমানদের অবদান।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়-এর থিওলজী এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদের সিলেবাস

আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

বিটিআইএস অনার্স

প্রথম বর্ষ

প্রথম সেমিস্টার: ১১১. উলূমুল কুরআন **১১২**. তাজভীদ ও হিফজুল কুরআন **১১৩**. কথোপকথনের মাধ্যমে ব্যবহারিক সরফ **১১৪**. ব্যবহারিক নাহু ও আরবী লিখন।

দ্বিতীয় সেমিস্টার: ১২১. ইংরেজী ভাষা **১২২**. ভারতীয় উপমহাদেশে কুরআনের তরজমা ও তাফসীর **১২৩**. বাংলা ভাষা **১২৪**. অর্থনীতি **১২৫**. লোক প্রশাসন **১২৬**. বাংলাদেশ স্টাডিজ/ ইসলামিক স্টাডিজ।

দ্বিতীয় বর্ষ

প্রথম সেমিস্টার: ২১১. সনদ বিহীন তাফসীর **২১২**. উলূমুল কুরআন **২১৩**. উলূমূল হাদীস **২১৪**. সীরাতুন্নবী **২১৫**. ইংরেজী ভাষা।

দ্বিতীয় সেমিস্টার: ২২১. সনদবিশিষ্ট তাফসীর **২২২**. আরবী সাহিত্য **২২৩**. ইসলামী দর্শন **২২৪**. ইসলামের ইতিহাস **২২৫**. কম্পিউটার শিক্ষা।

তৃতীয় বর্ষ

প্রথম সেমিস্টার: ৩১১. উলূমুল কুরআন **৩১২**. প্রাচীন তাফসীর **৩১৩**. আহকামুল কুরআন **৩১৪**. হাদীস শরীফ **৩১৫**.আল কুরআনে কিস্সাসমূহ

দ্বিতীয় সেমিস্টার: ৩২১. সমকালীন তাফসীর **৩২২**. তুলনামূলক ফিকহ ও অসূলুল ফিকহ **৩২৩**. ইসলামী দলসমূহ ও তাদের আকীদা **৩২৪**. ইসলামী সংস্কৃতি ও সভ্যতা **৩২৫**. ইসলাম ও আল-কুরআন সম্পর্কে আনিত অভিযোগ ও এর অপনোদন।

চতুর্থ বর্ষ

প্রথম সেমিস্টারঃ ৪১১. তুলনামূলক তাফসীর ৪১২. তুলনামূলক ধর্ম ৪১৩. তাফসীর ও মুফাসসির ৪১৪. আল-কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান ৪১৫. গবেষণা পদ্ধতি।

দ্বিতীয় সেমিস্টারঃ ৪২১. বিষয়ভিত্তিক তাফসীর ৪২২. ই'জাযুল কুরআন ও বালাগাত ৪২৩. ফিকহুল কুরআন ৪২৪. তাফসীরে ইসরাঈলী বর্ণনা ৪২৫. আল কুরআনে নবীদের চরিত ও তাদের দাওয়াত পদ্ধতি ৪২৬. সমকালীন ইসলামী বিশ্ব ও বাংলাদেশে ইসলাম।

এমটিআইএস

প্রথম সেমিস্টার

৫১১. বর্ণনাভিত্তিক তাফসীর ৫১২. বুদ্ধিবৃত্তিক তাফসীর ৫১৩. হাদীস শরীফ ৫১৪. উলূমুল কুরআন ৫১৫. সমকালীন বিভিন্ন মতবাদ ৫১৬. ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলাম প্রচার

দ্বিতীয় সেমিস্টার

৫২১. প্রাচীন তাফসীর ৫২২.আধুনিক তাফসীর ৫২৩.আল কুরআনে বিজ্ঞান ৫২৪.তুলনামূলক তাফসীর

৫২৫.আধুনিক বিজ্ঞান ও সমকালীন সমস্যা সমাধানে আল কুরআনের ভূমিকা ৫২৬.আধুনিক ইসলামী বিশ্ব।

দ্বিতীয় সেমিস্টারঃ (গবেষণা গ্রুপ)

৫২১. প্রাচীন তাফসীর ৫২২.আধুনিক তাফসীর ৫২৩.আল কুরআনে বিজ্ঞান ৫২৪. তুলনামূলক তাফসীর ৫২৫. আধুনিক বিজ্ঞান ও সমকালীন সমস্যা সমাধানে আল কুরআনের ভূমিকা ৫২৬. গবেষণা।

দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

বিটিআইএস অনার্স

প্রথম বর্ষ

প্রথম সেমিস্টারঃ ১১১. ইসলামী দাওয়াহ ১১২. আরবী ভাষায় পারদর্শিতা-১ ১১৩. আরবী ব্যাকরণ ১১৪. ইংরেজী গ্রামার।

দ্বিতীয় সেমিস্টারঃ ১২১. আলকুরআনে দাওয়াহ ১২২. আল হাদীসে দাওয়াহ ১২৩. ইসলামী শরীয়ার বিধিবিধান ১২৪. আরবী ভাষায় পারদর্শিতা-২ ১২৫. ব্যবহারিক ইংরেজী ১২৬. বাংলাদেশ স্টাডিজ।

দ্বিতীয় বর্ষ

প্রথম সেমিস্টারঃ ২১১. উলূমুল কুরআন ও তাজবীদ ২১২. ইসলামী আকীদা ২১৩. সীরাতুন্নবী ২১৪. লোক প্রশাসন ২১৫. অর্থনীতি।

দ্বিতীয় সেমিস্টার ঃ ২২১. ইলমু মুস্তালাহুল হাদীস ২২২. ইসলামী দাওয়াহর মূলনীতি ২২৩. ইসলামের ইতিহাস ২২৪. বাংলাদেশের লোক প্রশাসন ২২৫. কম্পিউটার শিক্ষা

তৃতীয় বর্ষ

প্রথম সেমিস্টারঃ ৩১১. ইলমুল কালাম ৩১২. ইসলামী ফিকহ ও এর মূলনীতি ৩১৩. নবী রসূলদের দাওয়াহর ৩১৪. সাহাবাদের যুগে দাওয়াহর ৩১৫. ইসলামী অর্থনীতি।

দ্বিতীয় সেমিস্টার ঃ ৩২১. ইসলামী দাওয়াহর পদ্ধতি ৩২২. আধুনিক যুগে দাওয়াহ ও দাঈগণ ৩২৩. ইসলামে মানবাধিকার ৩২৪. সমকালীন চিন্তাধারা ৩২৫. ইসলামে মানব সম্পদ।

চতুর্থ বর্ষঃ

প্রথম সেমিস্টারঃ ৪১১. দাওয়াহ ও সমাজ সেবা পদ্ধতি ৪১২. তাফসীরুল কুরআন ৪১৩. তুলনামূলক ধর্ম-১ ৪১৪. বর্তমান ইসলামী বিশ্ব ৪১৫. দাঈর গুণাবলী।

দ্বিতীয় সেমিস্টার ঃ ৪২১. সমকালীন ইসলামী বিশ্বের সমস্যাবলী ৪২২. তুলনামূলক ধর্ম-২ ৪২৩. পাশ্চাত্য ও খ্রীষ্টবাদ ৪২৪. গবেষণা পদ্ধতি ৪২৫.বক্তৃতা ও পত্রের মাধ্যমে দাওয়াহ ৪২৬.ইসলামী ব্যাংক ও ইসলামী বীমা।

এমটিআইএস

প্রথম সেমিস্টারঃ ৫১১. দাওয়াহর কুরআনী শিক্ষা ৫১২.সন্দেহ অপনোদনে ইসলামী দাওয়াহ ৫১৩. বাংলাদেশে ইসলামী দাওয়াহ ৫১৪. ইসলামে রাজনীতি ও প্রশাসন ব্যবস্থা ৫১৫.সুন্নাহ ও যুগেযুগে এর চ্যালেঞ্জসমূহ ৫১৬. শরীয়াহর উদ্দেশ্যাবলী বাইসলামী সংস্কৃতি।

দ্বিতীয় সেমিস্টারঃ ৫২১. মিডিয়াসমূহ ৫২২. বিদআত ও এর ক্ষতির দিকসমূহ৫২৩. ইসলাম ও ধর্ম শিক্ষা বা ইসলামী জাগরণ ও এর চ্যালেঞ্জসমূহ ৫২৪. ইসলামী সভ্যতা বা তুলনামূলক ফিকহ ৫২৫. বর্তমান বিশ্বে ইসলামী দাওয়াহর আন্দোলন, সংগঠনসমূহ ৫২৬. শরীয়াহর উদ্দেশ্যাবলী বাইসলামী সংস্কৃতি

দ্বিতীয় সেমিস্টার (গবেষণা গ্রুপ)**: ৫২১.** দাওয়াহ ও মুসলিম সমাজের সমস্যা নিরসনে বৈজ্ঞানিক গবেষণার নিয়মবলী ৫২২. ইসলামী দর্শন ৫২৩. জ্ঞান ও শিআয় ইসলামীকরণ ৫২৪. ইসলামী জাগরণ ও চ্যালেঞ্জসমূহ ৫২৫. তুলনামূলক ফিকহ ৫২৬. গবেষণা পদ্ধতি।

আল-হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

বিটিআইএস অনার্স

প্রথম বর্ষ

প্রথম সেমিস্টারঃ ১১১. মুস্তালাহুল হাদীস **১১২.** আরবী ব্যাকরণ-নাহু **১১৩.** সীরাতুন্নবী **১১৪.** রাজনীতি বিজ্ঞান **১১৫.** বাংলাদেশ স্টাডিজ।

দ্বিতীয় সেমিস্টার ঃ ১২১. উলূমুল কুরআন **১২২.** উলূমুল হাদীস **১২৩.** আরবী ব্যাকরণ-সরফ **১২৪.** লোক প্রশাসন **১২৫.** ইংরেজী ভাষা।

দ্বিতীয় বর্ষ

প্রথম সেমিস্টারঃ ২১১. তাফসীরুল কুরআন **২১২.** সুনানুন নাসাঈ **২১৩.** অসূলুল ফিকহ **২১৪.** আরবী ব্যাকরণ-নাহু **২১৫.** ইসলামের ভূমিকা।

দ্বিতীয় সেমিস্টারঃ ২২১. জামিউত তিরমিযী ২২২. উলূমুল হাদীস ২২৩. তুলনামূলক ফিকহ ২২৪. ইসলামের ইতিহাস ২২৫. সমাজ ও পরিবেশ বিজ্ঞান।

তৃতীয় বর্ষ

প্রথম সেমিস্টারঃ ৩১১. বুখারী শরীফ-১ **৩১২.** মুসলিম শরীফ-১ **৩১৩.** সুনানু ইবন মাজাহ ও আল-মুস্তাদরাক **৩১৪.** হাদীস শাস্ত্রের ইতিহাস **৩১৫.** ইসলামী আদর্শবাদ।

দ্বিতীয় সেমিস্টারঃ ৩২১. বুখারী শরীফ-২ ৩২২. মুসলিম শরীফ-২ ৩২৩. ভারতীয় উপমহাদেশে ইলমে হাদীস ৩২৪. মানাহিজুল মুহাদদিসীন ৩২৫. হাদীস (ইংরেজি অনুবাদ)

চতুর্থ বর্ষ

প্রথম সেমিস্টারঃ ৪১১. শরহু মাআনীউর আছার ও শরহু মুশকিলূল আছার ৪১২. মুওয়াত্তা ইমাম মালিক ও সুনানুদ দারিমী ৪১৩. সহীহ ইবন খুযাইমা ও সহীহ ইবন হিব্বান ৪১৪. অসূলুত তাখরীজ ও দিরাসাতুল আসানীদ ৪১৫. সমকালীন ইসলামী বিশ্ব।

দ্বিতীয় সেমিস্টারঃ ৪২১. মসনদ আবী হানীফা, মসনদ শাফিঈ ও মসনদ আহমদ ৪২২. জাল হাদীস ৪২৩. কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে আকীদা ৪২৪. সুনানু আবী দাউদ ৪২৫. গবেষণা পদ্ধতি ৪২৬. অর্থনীতি।

এমটিআইএস

প্রথম সেমিস্টারঃ ৫১১. বুখারী শরীফ-১ ৫১২. রিজাল শাস্ত্র ৫১৩. মুসলিম শরীফ-১ ৫১৪. ইলমুল জরহ ওয়াত তা'দীল ৫১৫. তাফসীতুল কুরআন বিস সুন্নাহ ৫১৬. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক।

দ্বিতীয় সেমিস্টারঃ ৫২১. বুখারী শরীফ-২ ৫২২. মুসলিম শরীফ-২ ৫২৩. বিভিন্নধর্ম ও দলসমূহ ৫২৪. সমকালীন বিভিন্ন মতবাদ ৫২৫. আহকামুস সুন্নাহ ৫২৬. ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম।

এমফিল

নিম্নের কোর্সসমূহ হতে যে কোন দু'টি করে কোর্স গ্রহণ করতে হবে।

৬০১. গবেষণা পদ্ধতি ৬০২. উলূমুল কুরআন ৬০৩. উলূমুল হাদীস ৬০৪. হাদীস শাস্ত্রের ইতিহাস ৬০৫. ইলমুল জরহ ওয়াত তা'দীল ৬০৬. তুলনামূলক ধর্ম ৬০৭. ইসলামী সভ্যতা ৬০৮. ইসলামী

শরীআ ৬০৯. ফিকহুস সুন্নাহ ৬১০. সুন্নাহ সম্পর্কে আনীত অভিযোগের অপনোদন ৬১১. ইসলামী ঐতিহ্য ৬১২. জাল হাদীস ৬১৩. রিজাল শাস্ত্র ৬১৪. ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (বি.এ অনার্স)

প্রথম বর্ষ

১–ইসলামের ভূমিকা ২–আল কুরআন (সূরা নূর, সূরা ফাতহ, সূরা হুজরাত) ৩–আল আল্ কালাম ৪–রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা।

দ্বিতীয় বর্ষ

১–হাদীস (কিতাবুল ঈমান ও কিতাবুসখ্রি.াত), উলুমূল হাদীস ও হাদীস শাস্ত্রের ইতিহাস ২–ইসলামে সামাজিক ব্যবস্থা ও পারিবারিক কল্যাণ ৩–তাফসীর উসূলে তাফসীর ও তাফসীর শাস্ত্রের ইতিহাস ৪–মুসলিম দর্শন ৫–ইংরেজি।

তৃতীয় বর্ষ

১–মুসলিম বিশ্বের ইতিহাস ২–আরবী সাহিত্য ব্যাকরণ অনুবাদ রচনা ৩ – ইসলামে অর্থনীতি ব্যাবস্থা ৪–স্টাডি অব ফিকহ, উসূলে ফিকহ ও তারীখে ফিকহ ৫–ইসলামে রাজনৈতিক ব্যবস্থা ৬–ইসলামের ইতিহাস।

চতুর্থ বর্ষ

১৮৪১–সীরাতুন্নবী (সাঃ)১৮৪২–বিশ্বের প্রধান প্রধান ধর্ম ১৮৪৩–ইসলামী ব্যাংক ও বীমা ব্যবস্থা ১৮৪৪–বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে মুসলমানদের অবদান ১৮৬১–ইসলামী সভ্যতা।

এম এ

১–তাফসীর (আল কাশশাফ: সূরা ফাতিহা, সূরা বাক্বারা প্রথম–৭২ নং আয়াত) ২–হাদীস-১, (বুখারী শরীফ)–বাবুল ওহী ও কিতাবুল মাগাযী, (মুসলিম শরীফ)–কিতাবুল ঈমান ও কিতাবুল হজ্জ ৩–হাদীস-২, (আবু দাউদ)–কিতাবুস সাওম ও কিতাবুয যাকাত) ৪–উলুমূল কুরআন ও তারীখুল হাদীস/ইসলামী দাওয়াহ/ধর্মসমূহের ইতিহাস।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (বি.এ অনার্স)

প্রথম বর্ষ

১৮১১–ইসলামের ইতিহাস ১৮১২–কুরানিক স্টাডিজ: (সূরা নূর, সূরা ফাতহ, সূরা হুজরাত) ১৮১৩–আল কালাম ১৮১৪–রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা।

দ্বিতীয় বর্ষ

১৮২১–ষ্টাডি অব আল হাদীস, উসূলে হাদীস ও তারীখুল হাদীস ১৮২২–ইসলামে সামাজিক রীতি–নীতি ও পারিবারিক কল্যাণ ১৮২৩–ষ্টাডি অব তাফসীর, উসূলে তাফসীর ও তারীখে তাফসীর ১৮২৪–ইসলামিক দর্শন ও দার্শনিক বৃন্দ ১৮২৫ – ইংরেজী।

তৃতীয় বর্ষ

১৮৩১–মুসলিম বিশ্বের ইতিহাস ১৮৩২–আরবী সাহিত্য ব্যাকরণ অনুবাদ রচনা ১৮৩৩ – ইসলামে অর্থনীতি ব্যাবস্থা ১৮৩৪–ষ্টাডি অব ফিকহ, উসূলে ফিকহ ও তারীখে ফিকহ ১৮৩৫–ইসলামে রাজনৈতিক ব্যবস্থা ১৮৫১–ইসলামের ইতিহাস।

চতুর্থ বর্ষ

১৮৪১–সীরাতুন্নবী (সাঃ) ১৮৪২–বিশ্বের প্রধান প্রধান ধর্ম ১৮৪৩–ইসলামী ব্যাংক ও বীমা ব্যবস্থা ১৮৪৪–বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে মুসলমানদের অবদান ১৮৬১–ইসলামী সভ্যতা।

এম এ

১৮৫১–তাফসীর (আল কাশশাফ: সূরা ফাতিহা, সূরা বাক্বারা প্রথম–৭২ নং আয়াত) ১৮৫২–হাদীস-১, (বুখারী শরীফ)–বাবুল ওহী ও কিতাবুল মাগাযী, (মুসলিম শরীফ)–কিতাবুল ঈমান ও কিতাবুল হজ্জ ১৮৫৩–হাদীস-২, (আবু দাউদ)–কিতাবুস সাওম ও কিতাবুয যাকাত–তাহাভী ১৮৫৪–উলুমূল কুরআন ও তারীখুল হাদীস ১৮৫৫–ইসলামী দাওয়াহ ১৮৫৬–ধর্মসমূহের ইতিহাস।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : বি.এ ও এম.এ শ্রেণির ইসলামী শিক্ষা উন্নয়নে সমস্যা ও সম্ভাবনা

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের জন্য গবেষণার কোন বিকল্প নেই। ইউজিসি কমিশন বে-সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল. ও পিএইচ.ডি. ডিগ্রি করার অনুমতি দেয়নি। শিক্ষার সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে অতি দ্রুত ইউজিসি কমিশন বে-সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল. পিএইচ.ডি গবেষণার সুযোগ দেয়া প্রয়োজন। এছাড়া বাংলাদেশে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়নে যে সব সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে এবং যে সম্ভাবনা রয়েছে নিম্নে সেগুলো তুলে ধরা হলো:

বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে সমস্যা

ক. স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সমস্যা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমাদের প্রথমেই বুঝতে হবে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সামগ্রিক আর্থিক দায়, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার বিকাশ ও বিস্তারে গুরুভার ও দায়িত্ব একান্তভাবে সরকারের উপর ন্যস্ত রেখে উচ্চ শিক্ষার সমস্যাগুলো সমাধান করা সম্ভব কিনা। একটি প্রশ্ন তত্ত্বগতভাবে উত্থাপিত হতে পারে যে, বাজার অর্থনীতির প্রভাবরূপে উচ্চ শিক্ষাকেও পণ্য করে তোলা সঙ্গত কি না, যেমনভাবে সাধারণ ভোগের সামগ্রী বা পণ্যের বাজার ক্রেতার ক্রয় ক্ষমতা ও চাহিদা অনুসারে, নির্ধারিত হয় মুক্ত প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে।[১]

খ. বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থায় পদ্ধতি ও নিয়ম হয়ে দেখা দেয়াতে প্রতিষ্ঠানের নিয়মের মধ্যে যারা নির্বাচিত হচ্ছে তারা প্রধানতঃ এর নিয়মগুলোর অন্ধ অনুসরণকারী। যারা বাদ পড়েছে তারা ব্যর্থ বলে গণ্য হচ্ছে। এর ফলে একটি বিরাট অপচয় এবং অসামঞ্জস্য পরিকল্পিত হচ্ছে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শুধু ভুল কৌশল ও দক্ষতা দিচ্ছে তাই নয়, ব্যবস্থার ভেতর দিয়ে ভূল দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি হচ্ছে যা সামগ্রিক উন্নয়নের সহায়ক হচ্ছে না। ক্রমাগত মানুষ গ্রাম থেকে শহরে আসতে চাচ্ছে এবং কর্মহীন বেকার বৃদ্ধি পাচ্ছে।[২]

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ইসলামী শিক্ষা সম্প্রসারনের অভাব

দেশে সাধারণ শিক্ষা ধারায় পরিচালিত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট অনুষদ বা কলা অনুষদের অধীনে ইসলামী শিক্ষা, আরবী, উর্দূ ও ফার্সী বিভাগ এবং প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে দারুল

---

১. ড. আলী আসগর, *শিক্ষা ও উন্নয়ন প্রত্যাশা* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০০০ খ্রি.), পৃ. ১৩৬-১৩৮

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬

ইহসান ইউনিভার্সিটি (১৯৯৩ খ্রি.), আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম (১৯৯৫ খ্রি.), সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি (২০০২ খ্রি.), শান্ত-মারিয়াম ইউনিভার্সিটি অব য়েটিব টেকনোলজি (২০০৩খ্রি.), বাংলাদেশ ইসলামী ইউনিভার্সিটি (২০০৫খ্রি.), দি পিপল্‌স ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ(১৯৯৬খ্রি.), উত্তরা ইউনিভার্সিটি (২০০৩খ্রি.), এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ (১৯৯৬খ্রি.), মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (২০০১), ঢাকাতে নির্দিষ্ট অনুষদ বা কলা অনুষদের অধীনে ইসলামী শিক্ষা, বিভাগ/কোর্সসমূহ পরিচালিত হচ্ছে। উচ্চস্তরে 'ইসলামী শিক্ষা' স্বতন্ত্রভাবেই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটিমত সব বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদ হওয়ার দাবী রাখে। আর এটি এ অনুষদের অধীনে বিশ্বস্বীকৃত Islamisation of Knowledge and Quranic Scince, Hadithic Scince বিভাগ খোলা যাবে। Comparative Religion, Islamic Ideology, Islamic Economics-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রি প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।[১] অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী শিক্ষা পড়ানো হয় না।

দেশের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী শিক্ষার কোন বিষয় পড়ান হয় না। ইসলামী শিক্ষার বিষয়াদি আধুনিকতার নাম করে সেসব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিসর্জন দেয়া হয়েছে। অথচ কৃষি, বিজ্ঞান, কারিগরি ইত্যাদির জন্য প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইসলামী শিক্ষার বিভিন্ন দিক থেকে গবেষণার মাধ্যমে আংশিক হলেও বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত করা একান্ত প্রয়োজন। এতে বিশ্বয়ানের এ যুগে মাদরাসার শিক্ষার্থীরা এসব

---

১ তাছাড়া পৌরনীতি, সমাজ নীতি, ইসলামের ইতিহাস, ইসলামী সংস্কৃতি, ইসলামী রাষ্ট্র বিজ্ঞান, ইসলামী শিল্পকলা ইসলামী আইন বা ফিকহে ইসলাম, ইসলামী দর্শন ইত্যাদি বিভাগ চালু করা সম্ভব হবে। এ কথা স্বীকৃত সত্য যে, ইসলামী সোনালী যুগে রাষ্ট্র বিজ্ঞানী, সমাজ বিজ্ঞান, দার্শনিক, শিল্পী, ভূগোলবিদ, ডাক্তার, প্রকৌশলী ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিতদের মধ্য থেকেই জন্ম নিয়ে ছিল। তাঁদের আরোহি জ্ঞান থেকে তাঁরা বিশ্বকে অবাক করার মত আবিষ্কারও উপহার দিয়েছিলেন। সুতারাং জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধুনিক এ যুগে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কলা অনুষদের অধীনের বিভাগ হিসাবে কয়েকটি বিষয় চালু রেখে সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক সৃষ্টি ছাড়া অন্য কোন দিকে অবদান রাখতে পারছে না। কারণ ইসলামের বিষয়গুলো শুধু মানবিক বিভাগেই সীমাবদ্ধ নয়। সে জন্য উচ্চ স্তরে ইসলামের ব্যাপক পরিধেয়ে একটি ছোট বলয়ে আবদ্ধ রাখা বৈষম্যমূলক আচরণ বলতে বেশী বলা হবে না। সে জন্য পরিকল্পনা মাফিক ব্যবস্থধীনে ইসলামী শিক্ষা বা Quranic Education নামে পৃথক অনুষদ সৃষ্টির মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষা বিভিন্ন বিষয় দ্বারা কয়েকটি বিভাগ চালু করে ইসলামী শিক্ষার এ আঙ্গিনা থেকে ভাষাবিদ, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, পৌরবিদ, রাষ্ট্র বিজ্ঞানী, যুক্তিবিদ, আইনবিদ, কৃষিবিদ, প্রশাসক ইত্যাদি দিকে মানব সম্পদ সৃষ্টি হতে পারে। অপর দিকে পৃথিবীর ইসলামী দেশগুলোর বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মানের সমতা ও বিধান হবে। গতানুগতিক এ পন্থা প্রকৃত পক্ষে আন্তর্জাতিক মানের ইসলামী শিক্ষা প্রদানের জন্য এটা যথেষ্ট নয়। ড. আ. ই. ম. নেছার উদ্দিন, *ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন:প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯১-৩৯২

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ভর্তি হয়ে তাদের মেধা বিকাশে প্রচেষ্টা নিয়োজিত করতে পারবে।[১]

সম্ভাবনাময় ছাত্র-ছাত্রী মেধার বিকাশ ঘটাতে পারছে না

মাদরাসা শিক্ষতদের জন্য দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যবস্থা নেই। ভর্তি পরীক্ষায় সকল বিষয়ে ভর্তির সুযোগ না পেয়ে মাদরাসা থেকে পাশ করা সম্ভাবণাময় ছাত্র-ছাত্রীর মেধা বিকাশ ঘটাতে পারছে না। এক দিকে এটা শিক্ষা ব্যবস্থার একধরনের অবিচার করার শামিল। অন্যদিকে জাতীয় অগ্রগতির পথেও এটা একটা বাধা স্বরূপ। যেহেতু দাখিল ও আলিম শ্রেণিকে যথাক্রমে এস.এস.সি ও এইচ.এস.সির সমমান দেয়া হয়েছে, সেহেতু সমমানের ভিত্তিতে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা ভর্তির সুযোগ পাওয়ার দাবীদার। এ ব্যাপারে প্রচলিত ভর্তির পদ্ধতি ও সংস্কার একান্ত জরুরি।[২]

উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে চালু

উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে ইসলামী শিক্ষার ২০০ নম্বরের ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে চালু রয়েছে। একটি মুসলিম দেশ এখানে ইসলামী শিক্ষাকে ২০০ নম্বরের বাধ্যতামূলকভাবে সিলেবাসে রাখা প্রয়োজন। কেননা উচ্চ মাধ্যমিক এ যদি ইসলামী শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা না হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী শিক্ষা বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহ কম দেখা যায়। এদিকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রমেও 'ইসলাম ধর্ম' নামে একটি পাঠ্যভুক্ত আছে। ইসলামী ধর্ম বাদ দিয়ে এ বিষয়ের নাম 'ইসলামী শিক্ষা' নামকরণের মাধ্যমে ১০০ নম্বরের একটি পূর্ণাঙ্গ বিষয় হিসেবে চালু করা দরকার। এ জন্য পাঠ্য বইয়ের সংস্কার সাধন করে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে না রেখে আবশিক বিষয়ের মর্যাদায় উন্নীত করা প্রয়োজন।

আবশ্যকীয় বিষয় হিসেবে পড়ানো হয় না

দেশের সাধারণ শিক্ষা ধারার পিটিআই ও টিটিসি গুলোতে ইসলামী শিক্ষার আবশ্যকীয় কোন বিষয় হয় না। অতিরিক্ত ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে ৫০/১০০ নম্বরের পরীক্ষা নেয়ার ব্যবস্থা চালু আছে। অথচ এ প্রশিক্ষণ গুলোতে ইসলামী শিক্ষার হাতে কলমে প্রশিক্ষণ লাভের জন্য আবশ্যকীয় বিষয় হিসেবে কমপক্ষে ১০০ নম্বর নির্ধারণ রাখা প্রয়োজন।[৩] কারণ একজন প্রশিক্ষিত শিক্ষক যদি ইসলামী শিক্ষার গুরুত্বকে ছাত্রদের কাছে বাড়ীয়ে তুলতে পারে তাহলে,

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ-৩৯২

২. ড. আ.ই.ম. নেছার উদ্দিন, *ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯২

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৩; পিটিআই ও টিটিসি'র সিলেবাস পর্যালোচনার আলোকে।

পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলে-মেয়েরা উচ্চ শিক্ষা গ্রহনের সময় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ইসলামী শিক্ষাকে নির্বাচিত করবে।

ইসলামী শিক্ষায় নারী সম্পৃক্ততায় অন্তরায়

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে মেয়েদের মাদ্‌রসায় পড়ালেখা করার ব্যাপারে এক ধরণের হীন মানসিকতা কাজ করত। ফলে কাওমী মাদ্‌রাসা সংশ্লিষ্টরা মনে করত, মহিলাদের কুরআন তিলাওয়াত করা এবং ধর্মীয় কিছু ইবাদত পালন ব্যতিরেকে অন্য কোন শিক্ষার প্রয়োজন নেই। অবশ্যই স্বাধীনতার পর আস্তে আস্তে এসব ভ্রান্ত ধারণার বিলুপ্ত ঘটে।[১] সরকারী ও বে-সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রমাগত উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে (ইসলামিক স্টাডিজ) ছাত্রীদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিষয়গুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসে নেই

দেশ স্বাধীন হওয়ার আগেই বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিতহয় ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়া ১৯৯২খ্রি. বে-সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের মাধ্যমে বেশকিছু বে-সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় (ইসলামিক স্টাডিজ চালু আছে) স্থাপিত হয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (পাবলিক)ও দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটি (বে-সরকারী) ছাড়া এ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে আন্তর্জাতিক মানের কোন সিলেবাস অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এমনকি ইসলামিক স্টাডিজকে কলা অনুষদের অধীনে চালু রাখা হয়েছে।[২]

ইউজিসি যথেষ্ট স্বাধীন নয়

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন যথেষ্ট স্বাধীন বা ক্ষমতা প্রাপ্ত নয়, মন্ত্রণালয় একে নিয়ন্ত্রণ করে। ইউজিসি পাবলিক ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে মঞ্জুরী কমিশনের এবং প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে রেগুলেটরী কমিশনের কাজ করে।[৩]

---

১. ড. আ. ই. ম. নেছার উদ্দিন, *ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ-৩৯৩

২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠকালে পরিকল্পনা ছিল-ইসলামিক স্টাডিজ ও আরবীর জন্য পৃথক অনুষদ প্রতিষ্ঠা করা হবে। কিন্তু অজ্ঞত কারণে তা কলা অনুষদের অধীনস্থ বিভাগে পরিণত করা হয়েছে। অথচ ইসলামিক স্টাডিজ ও আরবী অনুষদ পৃথকভাবে চালু করলে ইসলামী শিক্ষায় উচ্চ স্তরে সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব হতো। পৃথক পৃথক অনুষদ হলো "Islamisation of Knowledge" এর চাহিদা মত ইসলামের সকল বিষয়গুলোর বিষয়ারী স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর শ্রেণি খোলার সুযোগ হতো। স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সম্ভব্য বিষয়গুলো অংশ বিশেষ দিয়ে যে সিলেবাস প্রনয়ন করা হয়েছে, তা যথাযথ জ্ঞান লাভের সহায়ক নয়। ড. আ.ই.ম. নেছার উদ্দিন, ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন:প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, প্রাগুক্ত, (ঢাকা:ইফাবা, অক্টোবর ২০০৫), পৃ. ৩৮৩

৩ বর্তমান প্রেক্ষাপটে ইউজিসি প্র্যন্টস এন্ড রেগুলেটরী কমিশন বা হায়ার এডুকেশন কমিশন। কিছু বে-সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় বাণিজ্যকরণ বন্ধে ইউজিসি'র বিচারিক ক্ষমতা না থাকায় সামাজিক চাপ সৃষ্টি করা এবং আইগত চাপের সুপারিশ করে মাত্র। ৫১ টি বে-সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অল্প ক'টির মান মোটামুটি ভালো,

বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট পাশের ৮ শতাংশ পড়ার সুযোগ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে দেশের সরকারী ও বে-সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পর্যাপ্ত পরিমানে আসন না থাকায় উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় মোট পাশের শতকারা ৮ ভাগ শিক্ষার্থীর ভর্তির সুযোগ আছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি) এর রিপটে বলা হয়েছে, উচ্চ শিক্ষায় সুযোগ লাভকারীদের হার ভারতে ১১: ৯ মালয়েশিয়ায় ২৯: ৩ ও থাইল্যান্ডে ৩৭: ৩ শতাংশ। বর্তমান এ সংকট শিক্ষাবিদরা মান সম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করার পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়াতে হবে।[১]

অধিকাংশের ভালো নয়; কোন কোনটির মান অত্যন্ত খারাপ। ক্যাম্পাস পত্রিকার সাথে একান্ত সাক্ষৎকারে ইউজিসি চেয়ারম্যান; এম হেলাল (সম্পাদক), বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পত্রিকা, বর্ষ-২৭, সংখ্যা-১২, ঢাকা: বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস., নভেম্বর-২০০৮খ্রি.

১ ইউজিসি রির্পোট; এম হেলাল (সম্পাদক), বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পত্রিকা, বর্ষ-২৭, সংখ্যা-১২, ঢাকা: বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস., নভেম্বর-২০০৮খ্রি.

ব্যাপক শিক্ষাক সংকট

আমাদের দেশে যেসব বিশ্ববিদ্যালয় (সরকারী ও বে-সরকারী) নতুন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, সেখানে থাকছে ব্যাপক শিক্ষাক সংকট। সেটা সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় হোক বে-সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় হোক সবগুলোতে প্রায় একই সমস্যা চলছে।[১] এক্ষেত্রে ইউজিসি থেকে একটা নীতি মালা প্রনয়ন করা উচিত যে, নির্দিষ্ট পরিমান শিক্ষক ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়/বিভাগ পতিষ্ঠিত/খোলার অনুমোদন দেয়া যাবে না। কেননা যত বেশি শিক্ষক থাকবে শিক্ষার্থীর ততো বেশী শেখা বা জানার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

রাজনৈতিক বিচারে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে আমাদের দেশে প্রায় প্রচলিত নিয়ম হয়ে দাড়িয়েছে যখন যে দল সরকার গঠন করে তখন সে দলের মন্ত্রী-এম.পি গণ সার্বিক চিন্ত-চেতনা না করে নিজেদের স্বাসিদ্ধীর লক্ষ্যে নিজের এলাকায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে। ফলে প্রতিষ্ঠান পরিচালনার নানা রকম সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। [২]

অধ্যাপক ছাড়াই বিশ্ববিদ্যালয়-এর গমন

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষক না থাকা বে-সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় এর জন্য এটা অন্যতম সমস্যা। এ সমস্যা নিস্পত্তি করতে পারলে শিক্ষার্থীরা অভিজ্ঞ শিক্ষকের নিকট থেকে মূল্যবান শিক্ষালাভ করতে সক্ষম হবে। এ সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এর চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম সমকাল পত্রিকায় বলেছেন, আমরা জানি, পূর্ণ অধ্যাপক এমনকি সহযোগী অধ্যাপক ছাড়াই অনেক পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় চলছে।[৩]

ইউজিসিতে নিবন্ধন ছাড়া উচ্চশিক্ষার সনদ প্রদান

---

১. জনাব সাব্বির নেওয়াজ (বিশিষ্ট কলামিষ্ট), *সমকাল* (জাতীয় পত্রিকা), ঢাকা: (১৫ জুলাই-২০১০খ্রি.), পৃ. ২০

২. তাই এ সর্ম্পকে জনাব সাবিক্ষর নেওয়াজ বিশিষ্ট কলামিষ্ট, সমকাল পত্রিকায় লিখেছেন: সমকালের অনুসন্ধানে সম্প্রতি সরকারী উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্টানে এ দূর্দশার চিত্র বেরিয়ে এসেছে। দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা বলেছেন, উচ্চ শিক্ষার ব্যাপক চাহিদা থাকা সত্ত্বেও উপযুক্ত বিবেচনা না করে কেবল রাজনৈতিক বিচারে দেশের বিভিন্ন জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ফলে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে কাম্যসংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তি হচ্ছে না। আবার যারা ভর্তি হচ্ছে, উপযুক্ত শিক্ষক না থাকায় তাদের মানসম্পন্ন শিক্ষা দেয়া যাচ্ছে না। তারা মনে করেন, এতে সরকারের বিপুল পরিমান অর্থের অপচয় হয়েছে। দেশে বর্তমান ৩১ টি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এছাড়া আরো ২টি বিশ্ববিদ্যালয় কাজ শতকারা ৫০ ভাগ শেষ হয়ে গেছে। এ দুটো বিশ্ববিদ্যালয় হলো বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় ও গোপাল গঞ্জে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয়। প্রাগুক্ত।

৩. জনাব সাব্বির নেওয়াজ (বিশিষ্ট কলামিষ্ট), *সমকাল* (জাতীয় পত্রিকা), (ঢাকা: ১৫ জুলাই, ২০১০খ্রি.), পৃ. ১৭

আমাদের দেশে এমন কিছু বিদেশী বে-সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আছে যেগুলো ইউজিসিতে নিবন্ধন ছাড়া শুধু মাত্র বিনিয়োগ বোর্ড ও জয়েন্ট স্টক কোম্পানির অনুমোদন নিয়ে দেদার্সে উচ্চ শিক্ষার সনদ প্রদান করছে।[১]

২০০৭খ্রি. ইউজিসি পরিচালিত সর্বশেষ জরিপে দেখা গেছে, দেশে ৫৬ টি বিদেশী বে-সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় বা তাদের শাখা ছিল। [২] তবে নাম প্রকাশ করার শর্তে ইউজিসি'র এক দায়িত্বশীল কর্মকর্তা বলেন, শিক্ষার্থীরা বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখায় ভর্তি হওয়ার আগে আসে না, আসে সার্টিফিকেট নেয়ার পর।[৩]

- **স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষার মানের সংকট**
- আমাদের দেশে প্রতি বছর উচ্চ মাধ্যমিকে ভাল ফলাফল করার পর মান সম্পন্ন
- বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ভর্তি হতে পারছে না। এটা একটি দারুন সমস্যা কেননা দেশে সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মান সমান নয়।[৪]

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে আসন সীমিত

আমাদের দেশে প্রতি বছরই স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বিজ্ঞান ও বানিজ্য শাখায় যে পরিমাণ শিক্ষার্থী পাস করে, আসন সংকটের কারণে সে পরিমাণ শিক্ষার্থী ভর্তি হতে পারে না। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার সপ্নে এ সমস্য উত্তরণ করা একান্ত জরুরী, বিশেষ করে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বিজ্ঞান ভিত্তক ইসলামী বিভাগ খোলা।[৫]

---

১. আমানুর রহমান (বিশিষ্ট কলামিষ্ট), *নয়া দিগন্ত* (জাতীয় পত্রিকা), ঢাকা: (১২ জুলাই-২০১০খ্রি.), পৃ. ১৬

২. তাদের বর্তমান অনুসন্ধানের তথ্য হচ্ছে, এ ধরণের প্রতিষ্ঠানের সংখ্য হচ্ছে শতাধিক। এ সব প্রতিষ্ঠান থেকে সনদপ্রাপ্তরা ইউজিসিতে এসে ঐ প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন আছে কিনা জানতে চাইছে। ইউজিসি সূত্র জানায়, বিদেশী নাম ধারী এ সব পতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয় এর শিক্ষার মান সম্পর্কে ইউজিসিতে কোন তথ্য নাই। যে কারণে এ সব বিশ্ববিদ্যালয় এর কথিত ডিগ্রির মূল্যয়নও তারা করছে না, করবেও না। প্রাগুক্ত।

৩. আমানুর রহমান (বিশিষ্ট কলামিষ্ট), *নয়া দিগন্ত* (জাতীয় পত্রিকা), (ঢাকা: ১৫ জুলাই, ২০১০খ্রি.), পৃ. ১৭

৪. এ কারণে সবার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ভর্তি হতে পারছে না। এ সম্পর্কে বিশিষ্ট কলামিষ্ট জনাব মাজেদুল নয়ন . গত ১৭ জুলাই 'ভারের কাগজ প্রত্রিকায় লিখেছেন, -আসন সংকটের কারণে নয় বরং বিশ্ববিদ্যালয় গুলোর মানের সংকটের কারণেই এইচএসসি তে ভাল করেও অনেক শিক্ষার্থী এবার ভর্তি নিয়ে সমস্যায় পরেছে। এ ক্ষেত্রে উত্তরণের উপায় সরকারের সদ ইচ্ছা।

৫. প্রাগুক্ত।

কর্মমূখী শিক্ষার অভাব

অথচ ইসলামী শিক্ষার পাশাপাশি, এ ধারায় কর্মমূখী শিক্ষার বিষয়গুলো শিক্ষা দিলে তারা যুগ ও সময়ের চাহিদা মিটাতে সক্ষম হবে। নচেৎ এ শিক্ষা ধারার বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী বেকার বা অর্ধবেকার থেকে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে।[১]

আধুনিক ও বিজ্ঞান শিক্ষার অনুপস্থিতি

ইসলাম বিজ্ঞান সম্মত ও মানবিক চাহিদা পূরণে সক্ষম এক বাস্তব জীবন বিধান। আল-কুরআন হচ্ছে বিজ্ঞানময় এক মহাগ্রন্থ। ইসলামের সোনালী যুগে বিজ্ঞানের বিকাশ সাধিত হয়েছে। ইসলামী শিক্ষা লাভ করার পাশাপাশি মুসলমানদের দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক হওয়ার গৌরব গাঁথা ইতিহাসের বিস্ময়। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ইসলামী শিক্ষায় স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রচলন কোন অসুবিধা নেই। এজন্য গবেষণা ও প্রচেষ্টা চালিয়ে এ শিক্ষা ধারায় বিজ্ঞান শিক্ষার প্রচলন সময়ের দাবী। বিজ্ঞান শিক্ষা অন্তর্ভূক্তির ফলে এ ধারার শিক্ষিতরা নিজেদের কে সমাজে সঠিক ভাবে উপস্থাপন করার সুযোগ লাভ করবে। দেশ জাতির উন্নতি ও অগ্রগতিতে তারা আসাব্যঞ্জক অবদান রাখতে সক্ষম হবে।[২]

১. ড. আ. ই. ম. নেছার উদ্দিন, প্রাগুক্ত, (ঢাকা:ইফাবা, অক্টোবর ২০০৫খ্রি.), পৃ. ৩৯১

২. ড. আ.ই.ম. নেছার উদ্দিন, প্রাগুক্ত, (ঢাকা:ইফাবা, অক্টোবর ২০০৫), পৃ. ৩৯০

চতুর্থ অধ্যায়

মাওলানা হাফেজ আহমদ (রঃ) এর জীবন পরিক্রমা

চতুর্থ অধ্যায়

মাওলানা হাফেজ আহমদ (র:) এর জীবন পরিক্রমা

প্রথম পরিচ্ছেদ: জন্ম ও বংশ পরিচয়

মাওলানা হাফেজ আহমদ (র:)[১] ছিলেন ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা 'উমর ইবনু খাত্তাব (রা:) এর ৩৭তম বংশধর।[২] শাহ সাহেব (র:) এর পূর্বপুরুষ শাহ আলম খোন্দকার স্বীয় মুশিদের নির্দেশে 'আরব থেকে চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলার গহিরা গ্রামে আগমন করেন। সেখান থেকে বাঁশখালি উপজেলার কালীপুর গ্রামে বসবাস করেন। বাঁশখালি থেকে তাঁর পুত্র মুহাম্মদ ইব্রাহিম খোন্দকার চুনতি[৩] গ্রামে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।[৪]

মিয়া মুহাম্মদ গোলাম কবির, ইব্রাহিম খোন্দকার এর পিতা শাহ আলম খোন্দকারই প্রথম চুনতীতে আগমন করেন। তিনি প্রথমে 'আরব থেকে দিল্লিতে এবং সেখান থেকে গৌড়ে। অতঃপর নৌপথে ঢাকা এবং ঢাকা থেকে চট্টগ্রামের চুনতী গ্রামে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।[৫]

মাওলানা হাফেজ আহমদ (র:) ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামের চুনতী ইউনিয়নে 'উমর (রা:) এর ৩৬তম বংশধর হযরত মাওলানা সৈয়দ আহমদ (র:)-এর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম সনের ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। যেমন- ১৯০৩ খ্রি., ১৯০৪ খি., ১৯০৫ খ্রি., ১৯০৭ খ্রি. ও ১৯০৮ খ্রি. শাহ সাহেব নিজেই একবার বলেছেন, আমার জন্ম ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে।[৬] কিন্তু শাহ সাহেব (র:) এর ছোট ভাই মাওলানা ছালেহ আহমদ (র:) বলেন, তিনি ১৯০৮ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন।[৭]

---

১. তিনি সকলের নিকট হযরত শাহ সাহেব কেবলা (র:) চুনতী নামে খ্যাত।

২. মিয়া মুহাম্মদ গোলাম কবির, *স্মৃতির পাতায় হযরত শাহ সাহেব কেবলা (র:) চুনতী* (চট্টগ্রাম: প্রকাশক, মুহাম্মদ আবু তাহের ও অন্যান্য, ২য় সংস্কারণ, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ১২

৩. চট্টগ্রাম থেকে প্রায় ৭০-৭৪ কি.মি. দক্ষিণে, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের পাশে কক্সবাজার জেলার কাছাকাছি লোহাগড়া উপজেলায় চুনতী ইউনিয়ন অবস্থিত। এর আয়াতন প্রায় ৬১.২২ বর্গকিমি।

৪. মিয়া মুহাম্মদ গোলাম কবির, প্রাগুক্ত।

৫. প্রাগুক্ত।

৬. ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, *শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ, মানবসেবা ও সুফিবাদে শাহ সুফি মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ:) এর অবদান* (চট্টগ্রাম : আল্লামা শাহ আব্দুল জব্বার ফাউন্ডেশন, ২০২৩ খ্রি.), পৃ. ২৯

৭. প্রাগুক্ত।

শাহ্ সাহেবের বংশ পরিচয়

১. ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা ‘উমর ইবনু খাত্তাব (রা:)

২. হযরত ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমর (রা:)

৩. হযরত মুছলিম ইবনু ‘আবদুল্লাহ (র:)

৪. হযরত জাইদ ইবনু মুসলিম (র:)

৫. হযরত তালহা ইবনু জাইদ (র:)

৬. হযরত আককাস ইবনু তালহা (র:)

৭. হযরত ছৈয়দ আকবর ইবনু আককাস (র:)

৮. হযরত জানে আলম ইবনু ছৈয়দ আকবর (র:)

৯. হযরত আব্বাস ইবনু জানে আলম (র:)

১০.হযরত আশরাফ উল্লাহ ইবনু আব্বাস (র:)

১১.হযরত সাজেদ ‘আলী ইবনু আশরাফ উল্লাহ (র:)

১২.হযরত জাফর উল্লাহ ইবনু সাজেদ ‘আলী (র:)

১৩.হযরত নাজেম ইবনু জাফর উল্লাহ (র:)

১৪.হযরত মুছলিম ইবনু নাজেম (র:)

১৫.হযরত মুহাম্মদ তকী ইবনু মুছলিম (র:)

১৬.হযরত জাবের ইবনু মুহাম্মদ তকী (র:)

১৭.হযরত ‘আব্দুল হামীদ ইবনু জাবের (র:)

১৮. হযরত রঈছ উদ্দীন ইবনু ‘আব্দুল হামীদ (র:)

১৯.হযরত জাফর আলম ইবনু রঈছ উদ্দীন (র:)

২০. হযরত কাজী ইউসুফ ইবনু জাফর আলম (র:)

২১.হযরত কাজী ইসহাক ইবনু কাজী ইউসুফ (র:)

২২. হযরত বুরহান ইবনু কাজী ইসহাক (র:)

২৩. হযরত নজির হুসাইন ইবনু বুরহান (র:)

২৪. হযরত আমান উল্লাহ ইবনু নাজির হুসাইন (র:)

২৫. হযরত কাজী নজীবুল্লাহ ইবনু আমান উল্লাহ (র:)

২৬. হযরত ‘আব্দুন নবী ইবনু কাজী নজীবুল্লাহ (র:)

২৭. হযরত আমজাদ হুসাইন খোন্দকার ইবনু ‘আব্দুন নবী (র:)

২৮. হযরত শাহাদাত হুসাইন খোন্দকার ইবনু আমজাদ হুসাইন (র:)

২৯. হযরত শাহ আলম খোন্দকার আল মুহাজির আল মুবাল্লিগ আল আরবি ইবনু শাহাদাত হুসাইন খোন্দকার (র:) ('আরব দেশ থেকে বাংলাদেশে আগমনকারী)

৩০.হযরত মুহাম্মদ ইব্রাহিম খোন্দকার ইবনু শাহ আলম খোন্দকার (রহ:) (চুনতীতে বসতী স্থাপনকারী)

৩১.হযরত মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ তালুকদার ইবনু মুহাম্মদ ইব্রাহিম খোন্দকার (র:)

৩২. হযরত মুহাম্মদ আব্দুল গণি শিকদার ইবনু মুহাম্মদ আব্দুররশীদ তালুকদার (র:)

৩৩. হযরত সুফী মুহাম্মদ মুকীম ইবনু মুহাম্মদ আব্দুল গণি শিকদার (র:)

৩৪. হযরত মুন্সি কাশেম আলী সিকদার ইবনু সুফী মুহাম্মদ মুকীম (র:)

৩৫. হযরত মাওলানা কাজী মুহাম্মদ ইউসুফ আলী ইবনু মুন্সি কাশেম আলী সিকদার (র:)

৩৬. হযরত মাওলানা ছৈয়দ আহমদ ইবনু মাওলানা কাজী মুহাম্মদ ইউসুফ আলী (র:)

৩৭. হযরত মাওলানা হাফেজ আহমদ ইবনু মাওলানা সৈয়দ আহমদ (র:) (শাহ সাহেব কেবলা চুনতী।)[১]

হযরত শাহ সাহেবের দাদা কাজী মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ আলী (র:) আরকানের আকিয়াবের জমিদার ছিলেন। চুনতীর উর্ধ্বতন পূর্বে পুরুষের মধ্যে ৬ষ্ঠ তম অধস্তন ব্যক্তি। আকিয়াবের কাজী ও বিভিন্ন মসজিদের খতিবের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন।[২]

শাহ সাহেবের বংশ অতি উচ্চ সম্ভ্রান্ত বংশ। মেহমানদারী শাহ সাহেবের পরিবারের ঐতিহ্য। সবসময় কয়েকজন মাদ্‌রাসার ছাত্র 'আলেম-ওলামা "ইউসুফ মঞ্জিলে" থাকত। চুনতীতে বাইরের কোন মেহমান আসলে সবাই ইউসুফ মঞ্জিলে পাঠিয়ে দিত। তাদের মেহমানদারী আহলে আরবদের মত বিখ্যাত ছিল। বৃটিশ আমল থেকে মানুষ চুনতী হয়ে মিয়ানমারে যাতায়ত করত। চুনতী খান দীঘির পূর্ব-দক্ষিণ পাশে নিয়মিত বাজার ও স্থায়ী দোকান চালু ছিল। মানুষ দুটি কারণে ইউসুফ মঞ্জিলে অবস্থান করত।

প্রথমত: শাহ সাহেবের দাদার সময় হতে বার্মায় বিরাট জমিদারী ছিল। তারা মেহমানদারীতে ছিল সিদ্ধহস্ত। ইউসুফ মঞ্জিলে চলত মেহমানদারী। তথা যিয়াফতখান, যা অদ্যাবধি শাহ সাহেব কেবলা (র:) চুনতীর দু'আয় চালু আছে। দ্বিতীত: সেই সময় হতে অনেক শাগরিদ, মুরিদ ইলম ও মা'রেফত শিক্ষা লাভের জন্য আসত। সেই হিসেবে শাহ সাহেবের বংশধরগণও

---

১. আহমদুল ইসলাম চৌধুরী, *হযরত শাহ মাওলানা হাফেজ আহমদ (র:)* (চট্টগ্রাম: প্রকাশক: মাঈন উদ্দীন মাহমুদ চৌধুরী ও অন্যান্য, ৪র্থ সংস্করণ, ২০১৬ খ্রি.), পৃ. ৩২

২. প্রাগুক্ত।

উদার ছিল। মাওলানা হাফেজ আহমদ শাহ সাহেব (র:) এ অভিসন্দর্ভের মহান ব্যক্তি। তিনি উম্মতের দরদে বড় বড় জিয়াফত মাহফিল ও মেহমানদারীর আয়োজন করতেন।

লোকোরা বলে, শাহ সাহেব যত গরু জবেহ করে মানুষরা এত মোরগও জবেহ করে না। শাহ সাহেব (র:) এর জন্য ১০-১২টি গরু জবেহ করা মামুলী ব্যাপার ছিল।

ایی سعادت بزور بازو هست * تانه بخشد خدائے بخشنده

"এই সৌভাগ্য ক্ষমতা বা নিজ বাহুবলে নয়; বরং আল্লাহ্‌র দান ও অনুগ্রহে হয়।"[১]

শাহ সাহেব (র:) এর দাদা কাজী ইউসুফ আলী (র:) তাঁর পিতাকে নিয়ে হজ্জব্রত পালনকালে মক্কায় ইন্তেকাল করেন। তাঁকে মক্কার জান্নাতুল মুয়াল্লায় দাফন করা হয়। তখন শাহ সাহেব মায়ের গর্ভে ছিলেন। তাঁর পিতা ও মাতা হজ্জব্রত পালন শেষে ১৯০৭ খ্রি. বাড়িতে ফিরে আসেন।[২]

শাহ সাহেব (র.) এর বংশ তালিকা

কাজী ইউসুফ আলী (র:)

মাওলানা ফয়েজ আহমদ | মাওলানা ছৈয়দ আহমদ[৩] | মাওলানা বশির আহমদ | মাওলানা নুর আহমদ

হযরত মাওলানা শাহ হাফেজ আহমদ (র:) শাহ সাহেব চুনতী

হযরত মাওলানা ছালেহ আহমদ (র:)

মাওলানা হাফিজুল ইসলাম আবুল কালাম আজাদ
আবদুল মালেক ইবনে দিনার নাজাত
আনোয়ার উল্লাহ সুজাত
আসমা উল্লাহ ইমরাদ
ইবনুল হাসান আসকালানী সম্রাট
মাওলানা ইমাম বায়হাক্বী ইতমাম
হামিদা নুসরাত
সাজেদা সুরাত,
জামিলা সরাত ইবরত

বর্তমান মোতাওয়াল্লী
কমিটির সভাপতি

মাওলানা দিদার-ই হক দিদার
তৈয়বুল হক বেদার
আসরারুল হক আবদার
আবরারুল হক মুকুট
সাফেয়া বেগম সাফু
সায়েকা বেগম হীরা
মাহবুবু খানম চুন্নী
রিফাতুন্নো লিজা

[illegible], তা.বি., গজল নং ১৯

[illegible] ছয়জন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। [illegible] প্রথম স্ত্রী হাজেরা খাতুনের ঔরষে জন্ম

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : শৈশবকাল ও শিক্ষাজীবন

শিশু শাহ হাফেজ আহমদ গ্রামের সবুজ শ্যামল পরিবেশে বেড়ে উঠতে থাকেন এবং ছোটবেলা থেকেই তিনি অসাধারণ ধী-শক্তির অধিকারী ছিলেন। জন্মের পরে তিনি পিতা ও মাতার স্নেহা-আদরে বেড়ে উঠেন। শৈশবকালে মাত্র সাত বছর বয়সে তাঁর মা ইহধাম ত্যাগ করে মহান আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে পরলোক গমন করেন। তাঁর ধী-শক্তি দেখে সকলেই উজ্জল ভবিষ্যত সম্পর্কে বুঝতে পেরেছিলেন। মাতৃ বিয়োগের পর পিতা ও বড়দের আদর যত্নে লালিত পালিত হন। তিনি আমিরাবাদের মাওলানা বজলুর রহমান (র:) নিকট প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন।

অল্পদিনের মধ্যে কুর'আন মাজীদ খতম করেন। বাংলা, উর্দু, ফার্সী এবং 'আরবী ইত্যাদি ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষকদের কাছেই ৭ম শ্রেণি পর্যন্ত দ্বীনিশিক্ষা অর্জন করেন। এরপর সাতকানিয় উপজেলার আফজল নগরে হযরত মাওলানা আব্দুল বারী (র:) এর নিকট মাত্র ১২ বছর বয়সে জমাতে হাফতুম পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করেন। সেখান থেকে বাশঁখালী ছনুয়া মাদরাসায় আজমগড়ী (র:) এর খলীফা মাওলানা ফজলুল হক চুনতবী মুজাদ্দেদী এর তত্ত্বাবধানে এক বছর শিক্ষা অর্জন করেন। সেখান থেকে চট্টগ্রাম চন্দনপুরা দারুল 'উলুম কামিল মাদরাসা থেকে আলিম পাস করেন। এখানে তার প্রসিদ্ধ শিক্ষক ছিলেন মাওলানা ফজলুর রহমান (র:), মাওলানা নজির আহমদ (র:), মাওলানা মীর মরউদ আলী (র:), মাওলানা মুহাম্মদ আমীন (র:), মাওলানা ফোরকান (র:) প্রমুখ। সেখান থেকে প্রখ্যাত সুফী সাধক মাওলানা ছফি উল্লাহ (র:) এর তত্ত্বাবধানে কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসা থেকে অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে ফাযিল ডিগ্রি অর্জন করেন। তখন ফাযিলের সিলেবাস অতি উচ্চস্তরের ছিল। শাহ সাহেব (র:) এর গুরুতর অসুখ হওয়ায় কামিল পড়তে পারেননি। সেখানে শাহ সাহেব (র:) তাঁর পিতার অনুরোধে চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসার সাবেক অধ্যক্ষ মাওলানা নুরুল হুসাইন (র:) তাঁর অভিভাবকত্ব ও দেখা শুনা করতেন।

সেসময় আমিরাবাদ সুখছড়ির মাওলানা আহমদ কবির (র:), মাওলানা তজম্মুল হুসেন (র:) শাহ সাহেবের সাথে ছিলেন। শিক্ষকরা তাঁর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন। তিনি স্বাধীনভাবে

চলাফেরা করতেন। শিক্ষকরা তাঁর বংশমর্যাদা এবং জন্মগত ওলী হওয়ার ব্যাপারে অবগত ছিলেন।

শাহ সাহেব (র:) বলতেন, "আল্লাহর দেয়া ফন্নাই আসল ফন্না" অর্থাৎ আল্লাহর প্রদত্ত লেখাপড়াই আসল লেখাপড়া। তিনি আল্লাহর দেয়া জ্ঞানে জ্ঞানী ছিলেন। তাঁর কুর'আন ও হাদীসের জ্ঞান অতুলনীয় ছিল।[১]

১. আহমদুল ইসলাম চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কর্মজীবন বার্মা (মিয়ানমার) সফর ও আধ্যাত্মিকচর্চা

কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসা হতে অসুস্থাবস্থায় দেশে এসে কিছুদিন নিজ বাড়িতে অবস্থান করে দাদার জমিদারী দেখার জন্য বর্তমান মিয়ানমারের আকিয়াব যান। সেখানে হতে রেংগুন বর্তমান ইয়াংগুনে যান। সেখান হতে তাঁর ফুফাত ভাই মাওলানা ইব্রাহিম সাহেবকে দেখতে ভামু যান। ভামুর বড় মসজিদের ইমাম ও খতিবের দায়িত্ব পালন করেন। শাহ সাহেবকে খতিবের দায়িত্ব দিয়ে মাওলানা ইব্রাহিম সাহেব কিছুদিনের জন্য দেশে চুনতীতে আসেন।[১]

শাহ সাহেব ৬/৭ মাস খতীবের দায়িত্ব পালন করেন। আল্লাহর হুকুমে ১৯৩৬-৩৭ খ্রি: সেখানেই মুজযুব হয়ে ৬ মাস যেতে না যেতেই তার এই অস্বাভাবিক অবস্থা দিন দিন বৃদ্ধি পেল। ইমামতি বাদ দিয়ে পাহাড়ে জংগলে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। অসময়ে লোকেরা তাকে দেখে ভয় পেত। কিন্তু তিনি কাউকে ভয় পেতেন না তাকে না চিনে মারধর করতে পারার আশংকায় সাতগড় নিবাসী মাওলানা আতাউল্লাহ হুসাইনীর নাতি মাওলানা গোলাম মোস্তফা (সেই মসজিদের সানি ইমাম) শাহ সাহেব (র:) কে নিয়ন্ত্রন ও হিফাজত করতে গিয়ে অনেক সময় নিজেও প্রহৃত হয়েছেন। তিনি শাহ সাহেবের এই অবস্থার কথা দেশের বাড়িতে জানালে শাহ সাহেবের ছোট ভাই মাওলানা ছালেহ আহমদ ইমাম সাহেবের সহযোগিতায় কোমরে ও হাতে শিকল বেঁধে স্টিমারে করে অনেক কষ্টে দেশের বাড়ি চুনতীতে নিয়ে আসেন। পরিবারের পক্ষ থেকে নানান চিকিৎসা করে ও ফল না পেয়ে এ অবস্থায় ঘরে খুটি দিয়ে আটাকে রাখা হয়। আজমগড়ি (র:) তরিকত সফরে চুনতীতে আসলে শাহ সাহেবকে দেখে অত্যন্ত র্মমাহত হন। শাহ সাহেব(র:) এর জেঠা যিনি হামেদ হাসান আলভী আজমগড়ী (র:) এর খলীফা ছিলেন মাওলানা হাকিম মনির আহমদ (র:) এর পিতা ফয়েজ আহমদ (র:) আজমগড়ী (র:) কে বলেন, আমার ভাতিজাকে একটু দেখেন। তখন আজমগড়ী (র:) বলেন, "তোমরা তাকে ছেড়ে দাও। বেঁধে রাখতে হয় এরকম পাগল সে নয়। এক সময় তোমরা বুঝতে পারবে। একদিন সে বড় হবে। একই রকম কথা বলেছিলেন শাহ সাহেবের উস্তাজ ও ভগ্নিপতি

১. আহমদুল ইসলাম চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

মাওলানা নজির আহমদ (র:)। এভাবে ১৯৩৭ হতে ৩৬ বছর পাহাড়ে, জঙ্গলে, নদীতে অলিতে, গলিতে শহরে, বন্দরে, উচু-নিচু জায়গায়, শীতে-গরমে, ঝড়ে বৃষ্টিতে তুফানে অন্ধকারে আল্লাহর যিকির ও রাসূলুল্লাহ (স:) এর প্রশংসা করে বেড়াতেন।আরাম আয়েশ ত্যাগ করে একাকীত্ব বরণ করেন। কারো কথায় কর্ণপাত করতেন না।

এই সময় তিনি একটি বাক্যই সবসময় বলতেন-

ہم مزارِ محمد پہ مر جائیں گے + زندگی میں یہی کام کر جائیں گے

(হাম মাজারে মুহাম্মদ পে মর যায়েঙ্গে + জিন্দেগী মে ইয়াহি কাম কর জায়েঙ্গে।)

"মুহাম্মদ (সা.) এর উদ্দেশ্য আমার জীবন উৎসার্গিত, সারাজীবন তাঁর ধ্যানেই আমি থাকব নিয়জিত।"

এ সময় শাহ সাহেবের পরিবার অসহায় বোধ করলে উনার সহধর্মীণির নানা খান সাহেব আগমন করে মকবুল আলী চৌধুরী ছেলে-মেয়েসহ নাতনীকে চকরিয়া নিয়ে একটি মসজিদে চাকরি দেন। কিন্তু অস্বভাবিক অবস্থা হলে মসজিদের রুমে বেঁধে রাখলেও সেখান থেকে পালিয়ে যেত।

কুতবে আলম মাওলানা আব্দুস সালাম আরকানী (র:) তরীকতের সফরে চুনতীতে আগমন করলে শাহ সাহেবের অবস্থা দেখে বলেছিলেন, "তোমরা হাফেজকে ছোট মনে কর না। তিনি একদিন স্বাভাবিক হয়ে আপন পরিচয় দিবে এবং বড় বুযুর্গ হিসেবে গণ্য হবে।"[১]

হযরত শাহ সাহেব বছরের অধিকাংশ সময় রোযা রাখতেন। খাওয়া দাওয়ার কোন আগ্রহ ছিল না। কোন হাদিয়া ভক্তি করে দিলে তা গ্রহণ করতেন। সমসময় সুন্নতী পোষাক পড়তেন। জুতা পড়েতন। বৃষ্টিতে ছাতা ব্যবহার করতেন না, অথচ উনার কাপড় ভিজত না। স্বাভাবিক অবস্থায় মাঝে মধ্যে ছাতা ব্যবহার করতেন।[২]

হজ্জব্রত পালন

শাহ সাহেব (র:) ১৯৭০, ১৯৭২, ১৯৭৪, ১৯৭৬, ১৯৭৮ ও ১৯৭৯ খ্রি: মোট ০৬ বার হজ্জব্রাত পালন করেন। ১৯৭০ খ্রি: পাকিস্তান আমলে জীবনের ১ম হজ্জ পালন করেন। এ সময় তার সফল সঙ্গী ছিলেন লোহাগাড়া উপজেলার পুটিবিলা ইউনিয়নের দীর্ঘদিনের

১. মিয়া মুহাম্মদ গোলাম কবির, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭-১৮

২. প্রাগুক্ত।

চেয়ারম্যান ও তৎকালিন জেলা পরিষদের তৎকালিন সদস্য জয়নুল আবেদীন চৌধুরী প্রকাশ জনু মিয়া। সাতকানিয়া বাজালিয়া নিবাসী মকবুল আহমদ চৌধুরীর বড় ভাই ডা. মনির আহমদ চৌধুরী। ১৯৭২ খ্রিঃ সরকারী ব্যবস্থানপায় হজ্জ করেন। সাথে ছিল ডা. মনির আহমদ চৌধুরী। ১৯৭৪ খ্রিঃ এই বারেও সারকারী ব্যবস্থাপনায় হজ্ব করেন। সফর সঙ্গী ছিল বিচারপতি ছিদ্দিক আহমদ চৌধুরী ও এ.বি.এম আশরফ উল্লাহ। ১৯৭৬ খ্রিঃ এর বারে সফর সঙ্গী ছিলেন হাটহাজারী মেখল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শাহাব উদ্দীন, শাহ সাহেব (রঃ) এর একান্ত ভক্ত ও খাদেম হযরত অধ্যক্ষ কাজী মাওলানা মুহাম্মদ নাছির উদ্দীন, আধুনগর, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম, হাফেজ হারুন অর রশীদ, বারদোনা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম। শাহাব উদ্দীন চেয়ারম্যান মিরাজ রজনীতে রওজা মোবারক জেয়ারতের সময় শাহ সাহেব (রঃ) কে নামাজরত অবস্থায় দেখার পর সাক্ষাতের চেষ্টা করেও পাননি অথচ শাহ সাহেব মেরাজুন্নবী (সঃ) মাহফিলে চুনতিতে ছিলেন। এই অবস্থা দেখে শাহ সাহেবকে তার দুই খাদেমসহ হজ্জ করানোর ব্যবস্থা করেন। ১৯৭৮ খ্রিঃ এইবারও সরকারী ব্যবস্থাপনায় হজ্জ করেন। সাথে ছিল মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব, হেম সেন লেইন, চট্টগ্রাম। মাওলানা শফিক আহমদ সাবে চেয়ারম্যান, আধুনগর, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম। মাওলানা রহমত উল্লাহ লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম। ১৯৭৯ খ্রিঃ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সরকারী অতিথি হিসেবে শাহ সাহেব ও তাঁর একান্ত খাদেম হযরত মাওলানা কাজী অধ্যক্ষ নাছির উদ্দীন সুফি মিয়াজী পাড়া, আধুনগর, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম সহ ৬ষ্ঠ ও শেষবারের হজ্জ পালন করেন।[১]

ভারত সফর

১৯৮০ খ্রি. ডিসেম্বর মাসে ভারত সফর করেন। এছাড়াও তিনি একাধিকবার ভারত সফর করেন। তিনি যেয়ারতের উদ্দেশ্যে কলকাতা, বান্ডেল, আজমগর, দিল্লি, আজমীর, মুম্বাইসহ অনেক স্থানে গমন করেন।

হযরত শাহ সাহেব (রঃ) ইনতিকালের দুই তিন বছর পূর্বেও একবার ভারত সফর করেন। এই সফরে কলকাতা যান এবং হযরত সৈয়দ আবদুল বারী (রঃ) আল হাসানী ওয়াল হোসাইনীর যেয়ারতে বান্ডেল গমন করে। তিনি আজমগড়ী হযরতের যেয়ারতের জন্য বিমানে কলকাতা

১. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুন নুর ছিদ্দিকী চিশতী, *হায়াতে শাহ সাহেব কেবলা* (চট্টগ্রাম : আলহাজ্ব মৌলভী ফারুক আহমদ চৌধুরী ও অন্যান্য, ১ম সংস্করণ ১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ৩৪-৩৫

থেকে বান্ডেল হয়ে আজমগড় গমন করেন এবং আজমগড়ী হযরতের তথায় রাত্রি যাপন করেন। পরদিন দিল্লি অতঃপর আজমীর যেয়ারতে গমন করেন।[১]

গাড়ি দূর্ঘটনা

রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন,

أشدُّ الناسِ بلاءً الأنبياءُ ثمَّ الأمثلُ فالأمثلُ

"বলা-মসিবত, দুঃখ-কষ্ট নানারকম পরীক্ষাসমূহ হযরত আম্বিয়া (আ:) এর উপরই বেশি।"[২]

একজন সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন: "হে আল্লাহর রাসূল! মানুষের মধ্যে কারা সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়েন?"

তিনি বলেন: "নবীগণ। তারপর যারা তাদের নিকটতম (সৎ ও শ্রেষ্ঠ)। মানুষকে তার দ্বীনের শক্তি অনুযায়ী পরীক্ষা করা হয়–যদি তার দ্বীন দৃঢ় হয়, তার পরীক্ষা কঠিন হয়; আর যদি দ্বীনে দুর্বলতা থাকে, তবে সে অনুযায়ী পরীক্ষা হয়। এমনকি বান্দা পৃথিবীতে চলাফেরা করে অথচ তার কোনো গুনাহ অবশিষ্ট থাকে না (পরীক্ষার মাধ্যমে গুনাহ মাফ হয়ে যায়)।"

যার যতদুর সহ্যগুণ আছে এবং দরজা মরতবা বড় হয় তার উপর সেই রকমই বালা মসিবত ও পরীক্ষা হয়। নবীগণের ধারাবাহিকতায় সাহাবী তাবেয়ী তবে তাবেয়ী গউস কুতুব আবদাল অলি আল্লাহর উপর বিপদ আপদ মসিবত এসেছে। তেমনিভাবে শাহ সাহেব (র:) এর জীবনেও সড়ক পথে দূর্ঘটনায় আক্রান্ত হয়। জীবনের শেষ প্রান্তে শাহ সাহেব ১৯৮০ খ্রি: ০৪ আগস্ট সোমবার রমজান মাসে আরকান মহাসড়কে মারাত্মকভাবে এক গাড়ি দূর্ঘটনারয় আক্রান্ত হন।[৩]

এতে শাহ সাহে (র:) এর দুটি চক্ষুরই দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে যায়। এর পরেও তিনি স্বাভাবিক ছিলেন। কোন প্রকার উদ্বিগ্ন হা-হুতাস করেন নি। বাহ্যিক ভাবে না দেখলেও তিনি স্বাভাবিক

---

১. প্রাগুক্ত।
২. *সুনানে তিরমিযী*, হাদীস নং: ২৩৯৮; *সুনানে ইবনে মাজাহ*, হাদীস নং: ৪০২৩; *মুসনদে ইমাম আহমদ*, হাদীস নং: ১৪৮১। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসানুন সহীহ বলেছেন।
৩. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুন নুর ছিদ্দিকী চিশতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

দৃষ্টি সম্পন্নদের অনুরুপ ছিলেন। দৃষ্টি হারানোর পর তিন বছর জিবিত থাকাকালীন তাঁর জীবন যাত্রা ছিল স্বাভাবিক, এতে সবাই অবাক হয়ে যেতেন।

ইন্তেকাল

শাহ সাহেব (র:) ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দের ২৯ নভেম্বর মোতাবেক ১৪০৪ হিজরী ২৩ সফর, রোজ সোমবার, বেলা ১২টা ১৫মিনিটে ৭৫ বছর বয়সে لااله الاالله محمد رسول الله বলে লক্ষ লক্ষ ভক্তবৃন্দ ও আত্মীয় স্বজনদের রেখে বেলায়তের এই সম্রাট হাসিমুখে মহান আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে পরলোক গমন করেন।

ইন্তেকালের সময় তিনি একটা শের কবিতা পড়েছিলেন-

فرد قائم ربطِ ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں + موج ہے دریا کے اندر، بیرونِ دریا کچھ نہیں

"ব্যক্তি (মানুষ) কেবল মিল্লাত বা সমাজের সাথে সম্পর্কের মাধ্যমেই টিকে থাকে; একা সে কিছুই নয়। যেমন ঢেউ নদীর (বা সাগরের) ভেতরে থাকলেই ঢেউ; নদীর বাইরে তার কোনো অস্তিত্ব নেই।"[১]

অর্থাৎ, মানুষের শক্তি ও পরিচয় সমাজ ও উম্মাহর সাথে সম্পর্কের মধ্যেই নিহিত। ব্যক্তি যদি সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে তার শক্তি ও প্রভাব নষ্ট হয়ে যায়–যেমন পানির বাইরে ঢেউ থাকে না।

ইকবাল বুঝাতে চেয়েছেন, এখানে উম্মাহর ঐক্য, সামাজিক বন্ধন ও সম্মিলিত শক্তির গুরুত্ব বোঝাতে চেয়েছেন। তিনি বলতে চান– ব্যক্তি একা শক্তিশালী নয়; সমাজ ও উম্মাহর সাথে যুক্ত থাকলেই শক্তি ও ঐক্যের মধ্যেই মুসলিম জাতির উন্নতি।

জানাযা ও দাফন

শাহ সাহেবের ইন্তেকালের রাতের পরের দিন ২৪ সফর ১৪০৪ হিজরী ৩০ নভেম্বর ১৯৮৩ খ্রি: মঙ্গলবার বাদ আসর চুনতি সীরাত ময়দানে জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হয়।

সীরাত ময়াদানের পশ্চিম পাশে মসজিদের বায়তুল্লাহর দক্ষিণ পাশে ওলিদের এই সম্রাটকে দাফন করা হয়। তাঁর জানাযার অবস্থা বর্ণনা করে চট্টগ্রাম দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসার

১. আল্লামা ইকবাল, *বঙ্গে দারা* কবিতা গ্রন্থে নেয় হয়েছে।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী নিম্নোক্ত মারসিয়া (শোককবিতা)। এতে তাঁর ইনতিকালে শোক, মর্যাদা ও আধ্যাত্মিক অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে।

زمیں روتی زمان روتا فلک آسو بھاتا ہے + چنوتی کا ستارہ خاک میں مدفون ہوتا ہے

"পৃথিবী কাঁদছে, যুগ কাঁদছে, আকাশও অশ্রু ঝরাচ্ছে,

চুনতীর নক্ষত্র (মহামানব) আরজ মাটির বুকে দাফন হলেন।

جنازہ کیا سمندر تھا بنی آدم کی موجیں تھیں + یہ منظر دیکھے کیسے ولی اللہ سے ملتا ہے

এটা যেন শুধু জানাযা ছিল না, এক সমুদের মতো জনসমাগম ছিল, মানুষের ঢেউ ছিল চারদিকে।

এমন দৃশ্য কেবল কোনো ওলিয়ুল্লাহ্‌র জানাযাতেই দেখা যায়।

یہی ہے روضہ خاکی شہنشاہ چنوتی کا + یہاں مخفی ہے مخزن لؤلؤ مرجان و موتی کا

এটাই চুনতীর শাহেনশাহ (মহান নেতা)-এর মাটির রওজা।

এখানে লুকিয়ে আছে মুক্তি, মণি-মানিক্যের ভাণ্ডার (অর্থাৎ অমূল্যব্যক্তি)।

ولی واصلِ حق معجز سیرت کا مرقد ہے + چمکتا ہے یہ تربت سے ستارہ نیک بختی کا

এটি সেই ওলির কবর, যিনি আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে পৌঁছেছেন, যার জীবন ছিল অলৌকিক চরিত্রের অধকারী। এই কবর থেকে সৌভাগ্যের নক্ষত্র যেন আলো ছড়াচ্ছে।"[১]

সুরত মুবারক

শাহ সাহেব(র:) ছিলেন এক জ্যের্তিময় চেহেরার আধিকারী। শরীরের উচ্চতা ছিল লম্বা। শরীর বেশি লম্বা ও না মোটাও না। পায়ের রং উজ্জল ফর্সা দেখতে মায়া লাগত। হাতের বাহু লম্বা। হাতের তালু বড় ও নরম, আঙ্গুল সমূহ লম্বা, লতি ছাড়া চুল ছিল, চোখ ছিল বড়, ভাবগম্ভির পূর্ণ ব্যাক্তিত্ব সম্পন্ন ছিলেন। মানুষ তাকেঁ ভয় করত। সকলের সাথে ভাল ব্যবহার করতেন। কেউ কেউ বলে আন্দরকিল্লাহ শাহী জামে মসজিদে খতিব্ আওলাদে রাসূলুল্লাহ

১. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুন নুর ছিদ্দিকী চিশতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০

(স:) সৈয়দ আব্দুল করিম (র:) এর সাথে তারঁ দৈহিক আকৃতির কিছুটা মিল ছিল। তাঁর হাটা চলা দ্রুতগতি সম্পন্ন। চলার সময় বীরের মত উবয় বাহু নেড়ে হাটঁতেন। উচ্চস্বরে ধীরে কথা বলতেন।

পোশাক

সবসময় সুন্নতী পোষাক পড়তেন। লম্বা কোরতা, সাদা টুপি এবং মূল্যবান সুন্দর সাদা খতওয়ালা লুঙ্গি পড়তেন। পায়জামা কয়েকবার ব্যবহার করেছিলেন। দামী পামসু মৌজাসহ পড়তেন। লাল রুমাল মাঝে মধ্যে ব্যবহার করতেন, সাদা রুমাল ঘাড়ের উপর হতে দুই পার্শ্বে ঝুলিয়ে রাখতেন। আতর ও সুগন্ধি বের হত। তিনি ডান হাতে ঘড়ি দিতেন এবং বলতেন আমি ইয়াহুদী খৃষ্টানের বিরোধী কাজ করছি।

খাওয়া-দাওয়া

শাহ সাহেবের খাওয়া দাওয়া সুন্নত মোতাবেক ছিল। প্রায় সময় মেহমানসহ খেতেন, যখন ইচ্ছা তখন খেতেন। খাবার সামনে আনলে খেতেন। দই বেশী পছন্দ করতেন। ঝাল তরকারী বেশী পছন্দ করতেন। মধু ও ঘি বেশি পছন্দ করতেন। দেশী পিঠা শীত পিঠা বেশি পছন্দ করতেন। কড়া রং চা বেশী খেতেন। কলা বিস্কুট হাতে ভেঙ্গে খেতেন ইত্যাদি।[১]

মেহমানদী

শাহ সাহেব (র:) এর মেহমানদারী ছিল অনন্য ও বেনজীর যা বংশগত ঐতিহ্য ও বটে। চুনতীর আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব মাওলানা হাফেজ আহমদ শাহ সাহেব (র:) ছিলেন মেহমানদারী বা অতিথি আপ্যায়নে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ, যা চুনতী সীরত ময়দান সংলগ্ন তাঁর বাড়ি 'ইউসুফ মঞ্জিল' থেকে পরিচালিত হতো। ১৯ দিনব্যাপী সীরতুন্নবী (সা.) মাহফিলে আসা হাজারো মেহমান, আলেম-ওলামা ও সাধারণ মানুষের জন্য তিনি অকাতরে অন্নসংস্থান ও সেবার নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

মেহমানদারীর কিছু উল্লেখযোগ্য দিক

উদার আপ্যায়নঃ শাহ সাহেব কেবলা (র:) মেহমানদের সেবাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির মাধ্যম মনে করতেন এবং তাদের সাধ্যমতো সেরা আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করতেন।

---

১. প্রাগুক্ত।

১৯ দিনব্যাপী আপ্যায়নঃ চুনতীর ঐতিহাসিক ১৯ দিনব্যাপী সীরতুন্নবী (সা.) মাহফিলে আগত দেশ-বিদেশের মেহমানদের খাবারের অভাব যেন না হয়, সেজন্য তিনি সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন।

ঐতিহ্যবাহী স্থানঃ তাঁর বাসস্থান ও পূর্বপুরুষের বাড়ি 'ইউসুফ মঞ্জিল' মেহমানদারীর কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল।

নিঃস্বার্থ সেবাঃ ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অত্যন্ত সাদাসিধে ছিলেন এবং মেহমানদের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখতে ভালোবাসতেন।

শাহ সাহেব কেবলার এই মেহমানদারীর ঐতিহ্য আজও চুনতী সীরত ময়দান প্রাঙ্গণে বিদ্যমান বলে গণ্য করা হয়।[১]

দৈনন্দিন কার্যাবলী

পাচঁ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ খুব গুরুত্বের সাথে পড়তেন, ওয়াজিব, সুন্নত, নফল ও পড়তেন দরুদ শরীফ , তাসবীহ, নিয়মিত কুর'আন তেলাওয়াত ও হাদিস শরীফ পড়তেন। সূরা ফতাহ পড়তেন, বিশেষ করে এ সূরার ২৮ এবং ২৯ আয়াত প্রায় সময় তেলাওয়াত করতেন। কুর'আন শরীফের র্দুলভ তাফসীর করতেন। একাকী সময়ে বেশী বেশী মুরাকাবা করতেন। তিনি কখনো শেষ রাতে বা মধ্যে রাতে পাহাড়ী এলাকায় একাকী চলে যেতেন।

আত্নীয় স্বজনের খবর রাখা এবং সকলের সাথে সদালাপী ছিলেন। রসিকতা করতেন, সকলের জন্য দু'আ করতেন এবং বলতেন ছোট পিপিলিকার জন্য দোয়া করতে হয় যেহেতু তারাও আল্লাহর সৃষ্টি। মুচকি হাসতেন। সবসময় নাতে রাসূলুল্লাহ পড়তেন। বেশী নাত পড়ার জন্য আলেমদের কে বলতেন। ভাল নাত পড়ুয়াকে মুঠ ভরে টাকা দিতেন।

আলেমদেরকে তিনি শ্রেণি ভেদে টাকা দিতেন। আলেম ওলামা পীর বুযুর্গ জ্ঞানী গুণীদের সাথে প্রাণ খুলে কোরআন হাদীসের আলোচনা করতেন। তিনি হানফী মাজহাবের অনুসারী ছিলেন। আলেম ওলামা পরিবেষ্টিত অবস্থায় থাকতেন। আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করতেন না। অন্যায়ের সাথে আপোষ করতেন না। অত্যন্ত পরহেজগার ছিলেন সবসময় অজু সহকারে থাকতেন। অন্যদেরও অজু সহকারে থাকতে বলতেন। জামাতে নামাজ পড়তেন।

---

১. প্রাগুক্ত।

মানুষকে ভালবাসতেন। বড়দের সম্মান ছোটদের স্নেহ করতেন। নিচের দিকে চিন্তা করে চলতেন। কোন রোগী আসলে কখনো নিজে ঔষধ বলে দিতেন। আবার কখনো ডাক্তার কবিরাজ নাম ধরে দেখিয়ে দিতেন। সবধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই তার কাছে আসত। অনেক অমুসলিম তাঁর ভক্তিতে মুসলমান হয়েছিল। তাঁর কাছে কেউ দাওয়াত দিলে তা কবুল করতেন। কাউকে হিংসা করতেন না। মানুষের ভক্তি বিশ্বাসের দাম দিতেন। শিশুদেরকে ভালবসতেন। হরিণকে ভালবাসতেন। গরু লালন পালন করতেন। গরুর সাথে মানুষের মত কথা বলতেন ইত্যাদি।[১]

খোশ কালাম

তিনি বাস্তব সম্মত রসিকতা করতেন। রাসূলুল্লাহ (স:) রসিকতা করতেন বাস্তব সম্মত রসিকতা করতেন। রাসূলুল্লাহ (স:) বলেন, لا اقول الاحقا আমি সত্য রসিকতা করি।

একদিন মহাসড়কে চুনতী বাজারে শাহ সাহেব বসা ছিলেন এমন সময় শাহ সাহেব বলে উঠেন, বাগদাদ আসছে, বাগদাদ আসছে। উপস্থিত একজন আশ্চর্য হয়ে বলল- কোথায় বাগদাদ আসছে এবং কি করে বাগদাদ আসবে? তখন শাহ সাহেব বললেন ঐ যে বগদাদ আসছে, আমি কি মিথ্যা বলছি? কিছুক্ষণ পর হঠাৎ করে বগদাদ এক্সপ্রেস নামে পরিবহন বাস এসে উপস্থিত হলো, তারাও শাহ সাহেবকে দেখতে লাগল।[২]

স্বরণ শক্তি

শাহ সাহেবের স্বরণ শক্তি অসাধারণ ছিল। ৫০ বছরের আরবি উর্দু ফার্সী কবিতা অর্নগল বলতে পারতেন। পাঠবস্থার তফসীর কুরআন, হাদীস ইত্যাদি কিতাবের মূল মতন মুখস্ত বলতে পারতেন।[৩]

আল্লাহর উপর ভরাসা

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

"যে আল্লাহর উপর র্নিভর করে আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট।"[৪]

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬
২. মিয়া মোহাম্মদ গোলাম কবির, *স্মৃতির পাতায় হযরত শাহ্ ছাহেব কেবলা (রহ:)* (চট্টগ্রাম: চুনতী, ২০১১ খ্রি.), পৃ. ৭৩
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪
৪. আল-কুর'আন, সূরা আত্তালাক, আয়াত : ০৩।

এই আয়াতের আলোকে শাহ সাহেব(র:) সবসময় আল্লাহর উপর ভরসা করে জটিল ও কঠিন কাজ সমাধা করেছিলেন। বিপদে আপদে কোন সময় বিচলিত ছিলেন না।

رضاء بالقضاء "আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট হতেন।"

তিনি শান্তচিত্তের ছিলেন। জিয়াফতসহ ১৯ দিন ব্যাপী সিরতুন্নবী (স:) চালু করা এবং চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসাকে কামিল স্তরে উন্নিত করা ইত্যাদি তারই প্রমাণ বহন করেন।

শিশুদের প্রতি ভালবাসা

রাসূলুল্লাহ(স:) বলেছেন

من لم يرحم صغيرنا ولم يؤقر كبيرنا فليس منا

"যে ছোটদের স্নেহ করে না বড়দের সম্মান করে না সে আমার দল ভুক্ত নয়।"[১]

শাহ সাহেব (র:) ছিলেন এই হাদীসের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। তিনি শিশুদেরকে ভালোবাসতেন, তাদের অত্যধিক স্নেহ করতেন। তাদের টাকা দিতেন তাদের পরীক্ষার জন্য দোয়া করতেন। তাঁর প্রবর্তীত সিরতুন্নবী (স:) মাহফিলে শিশুদের খাবার বন্ধ করলে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে দু বেলা আহার করেননি।

আত্মীয়তার হক আদায় ও কৃতজ্ঞতা বোধ

রাসূলুল্লাহ (স:) বলেছেন,

قاطع الرحم لايدخل الجنة

"আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে যাবে না।"[২]

শাহ সাহেব (র:) আত্মীয়ের খবর নিতেন, তাদের বাড়িতে যেতেন। সাধ্যানুযায়ী সাহায্য করতেন যারা তাঁর প্রতি বিভিন্ন সময় সহযোগিতা করেছিলেন তাদের অবদানের কথা স্বরণ করে তাদের খোঁজ খবর ও সহযোগিতা করতেন।

কুরআন শরীফ তিলাওয়াত

রাসূলুল্লাহ (স:) বলেন,

افضل العبادة تلاوة القران

১. তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং: ১৯২১, আবুদাউদ, হাদীস নং: ৪৯৪৩।
২. *বোখারী*, কিতাবুল আদব, বাবু ইছমিল কাতেয়ে, হাদীস নং: ৪৯৮৪; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, বাবু সিলাতির রেহেমি, হাদীস নং: ২৫৫৬।

"সর্বোত্তম ইবাদত হল কুরআন শরীফ তেলাওয়াত ।"[১]

কুরআন শরীফের তেলাওয়াত শাহ সাহেবের নিয়মিত অভ্যাস ছিল। সূরা ফাতাহ এর ২৬ ও ২৭ নং আয়াত, সূরা নুরের ৩৫-৪৪ নং আয়াত, সূরা তাওবার শেষ দুই আয়াত। বড় বড় শব্দে মধুর সুরে সুন্দর করে তেলাওয়াত করতেন।

১. বায়হাকী, শুআবুল ঈমানে এনেছেন।

শাহ সাহেব (রঃ) এর উপদেশাবলী

০১. সমসময় আল্লাহর স্বরণ রাখা।

০২. আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা।

০৩. সব কাজ আল্লাহর জন্য করা। তবেই আল্লাহর সাহায্য পাওয়া যাবে।

০৪. রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সুন্নতের শক্তভাবে আনুসরণ করা।

০৫. মসজিদ, মাদ্‌রাসা তথা আল্লাহর রাস্তায় সাহায্য করা। যাতে কেয়ামত পর্যন্ত সাদাকারেয় জারিয়ার সাওয়াব চালু থাকে।

০৬. কোন উদ্দেশ্য অর্জন করার জন্য তাড়াহুড়া করা যাবে না। আল্লাহর হুকুম হলে তা কিছু বুঝে উঠার আগেই হয়ে যাবে। কারণ মানুষ ঘুমে থাকেলেও সূর্য উঠে।

০৭. আল্লাহ যাকে চায় ঘাসের মত ছোট যেকোন জিনিসের মাধ্যমেই বড় করে। আল্লাহর ইচ্ছাটাই প্রয়োজন। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ أَكْبَرُ

"আল্লাহর সন্তুষ্টিই সবচাইতে বড়।"[১]

০৮. আরবি ভাষাকে ভালাবাসা। আরবি ভাষায় লিখিত নাতে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বার বার পড়া।

০৯. কোরআন শরীফের সূরা তওবার শেষ দুই আয়াত বার বার পড়া। এই দুইটি আয়াতের ফজিলত আছে। শাহ সাহেব (রঃ) নিজেও পড়তেন। মানুষদেরকেও পড়তে বলতেন।

১০. রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর হাদীস পড়া ও শুনা।

১১. রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর মত সিরাতুন্নবী (সঃ) মাহফিল ও বড়। এটা আমার নয় এর জন্য চিন্তা করতে হবে না।

১২. কিছু খারাপ কাজের কারণে ভাল কাজে ত্যাগ করা উচিত নয়।

দুর্ব্যবহারের পরিবর্তে ক্ষমা

لَا يُجْزَىٰ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةُ وَلٰكِنْ يَعْفُونَ وَيَصْفَحُونَ

"রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, তুমি মন্দকে প্রতিহত কর উত্তম আচরণ দ্বারা।"[২]

---

১. আল-কুর'আন, সূরাতওবা, আয়াত : ৭২

২. *সুনানে তিরমিযী*, হাদীস নং ২০১৬; *মুসনদে আহমদ*, হাদীস নং ২৫৪১।

তেমনি শাহ সাহেব (র:) ও সকলকে ক্ষমা করে দিতেন যারা না বুঝে তার সাথে দূর্ব্যবহার করত।

জীবদ্দশাই হযরত শাহ সাহেবের শ্রেষ্ঠত্বের যারা স্বীকৃতি দিয়েছিলেন

০১. কুতবে আলম মাওলানা আব্দুস সালাম আরকানী (র:), খলীফায়ে আজম, হযরত আজমগড়ী (র:)

০২. হযরত মাওলনা নজির আহমদ (র:), খলীফায়ে আজম, হযরত আজমগড়ী (র.)।

০৩. হযরত মাওলানা আব্দুল মজিদ (র:) প্রকাশ বড় হুজুর, সাবেক সুপার, গারাংগিয়া ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা।

০৪. হযরত মাওলানা ফজলুল্লাহ (র:), মুহাদ্দিস ও নাজেমে আলা, চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসা ও প্রধান রুপকার: সিরাতুন্নবী (স:) মাহফিল।

০৫. হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল বারী (র:), মহেষখালি, সাবেক মুহাদ্দিস, চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদ্রাসা ও বহু মাদ্‌রাসার মুহাদ্দিস।

০৬. হযরত মওলানা মীর মুহাম্মদ আখতার (র:) পীর সাহেব, বায়তুশ শরফ, চট্টগ্রাম।

০৭. হযরত মাওলানা মুফতী ইব্রাহিম (র:), সাবেক হেড মাওলানা, চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসা ও মুফতী ও মুহাদ্দিস, পটিয়া জামিরিয়া কাসেমুল উলুম মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম।

০৮. শাহ সাহেব (র:) এর শিক্ষক হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আমীন, প্রধান শিক্ষক ও প্রধান মুহাদ্দিস, দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসা, চন্দনপুা, চট্টগ্রাম।

০৯. হাকীম (ইউনানী) ক্বারী মাওলানা মুনির আহমদ সাবেক শিক্ষক ও ক্বারী, চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসা। খলীফা, হযরত আজমগড়ী (র:) চুনতী, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

১০. হযরত মাওলানা জিয়াউল হক, চুনতি লোহাগাড়া। সাবেক শিক্ষক, চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসা। খলীফা, হযরত আব্দুস সালাম আরকানী (র:)

১১. হযরত মাওলানা বদিউর রহমান আরকানী(র:) খলীফা, হযরত আব্দুস ছালাম আরকানী (র:) আন্‌জুমন পাড়া, বালুখালী, চট্টগ্রাম।

১২. হযরত মাওলানা আমিন উল্লাহ (র:), প্রকাশ বড় মওলানা, বারদোনা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

১৩. হযরত মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ (র:), বরইতলী, চকরিয়া , চট্টগ্রাম।
শায়খুল হাদীস, পটিয়া জমিরিয়া কাসেমুল উলুম মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম।

১৪. আউলাদে রসুল (স:) হযরত মাওলানা আব্দুল আহাদ আল মাদানী(র:)
পেশ ইমাম ও খতীব, শাহী জামে মসজিদ, আন্দরকিল্লাহ, চট্টগ্রাম।

১৫. হযরত মাওলানা আব্দুর রশীদ (র:), প্রকাশ ছোট হুজুর, সাবেক সুপার, গারাংগিয়া ইসলামিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম। খলীফা, হযরত আজমগড়ী (র:)।

১৬. হযরত মীর মুহাম্মদ গোলাম মোস্তাফা (র:), সাবেক মুহাদ্দিন, চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসা ও আরো বহু মাদ্‌রাসার মুহাদ্দিস।

১৭. হযরত মাওলানা শফিউর রহমান (র:), প্রধান মুফতি ওনাজিমে আলা, জোয়ারা ইসলামিয়া মাদ্‌রাসা, চন্দনাইশম, চট্টগ্রাম।

১৮. হযরত মওলানা শফিকুর রহমান(র:), চাম্বল, বাশঁখালী, শিক্ষক ও খলীফা রঙ্গিয়াঘোনা সিনিয়র মাদ্‌রাসা বাশঁখালী, চট্টগ্রাম।

১৯. হযরত মাওলানা এলাহী বখশ (র:), শেখের খিল, সাবেক শিক্ষক, ছনুয়া ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসা, বাশঁখালী, চট্টগ্রাম।

২০. হযরত মাওলানা আব্দুল লতীফ (র:), ছনুয়া, বাশঁখালী, চট্টগ্রাম, সাবেক শিক্ষক , চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসা ও পুইছড়ি ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসা, বাশঁখালী ।

২১. হযরত মাওলানা মুজফফর আহমদ(র:), ছনুয়া, বাশঁখালী, সাবেক শিক্ষক, চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসা।

শাহ সাহেব (র:) সর্ম্পকে বিভিন্ন মনিষিদের মন্তব্য

০১ হযরত মাওলানা আব্দুর রশীদ (র:)
সাবেক মুহাদ্দিস ও শায়খুল হাদীস, চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসা।

ক. চুনতী হাকিমিয়া মাদ্‌রাসার কামিল হযরত শাহ সাহেব (র:) এর করা.

খ.শাহ সাহেব (র:) কে সবখানে দেখা যেত।

০২ প্রফেসর ড. মাঈন উদ্দীন আহমদ খান

প্রথম মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

আমাদের বাড়ি হতে শাহ সাহেব (র:) এর শেষ রাতে বড় বড় আউয়াজের নাতে রাসূলুল্লাহ (স:) শুনাতাম ।

০৩ বাহরুল উলুম শাহ মাওলানা মুহাম্মদ কুতুব উদ্দীন(র:), পীর সাহেব, বায়তুশ শরফ।

তিনি জন্মগত ওলি ও উচ্চ বংশের সন্তান ছিলেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্যে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

০৪. **প্রফেসর ড. আব্দুল গফুর চৌধুরী**

আরবি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়,

আমি শাহ সাহেবকে ইসলামিয়া ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ফাজিল পড়া অবস্থায় দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম, এবং ওয়াজেদিয়া কামিল মাদ্‌রাসা ইত্যাদি স্থানে দেখেছি।

০৫. **প্রফেসর ড. শবিবর আহমদ (র:)**

সাবেক ডিন, কলা অনুষদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

০১. শাহ সাহেব কম কথা বলতেন

০২.ড্রাইভাররা তাকে যেখানে পেতেন অত্যধিক সম্মান করে তুলে নিতেন।

০৬. **প্রফেসর ড. আবু বকর রফিক আহমদ**

সাবেক উপ-উপাচার্য, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

হযরত শাহ সাহেব (র:) ছিলেন বিশাল ব্যক্তিত্বের বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তাঁকে যে যেভাবে দেখেছেন সেভাবে পেয়েছেন।

০৭. **প্রফেসর ড. আনোয়ারুল হক খতীবী**

সাবেক চেয়ারম্যার, ইসলামী স্টাডিজ বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

শাহ সাহেব (র:) মজজুব ছিলেন। অর্থ্যাৎ তিনি আল্লাহর আকর্ষণ ও ভালবাসায় বিভোর ছিলেন।

০৮. **ড. মুহাম্মদ মুহিব উল্লাহ চৌধুরী**

প্রফেসর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

বিংশ্ব শতাব্দীর মাঝামাঝিতে প্রতিটি মানুষের মাঝে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন ও সুপরিচিতদের একজন ছিলেন হযরত শাহ সাহেব (র:)।

০৯. **মাওলানা মুমিনুল হক চৌধুরী**

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

শাহ সাহেব (র:) একজন বুজুর্গ, সুপরিচিত ও বুঝশক্তি সম্পন্ন আলেম ছিলেন।

১০. **মাওলানা নেছার আহমদ (র:)**

হযরত শাহ সাহেব (র:) এর ছোট ভাই, ইউসুফ মনজিল, চুনতী, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

শাহ সাহেব (র:) এর ইন্তেকালের দিন সাতাকানিয়ার বারদোনার বড় মাওলানা সাহেব মন্তব্য করেছিলেন, শাহ সাহেব (র:) এশিয়া মহাদেশের দায়িত্বে ছিলেন।[১]

১১. **হাফিজ হারুনুর রশীদ (র:)**

খাদেম হযরত শাহ সাহেব (র:), বারদোনা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

বৃষ্টিতে শাহ সাহেবের ছাতা ও কাপড় শুকনো থকত।

হযরত শাহ সাহেব বড় মাওলানা আমিন উল্লাহ সাহেবকে বলেছিলেন, একদিন আল্লাহ তায়ালা কে ০৩টি কথা বলেছিলাম- ০১. আমার রাগ কমিয়ে দাও; ০২. ইলম দাও; ০৩. আরেকটা বলব না।

গারাংগিয়ার ছোট হুজুর (র:) শাহ সাহেবকে উদেশ্য করে বলেছিলেন "আমার ভাই দুনিয়ার মালিক" বলে সমসাময়িক অলিদের সরদার হওয়ার ইঙ্গিত দেন।

১২. হযরত অধ্যক্ষ মাওলানা কাজী মুহাম্মদ নাছির উদ্দীন (ম.জি.আ), খাদেম হযরত শাহ সাহেব (র:)। সুফী মিয়াজী পাড়া, আধুনগর, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

শাহ সাহেব (র:) এর সবচাইতে বড় সফলতা হল ১৯দিন ব্যাপী জিয়াফত সহ সিরাতুন্নবী (স:) মাহফিল প্রবর্তন করা এবং চুনতী মাদ্‌রাসাকে কামিল স্তরে উন্নিত করা।

১৩. হযরত মাওলানা শফিক আহমদ (র:)

---

১. আহমদুল ইসলাম চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৭০

সাবেক চেয়ারম্যান, আধুনগর ইউপি, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

১৯৭৯ খ্রি. হজ্জের সফরে একটি খুবই সুন্দর কালো রং এর ঝকঝকে রুমি টুপি হাতে বাসায় ঢুকলে আমরা সবাই অবাক এমন টুপি কোথা থেকে কিনল কোন দিন কারো নজরে পড়েনি এমন শাহী টুপি। আমার মনে হল এ দিনই শাহ সাহেব কুতবে আলমের দায়িত্ব পেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী সিরাতুন্নবী (স:) মাহফিল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

১৪. এ.ডি.এম. আব্দুল বাসেত দুলাল

সাবেক যুগ্ম সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

শাহ সাহেব (রহ:) বাস্তবসম্মত রসিকতা করতেন।

১৫. মাওলানা মুহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ

চুনতী, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

সাবেক, সেক্রেটারী, চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসা।

তাঁর অসাধারণ কর্মকান্ডের কারণে শাহ সাহেব হিসেবে প্রসিদ্ধ লাভ করেন। তাঁকে দেখলে আমরা খুবই আনন্দিত হতাম। তিনি সবার মাথায় হাত রেখে দোয়া করতেন।

১৬. প্রফেসর ড. মুহাম্মদ নিজাম উদ্দীন

আরবি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ব বিদ্যালয়।

শাহ সাহেব (র:) উচু স্তরের রাসূলুল্লাহ প্রেমিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষমতা সম্পন্ন আলিম। তিনি অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। নিরহংকারী ছিলেন, বিদআত, কুসংস্কার ও কৃত্রিমতা হতে মুক্ত ছিলেন।

১৭. ড. ঈসা শাহেদী, লেখক গবেষক, ঢাকা।

শাহ সাহেব (র:) প্রবর্তীত সিরাতুন্নবী (স:) এর দৃষ্টান্ত পৃথিবীর কোথাও নেই।

১৮. মাওলানা আবু নছর আতীক আহমদ, শায়খুল হাদীস, গারাংগিয়া ইসলামিয়া কামিল মাদ্‌রাসা।

সাবেক উপাধ্যক্ষ, চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদরাসা।

চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসার প্রতি শাহ সাহেবের অধিক ভালবাসা ও অবদান ছিল। তিনি আল্লাহর সত্যিকারের উচ্চস্তরের ওলি ছিলেন। তিন উপকারীর উপকার স্বীকার ও মূল্যায়ন করতেন। সবসময় মাদ্‌রাসাকে সাহায্য করতেন।

১৯. হযরত মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ শাহে আলম

উপাধ্যক্ষ, চুনতী হাকিমিয়া কামিলা মাদ্‌রাসা।

শাহ সাহেব, এর দোয়ার বরকতে চুনতী মাদ্‌রাসার মুহাদ্দিস ও উপাধ্যক্ষ হওয়া তাঁর প্রতিষ্ঠিত মসজিদে বায়তুল্লাহর খতীব হওয়া এবং মানুষের সামনে কথাবলার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়েছিল।[১]

২০. প্রফেসর ড. হেলাল উদ্দীন মুহাম্মদ নোমান

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম, সভাপতি,গভর্নিং বডি, চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদরাসা।

০১. নাতপড়ুয়াকে নাগুনে টাকা দিতেন।

০২. আত্মীয়তার হক আদায় করতেন।

০৩. সবসময় দাঁত মুখ সহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতেন।

০৪. অর্থ সম্পদের কোন লোভ ছিল না।

০৫. একনিষ্ঠতার সাথে সালাত আদায় করতেন।

০৬. শরীয়ত বিরোধী কাজ নিজেও করতেন না, কাউকে করতে দিতেন না।

০৭. বিধর্মীরা তাকে সম্মান করত। মগরা পাহাড় হতে গরু নিয়ে আসত।

০৮. রসিকথা করতেন, যেখানে যেতেন মানুষ জমা হয়ে যেত।

০৯. গায়ের রং উজ্জল ফর্সা ও উচ্চ আকৃতির ছিল।

২২. মাওলানা হাফিজুল হক নিজামী

সাবেক অধ্যক্ষ, চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদরাসা, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

শাহ সাহেব অসাধারণ স্মৃতি শক্তির অধিকারী ছিলেন। দেশ বিদেশের ওলামারা তার কোরআন হাদীসের আলোচনা শুনে মুগ্ধ হয়ে যেতেন। ছাত্রজীবনের ৫০/৬০ বছর পূর্বের কবিতা হুবুহু বলতে পারতেন। তিনি নুরানী চেহেরার অধিকারী ছিলেন। তাঁর প্রতিটি কথা অর্থবহ ছিল। তাঁর মধ্যে সৌজন্যতা বোধ ছিল। মানুষের অতি আপনজন ও আল্লাহর ও রসুল প্রেমিক ছিলেন।

---

১. আহমদুল ইসলাম চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭০

২৩. মাওলানা মুহাম্মদ সাইয়েদ নুর

সাবেক শিক্ষক, বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম।

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, প্রখ্যাত আলেমেদ্বীন ও ওয়ায়েজ মাওলানা হাবিবুল্লাহ মিছবাহ বলেন- সীরাত মাহফিলে বিভিন্নজন বিভিন্ন আর্কষণে আসে। আমি আসি শাহ সাহেবের আর্কষণে। তিনি একজন মজজুব (আল্লাহ প্রেমে বিভোর) হয়েও খুশু খুদুর সাখে তাদিলে আরকানের সাথে নামায আদায় করেন। শিরক ও বিদয়াতের ঘোর বিরোধী ছিলেন। অত্যন্ত উদার ও দানশীল ছিলেন। মুক্তহস্তে অকাতরে দান করতেন।

২৪. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল হালীম আল-মদানী, পীর সাহেব, বাগদাদিয়া খানকাহ, চকবাজার, চট্টগ্রাম।

শাহ সাহেবের সুন্দর পোষাক, নুরানি সুরত মোবারক, নুরানি চেহারা আমাকে মোহিত করত। তিনি যেখানেই আসতেন খবর পেলে সেখানেই চলে যেতাম। আমি তাঁকে ২ রাকাত করে ১০০ রাকাত নামাজ পড়তে এবং টানা ৭দিন ঘুম যেতে দেখেছি।

২৫. দ্বীন মুহাম্মদ মানিক প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ, চুনতী সারকারী মহিলা ডিগ্রি কলেজ ও শাহ সাহেবের শ্যালক ও ভাইপো।আল্লাহ যারে বড় করে সে জানেনা সে কেমন করে উঠছে,যে ফুল নিয়ে সবাই খুশি,সে জানেনা সে কেমন করে ফুঠেছে।[১]

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪০

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : যোগ্য ব্যক্তিত্ব তৈরিতে তাঁর অবদান

যোগ্যউত্তরসুরী না রাখলে কোনকিছু টিকে থাকে না তাই শাহ সাহেবও যোগ্য ব্যক্তিত্ব তৈরী করে গেছেন, যাদের বর্ণনা জৈষ্ঠতার ভিত্তিতে নিম্নে দেয়া হলো–

০১. হযরত শাহ মাওলানা আমিন উল্লাহ (র:)

০২. হযরত মাওলানা মোবারক আহমদ (র:)

০৩. হাফেজ মুহাম্মদ হারুন (র:)

০৪. হযরত মাওলানা আব্দুর রশীদ (র:)

০৫. হযরত মাওলানা আমিন (র:)

০৬. হযরত মাওলনা শফিক আহমদ ফারুকী (র:), চুনতী।

০৭. হযরত মাওলানা কাসেম (র:)

০৮. হযরত মাওলানা কামাল উদ্দীন মুছা খতীবী (র:)

০৯. হযরত মাওলানা আবুল বারাকাত ফজলুল্লাহ (র:)

১০. হযরত মাওলানা মাহমুদুল হক খতীবী (র:)

১১. হযরত মাওলানা মাহফুজুর রহমান ছিদ্দিকী (র:)

১২. হযরত মাওলানা মুছলিম খান (র:)

১৩. হযরত বাহরুল উলুম শাহ মাওলানা মুহাম্মদ কুতুব উদ্দীন (র:)

১৪. হযরত মাওলানা আকামুদ্দীন (র:)

১৫. হযরত মাওলানা আহমদ সাঈদ (র:)

১৬. হযরত মাওলানা হাছান আলী (র:)

১৭. হযরত মাওলানা শফিক আহমদ (র:)

১৮. হযরত মাওলানা অধ্যক্ষ কাজী নাছির উদ্দীন (ম.জি.আ)

১৯. হযরত মাওলানা ড. ঈসা শাহেদী

ফখরুল মহাদ্দেসীন হযরত মাওলানা আমিন উল্লাহ (রঃ)

বারদোনা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম

এই প্রসিদ্ধ ওয়ায়েজ আলিম, ফকীহ, মুহাদ্দিস অনুমানিক ১৮৭৮ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম গোরণ আলী। মাতার নাম খাতুনে জান্নাত। বড় মাওলানা হিসেবেও পরিচিত ছিলেন। অত্যন্ত মেধবী ছিলেন। শিক্ষকদের মাঝে তার গুরুত্ব ছিল। পারিবারিক ভাবে প্রাথমিক শিক্ষা ভাল করে চট্টগ্রামের মোহসেনিয়া মাদ্‌রাসা হতে ফাযিল পাশ করে ১৯১৭ খ্রি. কলকাতা আলীয়া মাদ্‌রাসা হতে কৃতিত্বের সাথে সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভ করেন। এখানে তাঁর অভিভাবক তুল্য শিক্ষক ছিলেন মাওলানা ছফিউল্লাহ। স্বাধীনতা আন্দোণনের সময় মাদ্‌রাসা বন্ধ হলে তিনি ফতওয়া, ফরায়েজ, ওয়াজ নসিহত জীবন অতিবাহিত করেন। মাদরাসার শিক্ষার্থীরা তাঁর ওয়াজে বেশী উপস্থিত ও উপকৃত হত।[১]

হযরত মাওলানা মোবারক আহমদ (রহঃ)

বারদোনা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

জন্ম ১৯২৪ খ্রিঃ। পিতা- কলিম উল্লাহ। ফখরুল মুহাদ্দেসীন হযরত মাওলানা আমিন উল্লাহ (রঃ) এর ছোট ভাই। গারাংগিয়া ইসলামিয়া কামিল মাদ্‌রাসার হতে ১৯৪২ খ্রিঃ দাখিল, ১৯৪৪ খ্রিঃ আলিম, ১৯৪৬খ্রিঃ চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসা হতে ফাযিল পাশ করেন। ১৯৪৬ হতে ১৯৪৮খ্রিঃ পর্যন্ত মায়ানমারের রেঙ্গুনের পাঞ্জাবী জামে মসজিদের ইমাম ও খতীব ছিলেন। ১৯৫০ খ্রিঃ হতে ১৯৭১ খ্রিঃ পর্যন্ত গারাংগিয়া ইসলামিয়া কামিল মাদ্‌রাসার সিনিয়র শিক্ষক ছিলেন। বায়তুশ শরফ পীর সাহেব মাওলানা আব্দুল জব্বার (রহঃ) প্রখ্যাত মাওলানা ছিদ্দিক আযাদ (রহঃ) প্রসিদ্ধ ছাত্রদের শিক্ষক ছিলেন। তিনি যুক্তীবাদী ও সুদক্ষ বক্ত ছিলেন। ১৯৮৪ খ্রি.-১৯৯৬ খ্রি.পর্যন্ত কক্সবাজার সদর বাজার ঘাটা জামে মসজিদের খতিব ছিলেন।[২]

---

১. ড. হেলাল উদ্দীন নোমান, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭১

২, মিয়া মুহাম্মদ গোলাম কবির, পূর্বোক্ত, পৃ .১২৮
।

মাওলানা আব্দুর রশীদ (র:)(১৯২০-২০১২ খ্রি.)

শায়খুল হাদীস, চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসা

চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলার বড়হাতিয়া ইউনিয়নের রশিদের ঘোনা গ্রামে ১৯২০খ্রি: হযরত মাওলানা আব্দুর রশিদ (র:) জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা- মুহাম্মদ হামিদ উল্লাহ, মাতা- মরহুমা রমিজ খাতুন। প্রাথমিক হতে আলিম পর্যন্ত গারাংগিয়া কামিল মাদ্‌রাসায় শেষ করে চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসায় ফাজিল পাশ করে ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দ মাদরাসা হতে দাওরায়ে হাদীস শেষ করেন। হুসাইন আহমদ মদনী(র:) সহ যুগশ্রেষ্ঠ মনীষীদের কাছে লেখাপড়া করেন। ১৯৪৮ খ্রি: চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসায় সিনিয়র শিক্ষক পদে নিয়োগ হয়ে পরবর্তীতে শায়খুল হাদীস হিসেবে ৫১ বছর শিক্ষকতা করে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত মেধবী ছিলেন। ১৯৮১-১৯৮৪ পর্যন্ত চুনতী মাদ্‌রাসার প্রাক্তন ছাত্র সমিতির সভাপতি ও ২৫ ভছর মাদ্‌রাসার গভর্নিং বডির শিক্ষক প্রতিনিধি ছিলেন। ছাত্রাবাস পরিচালক ছিলেন। ২০১২ খ্রি: ইন্তেকাল করেন। অত্যন্ত মেধাবী সব বিষয়ে পারদর্শী আদর্শ শিক্ষক ছিলেন। সর্বজন শ্রদ্ধেয় ও ভক্তি শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স:) এর আদর্শের ফটোকপি ছিলেন।[১]

মাওলানা শফিক আহমদ ফারুকী (র.)(১৯২৯-১৯৮৬খ্রি.)

সাবেক অধ্যক্ষ, চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদ্রাসা, ইউছুফ মঞ্জিল, চুনতী, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

চুনতীর ইউসুফ মঞ্জিলে মাওলানা শফিক আহমদ (র:) ১৯২৯ খ্রি: ০১ মে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা: মাওলানা বশির আহমদ মাতা: চেমন আরা খাতুন। পিতার কাছে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসা হতে ফাযিল পাশ করে ভারতের দারুল উলুম দেউবন্দ মাদ্‌রাসা দাওরায়ে হাদিস উচ্চ শিক্ষা শেষ করেন। ১৯৫৮ খ্রি. হযরত আব্দুস সালাম আরকানী(র:) এর খেলাফত লাভ করেন।

---

১. আনজুমন ১০,২০০ বছর পূর্তি সংখ্যা, আনজুমনে তোলাবায়ে সাবেক্বীন, চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদরাসা, চট্টগ্রাম, প্রকাশকাল: ২০১১, পৃ. ১৭৭,১৭৮। আনজুমন ১০,২০০ বছর পূর্তি সংখ্যা, আনজুমনে তোলাবায়ে সাবেক্বীন, চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদরাসা, চট্টগ্রাম, প্রকাশকাল: ২০১১, পৃ. ১৭৭ ও ১৭৮

১৪ ডিসেম্বর ১৯৫৮ খ্রি. হতে ০৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬খ্রি. ইন্তেকাল পর্যন্ত চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ ছিলেন। ফলে তিনি মুহতামিম সাহেব নামেই পরিচিত ছিল, লোহাগাড়া ইসলামিয়া ফাযিল মাদ্‌রাসায় ও কিছু দিন অধ্যক্ষ ছিলেন। কোমল হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। সমাজপতিও ছিলেন। চুনতী ফাতেমা বতুল মহিলা ফাযিল মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।[১]

হযরত মাওলানা কাসেম (রঃ) (১৯২৬/২৭-২০১১ খ্রি.)

চুনতী, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

তিনি চুনতী গ্রামে ১৯২৬/১৯২৭ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন,পিতা: মুহাম্মদ ছৈয়দ উল্লাহ মাতা: সমন খাতুন। ১৯৩৭ খ্রি. চুনতী মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে ১৯৪৭ খ্রি. ফাযিল পাশ করেন। তারপর থেকে ১৯৮৭ খ্রি. পর্যন্ত একটানা সরকারী চাকুরী হতে অবসর গ্রহণের পরও ২০১১ খ্রি. ইন্তেকাল পর্যন্ত একটানা ৬৫ বছর চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসায় শিক্ষতা করেন। বরেণ্য অনেক ব্যক্তিত্ব তাঁর ছাত্র। ফাযিল পর্যন্ত যেকোন কিতাব পাঠ দানে সক্ষম ছিলেন।

হযরত মাওলানা কামাল উদ্দীন মুছা খতিবী (রঃ)(১৯৩৪-১৯৯৩খ্রি.)

কলাউজান. লোহাগাড়া চট্টগ্রাম।

১৯৩৪ সালে এই মনিষি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা: মাওলানা মুহাম্মদ এয়াকুব, মাতা মসুদা বেগম। তাঁর বড় ভাই মাহমুদুল হক খতীবী থেকে তাঁর আরবি, উর্দু ও ফার্সি শিখার হাতে খড়ি প্রাথমিক লেখাপড়া শেষ করে চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসা হতে ১৯৫৭ খ্রি আলিম ১৯৫৯ খ্রি. মেধা তালিকায় ১৬ তম স্থান অধিকার করে ফাযিল পাশ করেন। ১৯৬১ খ্রি. চট্টগ্রাম দারুর উলুম কামিল মাদ্‌রাসা হতে কামিল পাশ করেন। এরপর ১৯৬১ খ্রি. হতে ইন্তেকাল পর্যন্ত ৩২ বছরের অধিককাল পর্যন্ত চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতা করেন। তিনি মুছলিম শরীফ পড়তেন, মাদ্‌রাসায় লাইব্রেরিকে সমৃদ্ধ করেছেন। দীর্ঘদিন গভনিং বডির শিক্ষক প্রতিনিধি ছিলেন। মাদ্‌রাসার প্রাক্তন ছাত্র সংজ্ঞের উপদেষ্টা ছিলেন। চিরকুমার ছিলেন। ১৯৯৩ খ্রি ৮এপ্রিল বুধবার ইন্তেকাল করেন। পাঠদানে তাঁর তাহকীক ছিল অত্যন্ত উচু মানের, কামিল

১. মিয়া মুহাম্মদ গোলাম কবির, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১

শ্রেণি খোলার ব্যাপারে তারঁ স্মরণীয় অবদান আছে। তাঁর অসংখ্য খ্যাতিমান মেধাবী ছাত্র রয়েছে। ছাত্রদেরকে সহযোগিতা করতেন। পাঠদানে মূল বিষয়টি উপস্তাপন করতেন। তিনি শাহ সাহেবের এক নিষ্ঠ ভক্ত হয়ে সিরতুন্নবী(স:) মাহফিলের মেহমান খানার আলেমদরে ২০বছর সেবা করেন।[১]

মাওলানা শফিক আহমদ (র:)(১৯৪৪-২০১৭খ্রি.)

চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলার অধুনগর ইউনিয়নের হরিণা গ্রামে মাওলানা শফিক আহমদ (র:) ১৯৪৪ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা: মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ (র:) মাতা: নুরজাহান বেগম। তিনি চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদ্রাসা হতে ১৯৫৯খ্রি: দাখিল। ১৯৬৩ খ্রি: আলিম ও ১৯৬৫ খ্রি: ফাযিল ১ম বিভাগে পাশ করেন। ঢাকা সরকারী আলিয়া মাদ্রাসা হতে ১৯৬৭ খ্রি: ১ম বিভাগে মেধা তালকায় ১০ স্থান অর্জন করে কামিল পাশ করেন। ১৯৬৭ হতে ১৯৭১খ্রি: পর্যন্ত চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদ্রাসায় আরবি প্রভাষক ছিলেন। চুনতীর শাহ সাহেব (র:) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মসজিদে বায়তুল্লাহর ১৯৮২খ্রি. হতে ১৯৯৫খ্রি. পর্যন্ত খতিব ছিলেন। ১৯৮০ খ্রি. হতে ১৯৮৭ খ্রি. পর্যন্ত দুইবার আধুনগর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৭ জানুয়ারি ২০১৭ খ্রি. ইন্তেকাল করেন।

অসংখ্যা মানুষ তাঁর জানাযায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আলোকিত জ্ঞানের অধিকারী একজন সুবক্তা। আমিরাবাদ সুফিয়া ফাযিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁর সুললিত কণ্ঠের জ্ঞান সমৃদ্ধ বক্তৃতা শ্রুতাদেরকে প্রভাবিত করত। তিনি উঁচ্চাঙ্গের কবিতাও রচনা করেন।

তাঁর কবিতার সংকলিত কাব্যগ্রন্থ হল, তসল্লিয়াতে খাতের উর্দূ, অন্য বই হল- রহমতের ঝর্ণধারা গতিরোধ করছে কারা, হাদীছের আবরণে সত্যের বিচরণ।[২]

মাওলানা হাছন আলী ১৯৫০খ্রি.-২০১৫ খ্রি.

১. ড. হেলাউদ্দীন মোহাম্মদ নোমান, *চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদ্রাসা পাচঁ উজ্জল নক্ষত্র*, প্রকাশকাল: ২২ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রি., পৃ. ১১

২. মিয়া গোলাম কবির, প্রাগুক্ত,পৃ. ১৩২

চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলার পুটিবিলা ইউনিয়নের ১৯৫০ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। পিতা: সিকান্দর আলী (র:), মাতা- মরহুমা আছমা খাতুন। চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসা হতে ১৯৬০ খ্রি. দাখিল, ১৯৬৪ খ্রি. আলিম ও ১৯৬৬ খ্রি. ১ম বিভাগে ফাযিল পাশ করেন। চট্টগ্রাম দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসা হতে ১৯৬৮ খ্রি. কামিল হাদিস ১ম বিভাগে পাশ করেন। কক্সবাজার চকরিয়া আমজাদিয়া রফিকুল উলুম ফাযিল মাদ্‌রাসায় ১৯৬৯ খ্রি. সহকারী মাওলানা ছিলেন। একই পদে ১৯৬৯ খ্রি. জুন হতে ১৯৭১ খ্রি. ডিসেম্বর পর্যন্ত চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসায় ছিলেন। ১৯৭২ খ্রি. জানুয়ারি হতে ১৯৭৫ খ্রি. নভেম্বর পর্যন্ত সহকারী মাওলানা পদে কলাউজান দারুস সুন্নাহ আলিম মাদ্‌রাসায় ছিলেন। ১৯৭৫খ্রি. ডিসেম্বর হতে ১৯৮৯খ্রি. ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত পুটিবিলা ফাযিল মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা সুপার ছিলেন। ১৯৮৯খ্রি. আগস্ট ১৯৯১খ্রি. মে পর্যন্ত লোহাগাড়া ইসলামিয়া ফাযিল মাদ্‌রাসার উপাধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৯১খ্রি. জুন হতে ২০১০ খ্রি. এপ্রিলে অবসর গ্রহণ পর্যন্ত পুটিবিলা ফাযিল মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ ছিলেন।কামিলের ছাত্র অবস্থায় ১৯৬৮ খ্রি. চট্টগ্রাম চকবাজার জামে মসজিদের ২য় ইমাম ছিলেন।১৯৭২খ্রি. হতে ১৯৭৫খ্রি. পর্যন্ত কলাউজান খালদাদ খান জামে মসজিদ এবং ১৯৯২ খ্রি. হতে ২০০১খ্রি. পর্যন্ত লোহাগাড়া খান মোহাম্মদ সিকদার পাড়া জামে মসজিদের খতিব ছিলেন। লোহাগাড়া উপজেলার পুটিবিলা ইউনিয়নের ছুটার পাড়া বায়তুল আজম জামে মসজিদ ও নূরানী মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ১১মার্চ ২০১৫ খ্রি. ইন্তেকাল করেন। লোহাগাড়া উপজেলার কেন্দ্রস্থ বায়তুর রহমান জামে মসজিদের খতীব ছিলেন। তিনি সফল শিক্ষক দক্ষ প্রশাসক ও সংগঠক এবং সুবক্তা ছিলেন।[১]

হাফেজ মুহাম্মদ হারুনুর রশীদ (রহ:) (১৯৩৩খ্রি:-২০১৩খ্রি.)

চট্টগ্রামের সাতকানিয়া উপজেলার বারদোনা গ্রামে ১৯৩৩খ্রি. জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা: মরহুম আহমদ। ১৯৬১খ্রি. চুনতী হিফজ খানায় নিয়োগ পেয়ে শাহ সাহেব (র:) এর কাছে থেকে আজীবন সেবা করেন। তিনি সিরাতুন্নবী (স:) এর শুরু থেকে ইন্তেকাল পর্যন্ত সিরাতুন্নবী (স:) এর সেবা করেন। সুদিনে দুর্দিনে সিরতের কাজ থেকে কোন সময় বিরত থাকেন নি। ঠাণ্ডা

১. ড. সাইয়েদ মুহাম্মদ আবু নোমান, *ইসলামী জ্ঞান- বিজ্ঞান প্রচার ও প্রসারে চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলিয়া মাদরাসার অবদান*, প্রকাশক: জনাব আলহাজ্ব আবুল "কালাম, প্রকাশকাল: ২০১৭, পৃ.৩০৩

মাথায় জটিল এবং কঠিন কর্মযজ্ঞ আনজাম দিতেন। শাহ সাহেব (র:) তাঁকে বেশি ভালবাসতেন। শাহ সাহেব (র:) এর সাথে ১৯৭৬ খৃস্টাব্দে হজ্জ করেছিলেন। দক্ষ সংগঠক ও কর্মী ছিলেন। ২০১৩ সালে এই মনিষী ইন্তেকাল করেন।[১]

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আমিন (র:) (১৯২২খ্রি.-২০০১ খ্রি.)

চট্টগ্রামের সাতকানিয়া উপজেলার বাবুনগর গ্রামে ১৯২২খ্রি. জানুয়ারি মাসে মাওলানা মুহাম্মদ আমিন (র:) জন্মগ্রহণ করেন। পিতা- মুন্সী হাশমত উল্লাহ, মাতা: সুফিয়া খাতুন। ১৯৩৬ খ্রি. হতে ১৯৩৭খ্রি. পর্যন্ত গারাংগিয়া ইসলামিয়া কামিল মাদ্‌রাসায় অধ্যয়ন করেন। ১৯৩৮ খ্রি. হতে ১৯৪২খ্রি. পর্যন্ত কলিকাতা মাদ্‌রাসায়ে কুদসিয়া এবং সাতকানিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসায় শিক্ষা লাভ করেন। ১৯৪২খ্রি. চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে ১৯৪৪খ্রি. অবিভক্ত বাংলায় সরকারী স্কলারশীপ নিয়ে ৯ম স্থান অধিকার করে আলিম ও ১৯৪৬ খ্রি. ১ম বিভাগে ফযিল পাশ করেন। ১৯৪৭ খ্রি. দেওবন্দ দারুল উলুম আলীয়া মাদ্‌রাসায় দাওরায়ে হাদিসে ভর্তি হয়ে ফাইনাল পরীক্ষায় ৩য় স্থান অধিকার করেন। ১৯৫০খ্রি. হতে ১৯৬১খ্রি. গারংগিয়া ইসলামিয়া কামিল মাদ্‌রাসায় সিনিয়র শিক্ষক, ১৯৬১ খ্রি. হতে ১৯৬৩ খ্রি. চট্টগ্রাম জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসায় হেড মাওলানা ১৯৬৪খ্রি. হতে ১৯৯১খ্রি. চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসার মুহাদ্দিস হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আবসর নেন। ১৯৯৩খ্রি. হতে ২০০০খ্রি. পর্যন্ত গারাংগিয়া ইসলামিয়া কামিল মাদ্‌রাসায় শায়খুল হাদিস ছিলেন। চট্টগ্রাম পাঁচলাইশ ওয়জেদিয়া কামিল মাদ্‌রাসায় ও কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। তিনি মোট ৫৪ বছর শিক্ষকতা করেন।

তিনি *সিহাহ সিত্তাহ, বাইজাভী শরীফ, ইতকান, ফজুল কবির, হিদায়া, মিশকাত শরীফ, জালালাইন শরীফ, শরহে আকঈদ নসফী, সুল্লমুল উলুম, মুয়াল্লাকা,মুখতাসারুল মায়ানী* ইত্যাদি পাঠ দান করতেন। তিনি প্রখর স্মৃতি শক্তি বা ধিশক্তি মেধার অধিকারী ছিলেন। পাঠদানে পারদর্শী ছিলেন। ১২ জানুয়ারী'২০০১খ্রি. দিবাগত রাত ৩.৩০মিনিটে ৭৯বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তাঁর উর্দু ভাষায় রচিত গ্রন্থ *ইনআমুল বারী' ফি শরহিল বুখারী* (কিতাবুল

১. মিয়া মুহাম্মদ গোলাম কবির, পূর্বোক্ত,পৃ:১২৯।

মগাযী ওয়াত তাফসীর) ভারতে দেওবন্দ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি স্বভাবজাত অসাধারণ কবি ছিলেন। ১৯দিন ব্যাপী সিরাতুন্নবী (স:) মাহফিলের চঞ্চালক ছিলেন।[১]

মাওলানা মাহফুজুর রহমান ছিদ্দিকী (১৯২৬ খ্রি.)

চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া উপজেলার চুনতী গ্রামে ১৯২৬খ্রি. মাওলানা মাহফুজুর রহমান ছিদ্দিকী জন্মগ্রহণ করেন। পিতা: মাওলানা গোলাম মোস্তফা চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসা হতে ১৯৪৮ খ্রি. ফাজিল পাশ করেন। ১৯৪৮ খ্রি. ও ১৯৪৯ খ্রি. দু'বছর অধ্যয়ন করার পর ১৯৫০ খ্রি. মমতাজুল মুহাদ্দিসীন ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি বিজ্ঞ আলেম ও সফল ব্যবসায়ী ও সমাজ সেবক ছিলেন। ১৯৫০ খ্রি. হতে ৫৫বছর পর্যন্ত একটানা চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসার গভর্নিং বড়ির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও সেক্রেটারি ছিলেন।[২]

মাওলানা মুহাম্মদ মুছলিম খান (রঃ)- (১৯৩৩ খ্রি.-২০০৭ খ্রি.)

চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া উপজেলার চুনতী গ্রামে ১৯৩৩ খ্রি. ২৭মে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা: আব্দুস সোবহান, মাতা: মরহুমা কমর নিগার বেগম। চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসা হতে ১৯৫০খ্রি. দাখিল, ১৯৫২খ্রি. আলিম, ১৯৫৪ খ্রি. গারাঙ্গিয়া ইসলামিয়া কামিল মাদ্‌রাসা হতে মেধা তালিকায় ৭ম স্থান অধিকার করে ফাজিল পাশ করেন। তারপর চুনতী মাদ্‌রাসায় স্বেচ্ছা সেবামূলক ফাযিল ক্লাসে আরবি সাহিত্য, ফিকহ ও উসুলে ফিকাহ ইত্যাদি পাঠ দান করেন। চট্টগ্রাম কাজেম আলী উচ্চ বিদ্যালয় হতে ১৯৫৬ খ্রি. মেট্রিক এবং চট্টগ্রাম সরকারী কমার্স কলেজ হতে ১৯৫৮ খ্রি. আই.কম পাশ করেন। কীর্তিমান খেলোয়াড় এবং দক্ষ ও নিরেপক্ষ রেফারী ছিলেন, ১৯৫৭ খ্রি. চট্টগ্রামের আন্দরকিল্লায় হাবিব প্রিন্টিং প্রেস, হিল সাইড ট্রেডার্স নামে ব্যবাসা প্রতিষ্ঠনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসার গভর্নিং বডির ১৯৬২ খ্রি.-২০০৫ খ্রি. পর্যন্ত ৪৪বছর সদস্য ছিলেন। চুনতী ১৯দিন ব্যাপী সিরাতুন্নবী (স:) মাহফিলের মতোয়াল্লী কমিটির আমরন সদস্য ছিলেন। ৭অক্টোবর ২০০৭খ্রি. ৭৪বছর বয়সে

---

১. আনজুমান' ২০০৬, *চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসা* (চট্টগ্রাম: প্রকাশকাল ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ৬৮-৭১

২. আনজুমান' ২০১০, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১

ইন্তেকাল করেন। তিনি অসমান্য মেধার অধিকারী ইসলামী চিন্তাবিদ, নিরব গবেষক, সফল ব্যবসায়ী ও সমাজ সেবক ছিলেন।[১]

মাওলানা আবুল বারাকত ফজল্লাহ (র:) (১৮৯৮ খ্রি.-১৯৭৯ খ্রি.)

মাওলানা ফজলুল্লাহ (র:) চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলার মাদার্শা ইউনিয়নের বাবুনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা-নুরুল হুদা। ১৯১৯ খ্রি. চট্টগ্রাম মুহসিনিয়া ফাযিল মাদরাসা হতে কৃতিত্বের সাথে ফাজিল পাশ করে ১৯২৩ খ্রি. ভারতের মাযাহির উলুম সাহরানপুর হতে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে বুৎপত্তি অর্জন করেন। ১৯২৩ খ্রি. হতে ১৯৪২ খ্রি. পর্যন্ত কলকাতা আকাড়া আলিয়া মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ ছিলেন। দেশে ফিরে ইন্তেকাল পর্যন্ত চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসার নাযেমে আলা ছিলেন। এছাড়াও তিনি সাতকানিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা ও পদুয়া হেমায়তুল ইসলাম মাদ্‌রাসার পরিচালক ছিলেন। আরবি, উর্দু, ফার্সি ও বাংলা ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। স্বভাব কবি ছিলেন। চুনতী ১৯দি ব্যাপী সিরাতুন্নবী (স:) এর রুপকার ছিলেন। বঙ্গানুবাদ শামায়েল তিরমিজী, কশফুল জালালাইন উর্দু, শরহে ঈসাগুজী উর্দু, আদদুরুসুস সরফিয়্যাহ উর্দু বঙ্গানুবাদ কসীদা বুরদা, বঙ্গানুবাদ গুলজারে সুন্নত, আল ইনাসাফ বাংলা, আহসান উর্দু তালীম, বাঙ্গানুবাদ শিকওয়া ওয়া জওয়াবে শিকওয়া ইত্যাদি তাঁর অনন্য প্রকাশনা। ১৯৭৯ খ্রি. এই মনিষী ইন্তেকাল করেন। শাহ সাহেব (র:)-এর ইচ্ছানুযায়ী চুনতীতে তাঁকে দাফন করা হয়।[২]

অধ্যক্ষ মাওলানা কাজী মুহাম্মদ নাছির উদ্দীন (১৯৫২ খ্রি.)

চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া উপজেলার আধুনগর গ্রামে ১৯৫২খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। পিতা: মরহুম হাফেজ হামিদ উদ্দীন মাতা: মরহুমা নুরজাহান বেগম। পারিবারিক পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসা হতে ১৯৬২ খ্রি. দাখিল ১৯৬৬ খ্রি. আলিম ও ১৯৬৮ খ্রি. ফাযিল পাশ করেন। ১৯৭০ খ্রি. চট্টগ্রাম দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসা হতে কামিল পাশ করেন। রসুলাবাদ ইসলামিয়া ফাযিল মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতার মাধ্যমে তাঁর

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১

২. *আল্লামা ফজলুল্লাহ (র:) এক অনন্য সাধারণ প্রতিভা*, প্রকাশক: আল্লামা ফজলুল্লাহ (র.) ফাইন্ডেশন,চট্টগ্রাম, প্রকাশকাল: নভেম্বর ২০০৩ খ্রি., পৃ. ১৫৫-১৫৬

কর্মজীবন শুরু হয়। আধুনগর আখতারিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা, চরতি মুহাম্মদিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা, চন্দনাইশ বরমা ইসলামিয়া মাদ্‌রাসার সুপার ছিলেন। বাশঁখালী পশ্চিম বরঘোনা রহমানিয়া ফাযিল মাদ্‌রাসা, কেরানীহাট ইসলামিয়া ফাযিল মাদ্‌রাসা পটিয়া ইয়াছিন আউলিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ ছিলেন। এসব প্রতিষ্ঠানে চাকরীর চেয়ে মাদ্‌রাসার অগ্রগতি ও সরকারি করনে ভূমিকা রেখেছেন। এছাড়াও অসংখ্য মাদ্‌রাসা ও মসজিদের নানামুখী উন্নয়নে তিনি স্বরনীয় অবদান রেখে চলেছেন। বিশেষ করে চুনতী হাকিমিয়া কামিল (অনার্স-মাস্টার্স) মাদ্‌রাসার কামিল স্তরে উন্নীত করতে অনন্য অগ্রণী ও উল্লেখযোগ্য ভুমিকা রাখেন। ফাযিল অনার্স এবং কামিল পরীক্ষা কেন্দ্র ও মাস্টার্স করার উদ্যেগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেন। মাদ্‌রাসার দক্ষিণের সীমানায় বি.এস ১৮০০ খতিয়ান দাগের জমি ক্রয় করে ০৪ তলা ভবন নির্মাণ, উত্তরের সীমানায় ০৪ তলা বিজ্ঞান ও লাইব্রেরী ভবন নির্মাণ, পূর্বে অনার্স ভবনের পাশে সীমানা বিরোধ মিঠিয়ে জমি দখল করে সীমানা নির্ধারণ করে সরকারী ভবেনর জায়গা নির্ধারণ ও ভিত্তি স্থাপন করেন। দুর্লভ অসংখ্য কিতাব সহ রেক সংগ্রহ করে শাহ সাহেব (র:) ও মাদ্‌রাসার জমিদাতা এস্তেফাজুর রহমান রহমান খান (র:) এর নামে সমৃদ্ধ লাইব্রেরী, জেনারেটর ও ফটোস্ট্যাট মেশিন, যুগ শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা আব্দুর রশীদ (র:) এর নামে সড়কের নাম করণ এবং ইটের রাস্তা ও শাহ নজির আহমদ (র:) হলেন তৃতীয় তলার ব্যবস্থা করেন। হিজরী নববর্ষ উদযাপনের আলোচনা সভা চালু করেন ইত্যাদি মাদ্‌রাসা কেন্দ্রীক তার অবদান লিখে শেষ করা যাবে না। জনশ্রুতি আছে চুনতী মাদ্‌রাসার এমন কোন স্তর নেই তাঁর অবদান নেই। মাদ্‌রাসার স্বার্থে বিভিন্ন জটিল ও কঠিন কাজ সমাধান দুর্যোগের দিনে কান্ডারীর ভূমিকা, গর্ভনিং বডির প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে মিটিংয়ে স্বরণীয় অবদান রাখেন। মাদ্‌রাসার প্রাক্তন ছাত্র সমিতি আঞ্জুমনে তোলাবায়ে সাবেক্বীনের দুই মেয়াদে সভাপতি নির্বাচিত হয়ে নানবিধ উন্নয়নে ভুমিকা রাখেন বিশেষ করে এই সংগঠনের উদ্দ্যোগে ২০১০ খ্রি. চুনতি মাদ্‌রাসার ঐতিহাসিক ২০০ বছর পূর্তি উদযাপন বাস্তাবায়ন ও এই উপলক্ষে বিশেষ ঐতিহাসিক স্মরনিকা আঞ্জুমান এর বাণী সংগ্রহ ও প্রকাশে স্বরণীয় ও বলিষ্ঠ অবদান রাখেন।

এছাড়া আধুনগর আখতারিয়া দাখিল মাদ্‌রাসাকে দাখিল, আধুনগর ইসলামিয়া ফাযিল (ডিগ্রি) মাদ্‌রাসাকে এবতেদায়ী হতে কামিল, বায়তুশ শরফ আর্দশ কামিল (অনার্স-মাস্টার্স)

মাদ্‌রাসাকে দাখিল হতে কামিল, বড়হাতিয়া এশাতুল উলুম ফাযিল ডিগ্রি মাদ্‌রাসাকে ফাযিল, দক্ষিণ সুখছড়ি খালেকিয়া ফাযিল মাদ্‌রাসাকে আলিম, কলাউজান খতিবিয়া দাখিল মাদ্‌রাসাকে দাখিল, বারদোনা রেফারিয়া দাখিল মাদ্‌রাসাকে দাখিল, পটিয়া হুলাইন ইয়াছিন আউলিয়া আলিম মাদ্‌রাসাকে আলিম। চন্দনাইশ বরমা ইসলামিয়া আলিম মাদ্‌রাসাকে আলিম, বোয়ালখালী শাকপুরা মাদ্‌রাসাকে কামিল, শাহারবিল আনওয়ারুল উলুম ফাযিল মাদ্‌রাসাকে কামিল ও বারবাকিয়া পেকুয়া ফাঁসিয়খালী ইসলামিয়া ফাযিল মাদ্‌রাসাকে তফসীর বিভাগে কামিল, গারাংগিয়া ইসলামিয়া কামিল মাদ্‌রাসাকে তৎকালিন মাদ্‌রাসার সেক্রেটারী চট্টগ্রামের পাথরঘাটা নির্বাসী আলহাজ্ব মনির আহমদের অনুরোধে কামিল, রশিদের ঘোনা হাফেজিয়া ইবতেদায়ী মাদ্‌রাসাকে মকতব হতে এবতেদায়ীতে উন্নীত করেন। কক্সবাজার বাইতুশ শরফ শাহ কুতুব উদ্দীন আদর্শ মাদ্‌রাসাকে দাখিল করেন।

এছাড়া আধুনগর গুলজার বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় বর্তমান স্থানে রাখতে ভুমিকা রাখেন। সুফি মিয়াজী পাড়া জামে মসজিদ, হাতিয়ারপুল জামে মসজিদ, চুনদতী মিরখিল মাওলানা পাড়া জামে মসজিদে জুমা চালু করেন,উত্তর আধুনগর আকবর পাড়া মজিদিয়া ছিদ্দিকিয়া জামে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। চুনতী হাফেজীয়া রহমানিয়া হিফজখানাকে অস্তিত্বে এনে সার্বিক উন্নয়নের মাধ্যমে ব্যতিক্রমধর্মী, অনন্য, উন্নত ও আদর্শ হিফজখানা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। সার্বিক অবদান বিবেচনায় এ হিফজখানার রূপকারদের একজন বললে অধ্যুক্তি হবে না। বড়হাতিয়া আয়েশা ছিদ্দিকা মহিলা দাখিল মাদ্‌রাসার জায়গা ক্রয় করে বিল্ডিং নির্মাণের ব্যবস্থা করেন। নোয়াখালী সোনইমুড়ী আমকী মহিলা আলিম মাদ্‌রাসাকে দাখিল ও আলিম করেন। বায়তুশ শরফ দরবারের প্রচার-প্রসার জনমত গঠন ও সার্বিক উন্নতিতে উল্লেখযোগ্য জীবন্ত কিংবদন্তি তুল্য অসংখ্য স্বরণীয় অবদান রাখেন। তিনি চুনতী সরকারী মহিলা কলেজের গভর্নিং বড়ির অভিভাবক সদস্য ও বড়হাতিয়া এশাতুল উলুম ফাযিল মাদ্‌রাসার গর্ভনিং বডির সভাপতি হিসেবে সুদিনে দুর্দিনে পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করে সার্বিক উন্নয়নে স্বরণীয় অবদান রেখে ছিলেন। এছাড়াও তিনি অরাধ্য অসাধ্য কর্মকযজ্ঞ সাধন করেছেন যার বর্ণনা কলেরব বৃদ্ধির কারণে করা যাচ্ছে না।

ব্যক্তিগত জীবনে কুতুবে আলম আব্দুস সালাম আরকানী (র:) বায়তুশ শরফের হযরত কেবলা মীর মুহাম্মদ আখতার (র:), গারাংগিয়ার বড় হুজুর ও ছোট হুজুর (র:), বায়তুশ শরফের পীর

সাহেব কেবলা শাহ মুহাম্মদ আব্দুল জব্বার (র:), শাহ বদিউর রহমান আরকানী (র:), সৈয়দ আব্দুল করিম আল মাদানী (র:), সৈয়দ আব্দুল আহাদ আল মাদানী (র:) যুগশ্রেষ্ঠ ওয়ায়েজ সাতকানিয়া বারদোনা নিবাসী ফখরুল মুহাদ্দেসীন মাওলানা আমিন উল্লাহ (র:) , মাওলানা মোবারক আহমদ (র:)সহ অসংখ্য আলেম ওলামা, পীর মশায়েখদের সান্নিধ্যে ছিলেন।

১৯৭৫-১৯৮৩ খ্রি. পর্যন্ত হযরত শাহ সাহেব (র:) চুনতীর একনিষ্ঠ খাদেম ছিলেন। তার সফর সঙ্গী হয়ে ১৯৭৬ ও ১৯৭৯ খ্রি. দুইবার হজ্জ করেন। ১৯৭৯ খ্রি. সরকারী ভাবে রাষ্টপতির বিশেষ প্রতিনিধি হয়ে হজ্জ করেন।

১৯দিন ব্যাপি সিরতুন্নবী (স:) ও মেরাজুন্নবী (স:) মাহফিলের প্রচার প্রসার এবং বিভিন্ন জঠিল কাঠিন সমস্যা সমাধানে স্বরণীয় অবদান রেখে চলেছেন। হযরত শাহ সাহেব (র:) চুনতী ইসালে সাওয়াব মাহফিল জিয়াফত হতে মাহফিলে রুপ দিয়ে অধ্যবধি সুচারুরূপে পরিচালনা করে চলেছেন। তিনি প্রখর মেধা ও সৃতি শক্তির অধিকারী কোন বিষয় একবার পড়লে আর ভুলতেন না । প্রজ্ঞাবান সুবক্তা হিসেবে সুপরিচিত, তাঁর বক্তৃতা মানুষের উপর যাদুর মত প্রভাব বিস্তার করে। বক্তৃতা কালে অমূল্য কবিতার উদৃতি মূল আর্কষণ। শহীদ এডভোকেট সাইফুল ইসলাম আলিফ দাখিল মাদরাসা প্রতিষ্ঠার উদ্দ্যেগ নেন। অসংখ্য প্রতিষ্ঠান সরকারী করণে স্বরণীয় অনন্য সাধারণ অবদান রেখেছেন। ০৭ ইউনিয়নের নিকাহ রেজিষ্ট্রার এবং কাজী ছিলেন। চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসার গভর্নিং বডির দীর্ঘদিন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। চুনতী সিরতুন্নবী(স:) মাহফিলে মতওয়াল্লী কামিটির সহ সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। তিনি ৩ পুত্র ও ৭ কন্যার জনক। তিনি বায়তুশ শরফের পীর সাহেব শাহ মাওলানা কুতুব উদ্দীন(র:) এর ভাগিনা ও ভাইপো।[১]

ড. ঈসা শাহেদী (১৯৬০ খ্রি.)

ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী ০১ ডিসেম্বর ১৯৬০ খ্রি. চট্টগ্রামের লোহাগাড়া পশ্চিম কলাউজানে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা : এলাহী বকস, মাতা: সিরাজ খাতুন। চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসা হতে ১৯৭১ খ্রি. দাখিল, ১৯৭৩ খ্রি. আলিম, ১৯৭৫ খ্রি. ফাযিল পাশ করেন, চট্টগ্রাম

১. মাওলানা মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, *শিক্ষা ও সমাজ সেবায় বায়তুশ শরফের অবদান* (চট্টগ্রাম : বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ২৮ নভেম্বর ২০১৭ খ্রি.), পৃ.২২৬-২২৭

দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসা হতে কামিল পাশ করেন। ১৯৮০ খ্রি. মাদ্‌রাসা ই- আলিয়া ঢাকা হতে কামিল (ফিকহ) পাশ করেন। ১৯৯৪ খ্রি ঢাকা তেজগাঁও কলেজ হতে বি.এ পরিক্ষায় ১ম শ্রেণিতে ৭ম স্থান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হতে ১৯৯৬ খ্রি. এম.এ প্রিলিমিনারি, ১৯৯৭ খ্রি. এম.এ ফাইনাল পরীক্ষায় ১ম শ্রেণিতে ১ম স্থান অধিকার করেন। ২০১০ খ্রি. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। লোহাগাড়া ইলামিয়া ফাযিল মাদ্‌রাসার হেড মাওলানা ছিলেন। তিনি ইসলামী রাজনীতির সাথে জড়িত। ১৯৮১ হতে ১৯৮২ খ্রি. পর্যন্ত মাসিক দ্বীন দুনিয়ার সহকারী সম্পাদক, বায়তুশ শরফ আর্দশ কামিল মাদ্‌রাসার শিক্ষক ও বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পরিচালক ছিলেন। ১৯৮২ খ্রি. ইরানের রাষ্ট্রিয় মেহমান হিসাবে তেহরান গিয়ে ১৯৮৩-১৯৮৯ খ্রি. পর্যন্ত রেডিও তেহরানের সাহকারী পরিচালক ছিলেন। এসময় ইমাম খোমেনীর সাথে দুবার সাক্ষাত করেন। ২০০৪ হতে ২০০৫ পর্যন্ত জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। একজন ইসলামী চিন্তাবিদ লেখক ও গবেষক হিসাবে তাঁর সুখ্যাতি রয়েছে। তার ২০টিরও অধিক গ্রন্থ রয়েছে। বহু প্রবন্ধ দেশ বিদেশের বিভিন্ন পত্রিকা ও জার্নালে প্রকাশিত হয়। তিনি ০২ছেলে ও ০৫ মেয়ের জনক।[১]

মাওলানা মাহমুদুল হক খতিবী (১৯০৭- ১৯৮৬ খ্রি.)

মাওলানা মাহমুদুল হক খতিবী চট্টগ্রামের বিখ্যাত খতীব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা- ওবায়দুল মান্নান ১৯৩২ খ্রি. কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসা হতে মমতাজুল মুহাদ্দেসীন ডিগ্রি লাভ করেন। মায়ানমার আরকাটি মসজিদের খতিব ও মুফতী ছিলেন।

গারাংগিয়ার বড় হুজুর হযরত মাওলানা আব্দুল মজিদ (র:) এর খলীফা ছিলেন। সাড়াজাগানো ওয়ায়েজ ছিলেন। চট্টগ্রাম আলংকরণ জামে মসজিদের খতীব ছিলেন। হাফেজুল হাদীস নামে খ্যাত ছিলেন। পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রীয়ভাবে অংশ নেন। এবং কলাউজান ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। পাশ্চিম কলাউজান খতিবিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মুজাহিদ ছিলেন। অনেক অনৈসলামিক ও অসমাজিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তোলেন।১ শাহ সাহেব (র:) এর সাথে তাঁর ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল।[২]

---

১. মাওলানা মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০-২২১

২. ড. হেলাল উদ্দীন মুহাম্মদ নোমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫-১৫৬

শাহ মাওলানা মুহাম্মদ কুতুব উদ্দীন (রঃ) (১৯৪২খ্রিঃ-২০২০খ্রি.)

শাহ মাওলানা মুহাম্মদ কুতুব উদ্দীন (রঃ) চট্টগ্রামের লোহাগাড়া আধুনগর ইউনিয়নের সুফী মিয়াজী পাড়ায় ১৯৪২ খ্রি. ১ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা- মাওলানা মুছলেহ উদ্দীন মাতা: রায়হানা বেগম চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসা হতে ১৯৫৩ খ্রি. দাখিল ১৯৫৫ খ্রি. আলিম ১ম বিভাগ (১৫শ স্থান) এবং ১৯৫৭ খ্রি. ফাযিল ১ম বিভাগে মেধা তালিকায় ৫ম স্থান। চট্টগ্রাম দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসা হতে ১৯৫৯ খ্রি. কামিল ১ম শ্রেণিতে ১ম স্থান লাভ করে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। অতঃপর তিনি ১৯৫৯ খ্রি. - ১৯৭৬ খ্রি. পর্যন্ত রাসূলুল্লাহাবাদ ফাযিল মাদ্‌রাসার সুপার ছিলেন। ১৯৮৯খ্রি.-১৯৯৭ খ্রি. পর্যন্ত বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল মাদ্‌রাসার উপাধ্যক্ষ এবং ১৯৯৭ খ্রি.-২০০৩ খ্রি. পর্যন্ত অধ্যক্ষ ছিলেন। কামিল শ্রেণিতে তিনি *তিরমিযী শরীফ* ও *বোখারী শরীফ* পড়াতেন। ২০০০খ্রি. জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান নির্বাচিত হন। ১৯৯৮ খ্রি. এপ্রিল হতে ২০২০ খ্রিস্টাব্দের মে পর্যন্ত বায়তুশ শরফের পীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের শরিয়া কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ছিলেন। বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল মাদ্‌রাসা ও চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসার সহসভাপতি ছিলেন। ৫২ বার হজ্জ করেছেন। বিভিন্ন দেশে সফর করেছেন। তাঁর লিখিত ও প্রকাশিত গ্রন্থ হলো- *জান্নাতী ও জাহান্নমী যারা*, *বেশারতুল ইখওয়ান ফি খাওয়াচ্ছিল কুরান*, *দোয়ায়ে মুস্তাজাকাত*, *কিতাব ও সুন্নাহর আলোকে তরিকতের মূলনীতি*, *গুলহায়ে আকিদত*। তিনি বিজ্ঞ আলিম, মুহাদ্দিস, স্বভাব কবি, সমাজ সেবক ইসলামী চিন্তাবিদ ও পীরে কামেল, বাহরুল উলুম (জ্ঞানের সাগর) হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন।[১]

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০১

পঞ্চম অধ্যায়

শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিকাশে শাহ মাওলানা হাফেজ আহমদ (রঃ)

পঞ্চম অধ্যায়

শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিকাশে শাহ মাওলানা হাফেজ আহমদ (র:)

প্রথম পরিচ্ছেদ : শিক্ষা ও নৈতিকতা প্রসারে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপন

মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা

মাদ্‌রাসা শিক্ষা বলতে কুর'আন ও হাদীস, ইসলামী বিধিবিধান ও সংস্কৃতি, আরবি, বাংলা, ইংরেজি, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, সমাজ, কম্পিউটার অর্থনীতিসহ আধুনিক বিষয় শিক্ষাকেই বুঝায়। ইসলামী শিক্ষার মত মাদ্‌রাসা শিক্ষাও প্রচীন।

রাসূলল্লাহ (স:) নিজেই জিব্রাইল (আ:) এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে শিক্ষা নিয়েছিলেন। তারপর রাসূলল্লাহ (স:) সাফা পাহাড়ের পাদদেশে হযরত আরকাম (রা:) এর বাড়িতে দারে আরকামে শিক্ষা গ্রহণ করে নব দিক্ষিত মুসলামনদেরকে শিক্ষা দেন। হযরত 'উমর (রা:) ইসলাম গ্রহণ পর্যন্ত এখানে গোপনে ইসলামের শিক্ষা দিতেন। হযরত 'উমর (রা:) ইসলাম গ্রহণ করার পর মুসলমানরা যেখানে ইচ্ছা মুসলমানরা একত্রিত হত। রাসূলল্লাহ (স:) এই মাদরাসার মহাপরিচালক, আবু বকর (র:) 'উমর (র:), ওসমান (রা:) আলী (রা:), হযরত হামজা (রা:) এবং ইসলামের প্রথম যুগের প্রায় সকলই এই মাদ্‌রাসার শিক্ষার্থী। পরবর্তীতে এরাই ইসলামী শিক্ষার প্রসার ঘটিয়েছেন। হযরত আরকম (রা:) প্রবীণ ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন তিনি সাত বা দশজন পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। বদর, ওহুদ এবং অন্যান্য গাযওয়ায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি হযরত মুয়াবিয়া (রা:) এর খিলাফতের সময় ৫৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। হিজরতের পর মসজিদে নববীতে স্থাপিত হয় তাও মাদরাসা যার নাম আহলে সুফ্‌ফা বা আসহাবে সুফ্‌ফা। এখানে মহানবি (স:) কুর'আন ও হাদীস ও ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা দিতেন। মহানবী (স:) প্রাথমিক চিকিৎসা, বংশ শাস্ত্র, তাজভীদ অশ্ব চালনার জন্য বিভিন্ন গোত্রের মুসলমানদের কাছে পাঠিয়ে ছিলেন। মক্কা বিজয়ের পর মসজিদে বুনিয়াদী ইসলামী শিক্ষার জন্য মহানবী (স:) ওয়ালিদের নির্দেশ দেন। রাসূলল্লাহ (স:) ইন্তেকারের পর খোলাফায়ে রাশেদীন বিশেষ করে 'উমর (রা:) ও ওসমান (রা:) নতুন নতুন

মসজিদ তৈর করে ইসলামী শিক্ষা প্রসারে ব্যাপক প্রচেষ্টা চালান। হযরত 'উমর মসজিদের শিক্ষকদের রাষ্ট্রীয় কোষাগার হতে বেতন নির্ধারণ করে দেন। উমাইয়া আমলে হযরত 'উমর ইবনে আব্দুল আজীজ ইলমে হদীস সংগ্রহের উদ্দ্যেগের মাধ্যমেই সরকারীভাবে আনুষ্ঠানিক মাদ্‌রাসা শিক্ষা শুরু হয়।

আব্বাসীয় আমলে খলীফা মামুনের শাসনামলে হাজার হাজার মসজিদে পাঠদানের বিপ্লব হয়েছিল। বাগদাদের বায়তুল হিকমা সেই সময়ে ফতেময়ীয় খেলাফত (৯০৯-১১৭১ খ্রি.) এবং স্পেনে উমাইয়া খলীফা তৃতীয় আব্দুর রহমানের যুগে শ্রেষ্ঠ মাদ্‌রাসাগুলো গড়ে উঠে। আব্বাসীয় যুগে উজির খাজা নিজামুল মুলক এবং ফাতেমীয় খলীফা কর্তৃক মিশরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়

প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলার শাসক ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজি ১১৯৭ মতান্তরে ১২০১ খ্রিস্টাব্দে বহু মসজিদ, মাদ্‌রাসা খানকা স্থাপন করেন। সুলতান প্রথম গিয়াসউদ্দনি ১২১২ খ্রিস্টাব্দ হতে ১২২৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত একটি সুবম্য মসজিদ, মাদ্‌রাসা সরাই খানা স্থাপন করেন। তিনি জ্ঞানী-গুণীদের বিশেষ সম্মান করতেন। সুলতান গিয়াস উদ্দীন বলবন এর শাসনামলে বাংলার বিখ্যাত সুফী শেখ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামাও বাংলাদেশের সোনারগাঁওয়ে মসজিদের পাশে মাদ্‌রাসা ও খানকা প্রতিষ্ঠা করেন। কালক্রমে এটি বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্রে পরিণত হয়। এখানেই সহীহাইনের শিক্ষাদান শুরু হয়। পরে বিভিন্ন স্থানে এধারা প্রসার লাভ করে। পরবর্তীতে সুলতান দ্বিতীয় গিয়াস উদ্দীন মাহমুদ শাহও জ্ঞানীগুণীদের সম্মান করতেন। তিনি "দরসে বাড়ি" নামে একটি মাদ্‌রাসা নির্মাণ করেন। হোসেন শাহ ও নুসরত শাহ গৌড়ে বেশ কয়েকটি মাদ্‌রাসা স্থাপন করেন। যার ধ্বংসাবশেষ এখনও আছে। ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে হুগলীতে মুহসিনিয়া মাদ্‌রাসা নামে ২য় মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। আরবি, ইংরেজী, গণিত, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় এখানে শিক্ষা দেয়া হয়। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের পর মাদ্‌রাসা শিক্ষা স্বতন্ত্ররূপ লাভ করে বর্তমান অবস্থায় পৌছে।[১]

শুরু থেকেই সুনাগরিক ও আলোকিত মানুষ তৈরীতে মাদ্‌রাসা শিক্ষা অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে। শাহ সাহেব (র:) তা উপলব্দি করে চট্টগ্রামে অনেক মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা ও পৃষ্ঠপোষকতা করেন। নিম্নে তা আলোচনা করা হল।

---

১. মুহাম্মদ মাহববুর বহমার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৭

১. চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসাকে কামিল শ্রেণিতে উন্নিত করণঃ

চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলায় অবস্থিতি বালাকোটের যুদ্ধের গাজী হযরত মাওলানা আব্দুল হাকীম (র:) ১৮১০ খ্রিস্টাব্দে চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠার পর হতে বিভিন্ন চরাই উতরাই ঘাত প্রতিঘাত পেরিয়ে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে চুনতী মাদ্‌রাসাকে ফাযিল শ্রেণি হতে কামিল শ্রেণিতে উন্নিত করার উদ্যেগ গ্রহণ করেন হযরত শাহ সাহেব (র:)। এই ব্যাপারে হযরত মাহ সাহেব (র:) এর একনিষ্ঠ খাদেম হযরত মাওলানা অধ্যক্ষ কাজী মাওলানা নাছির উদ্দীন (ম.জি.আ) এর বর্ণনায় পাওয়া যায়- হযরত শাহ সাহেব (র:) মাদ্‌রাসার অফিসে অধ্যক্ষের চেয়ারে বসে পশ্চিম দিকে মুখ করে প্রায় বলতেন, 'এখান হতে মদিনা শরীফ পর্যন্ত পর্দা তুলে ফেলেছি। আমি রাসূলল্লাহ (স:) হতে দুটি জিনিসের অনুমতি নিয়েছি। এক. সিরাতুন্নবী (স:) মহফিল। দুই. চুনতী মাদ্‌রাসাকে কামিল হাদীস খোলা। সেই সময় শাহ সাহেব (র:) মাদ্‌রাসার গভর্নিং বডির সভাপতি, মাওলানা হাবিব আহমদ (র:) অধ্যক্ষ, মাওলানা মুছা উপাধ্যক্ষ, নাজেম আ'লা ফজলুল্লাহ (র:) ছিলেন। তৎকালীন মাদ্‌রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান বাক্বি বিল্লাহ ও পরিদর্শক মুহাম্মদ ঈসা মাদ্‌রাসা পরিদর্শনে আসলে তৎকালীন উপরষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সত্তারের নির্দেশে একই উপজেলার আমিরাবাদ সুফিয়া মাদ্‌রাসা পরিদর্শন করেন। সেখানে ৭২ সেট কামিল হাদীসের কিতাব দেখানো হয়। যা এখনো মাদ্‌রাসার লাইব্রেরীতে আছে। সেই সময় চুনতী মাদ্‌রাসার লাইব্রেরীতে ২৪ সেট কিতাব ছিল। বোর্ডের চেয়ারম্যান শাহ সাহেব (র:) এর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কামিল খোলার জন্য ৫০ সেট কিতাব ১ সপ্তাহের মধ্যে পূরণ করার নির্দেশ দেন। শাহ সাহেব তখন চট্টগ্রাম শহরের মকবুল আহমদ চৌধুরী এর বাসায় ছিলেন। মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ, গভর্নিং বডির সেক্রেটারী ও সদস্যবৃন্দসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ মাগরিবের পর শাহ সাহেব (র:) কে এই ব্যাপারে বললে শাহ সাহেব (র:) আমাকে বললে আমি হারবাং নিবাসী ইত্তেফাক গ্রুপের চেয়ারম্যান ডা. আনোয়ারের কথা বললে তিনি আমাকে এবং হাফেজ হারুনকে ঢাকা পাঠিয়ে ২৬ সেট কিতাবের ব্যবস্থা করেন। তখন চুনতী মাদ্‌রাসা পরিদর্শনের সময় বায়তুশ শরফের পীর সাহেব শাহ মাওলানা কুতুব উদ্দীন (র:) কে মুহাদ্দিস হিসেবে দেখানো হয়।[১] শাহ সাহেব (র:) এর

১. আঞ্জুমান' ১০, *চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসা*, চট্টগ্রাম, প্রকাশকাল-২০১১ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৩৬, ৩৭

প্রচেষ্ঠায় ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে কামিল হাদীস বিভাগ ১ম চালু হয়ে রাজনৈতক কারণে কয়েক বছর বন্ধ থাকার পর ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে আবার চালু হয়। সরকারী অনুমতি পায় ১ জুলাই ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে। আর মঞ্জুরী পায় ১৯৭৮ ক্রিস্টাব্দে। হযরত শাহ সাহেব (র:) এর একান্ত উদ্যেগ ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এক কথায় শাহ সাহেব (র:) এর কারণেই বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস পাদক প্রাপ্ত বরেণ্য মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা আব্দুল হাই নিজামী সাহেব চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসায় যোগদান করেন।[১] যিনি ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে অবসর নেন। যাকে চুনতী মাদ্‌রাসায় আউয়াল সাহেব হুজুর বলা হত। ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে চুনতী মাদ্‌রাসায় আউয়াল সাহেব হুজুরের সমসাময়িক হযরত মাওলানা মুহম্মদ ফখরদ্দীন (র:) সিলেট সরকারী আলিয়া মাদ্‌রাসা হতে অধ্যক্ষ পদ থেকে অবসর গ্রহণ করার পর শায়খুল হাদীস হিসেবে যোগদান করেন। তিনিও জ্ঞানে গুণে যোগ্যতা মান বিবেচনায় আউয়াল সাহেব হুজুরের মত ছিল। তিনি আমাকে (গবেষককে) বলেছিলেন, আমি এখানে যোগদান করেছি হযরত শাহ সাহেব (র:) এর ইচ্ছা ও দু'আয়। আমি একদিন চুনতীতে আমার শ্বশুর বাড়িতে বেড়াতে আসলে শাহ সাহেব (র:) আমাকে বললেন, কামিলে ক্লাস নাও। আমি ক্লাস শেষ করলে শাহ সাহেব (র:) আমাকে বললেন, আপনি এখানে চলে আসেন। উল্লেখ্য, আমি গবেষক ফখরদ্দীন (র:) এর কামিল ক্লাসে ছাত্র ছিলাম।

কামিল ক্লাসে পাঠ দানকারী বরেণ্য মুহাদ্দিসরা হলেনঃ

০১. কামিল ক্লাসের উদ্ধোধন করেন মাওলানা মুহাম্মদ আমিন (র:) (১৯০৫-১৯৭৭/৭৮খ্রি)।

০২. লোহাগাড়া উপজেলার আমিরাবাদ নিবাসী মাওলানা আব্দুল সোবহান , তিনি চট্টগ্রাম দারুল উলূম এবং কলকাতা আলীয়া মাদ্‌রাসার ছাত্র ছিলেন।

০৩. মহেষখালী নিবাসী মাওলানা আব্দুল বারী। তিনি ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চুনতি মাদ্‌রাসার মুহাদীস ছিলেন।

০৪. মাওলানা ফজলুল্লাহ (১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দ- ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ) তিনি সাতকানিয়া বাবু নগরের আধিবাসী। তাঁকে দিয়ে কামিল হাদীস বিভাগের ক্লাস হযরত শাহ সাহেব (র:) শুরু করেছিলেন। তিনি ১৯৬২ খ্রি: হতে ইন্তেকাল পর্যন্ত চুনতি মাদ্‌রাসার নাজমে আলা (প্রধান পরিচালক) ছিলেন।

---

১. আনজুমান, *চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসা*, চট্টগ্রাম, ৩৪ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী সংখ্যা, ১৯৯৬ খ্রি., পৃ. ৪৭

০৫.মীর গোলাম মোস্তাফা (১৯১১- ১৯৯৩ খ্রি:) তিনি সাতকানিয়া জন্মগ্রহণ করেন। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে চুনতী মাদ্‌রাসার মুহাদ্দিস ছিলেন ।

০৬.মাওলানা কামাল উদ্দিন মুসা খতীবী (র:)(১৯৩৪-১৯৯৩ খ্রি:) তিনি লোহাগাড়া কলাউজান জন্মগ্রহণ করেন। চুনতী মাদ্‌রাসার হেড মাওলানা ছিলেন।

০৭.সাতকানিয়া বাবুনগরের অধিবাসী, মাওলানা মুহাম্মদ আমীন (রহ:) তিনি চুনতী মাদ্‌রাসার ২য় মুহাদ্দিস ছিলেন।

০৮.মাওলানা মুহাম্মদ মুছা (১৯২৩-২০০০ খ্রী) তিনি পটিয়ার জিরিতে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি চুনতী মাদ্‌রাসার মুহাদ্দিস ও উপাধ্যক্ষ ছিলেন।

০৯.মাওলানা আমিন খান রিজবী(১৯২১- ২০০২ খ্রি:)

চট্টগ্রামের পাহাড়তলীতে জন্ম। তিনি চুনতী মাদ্‌রাসার উপাধ্যক্ষ ছিলেন।

১০.মাওলানা নেছারুল হক (রহ:) (১৯২০-২০১৬ খ্রী:) তিনি চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলার গহিরা গ্রামের অধিবাসী তিনি ১৯৭০ খ্রি: হতে ১৯৭৩ পর্যন্ত চুনতী মাদ্‌রাসার মুহাদ্দিস ছিলেন।

১. হযরত মাওলানা আব্দুর রশীদ (র:)(১৯৯২- ১৯১২ খ্রি:) তিনি লোহাগাড়া রশিদেরঘোনায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি র্দীঘ দিন চুনতী মাদ্‌রাসার মুহাদ্দিস ছিলেন। ইত্যাদি আরো অনেক মুহাদ্দিসের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।[১]

চুনতী মাদ্‌রাসার কামিল শ্রেণির কৃতি ছাত্ররা

০১. হযরত মাওলানা আশরফ আলী (র:) আধুনগর লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম। তিনি চুনতী মাদ্‌রাসার সহকারী অধ্যাপক ছিলেন।

০২. মাওলানা আজীজুল হক (১৯৬০ খ্রি.) খরুলিয়া, কক্সবাজার, তিনি চুনতী মাদ্‌রাসা হতে ১৯৮০ খ্রি. কামিলে সম্মিলিত মেধা তালিকায় ২য় স্থান অধিকার করে ১ম শ্রেণিতে কামিল পাশ করেন। তিনি চুনতী মাদ্‌রাসা ও কক্সবাজার হাসেমিয়া মাদ্‌রাসার উপধ্যক্ষ ছিলেন।

০৩. ড. হেলাল উদ্দীন মুহাম্মদ নোমান (১৯৬৮ খ্রি.) সুফী মিয়াজী পাড়া, আধুনগর লোহাগাড়া চট্টগ্রাম । ১৯৮৬ খ্রি. চুনতী মাদ্‌রাসা হতে কামিল পাশ করেন।

---

১. আনজুমন' ০৬, *চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসা*, চট্টগ্রাম, প্রকাশ কাল- ২০০৬খ্রি. পৃ ১১, ১২, ১৩

তিনি গারাংগিয়া কামিল মাদ্‌রাসার সহকারী অধ্যাপক ছিলেন এবং বর্তমানে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের অধ্যাপক।

০৪. হাফেজ মাওলানা শাহে আলম (১৯৭১ খ্রি.) পুটিবিলা, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

১৯৯১ খ্রি. মেধা তালিকায় ১৭ তম স্থান দখল পূর্বক ১ম শ্রেণিতে চুনতী মাদ্‌রাসা হতে কামিল পাশ করেন। তিনি অত্র মাদ্‌রাসার মুহাদ্দিস ও বর্তমানে উপাধ্যক্ষ।

০৫. ড. নুর মুহাম্মদ ওসমানী (১৯৬৬ খ্রি:)

ডুলাহাজারা, চকরিয়া, কক্সবাজার।

তিনি চুনতী মাদ্‌রাসা হতে ফাযিল ও কামিল পাশ করেন। এক সময় চুনতী মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ ছিলেন। বর্তমানে মালেশিয়া আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। আরবি ও ইংরেজীতে সুনিপুনভাবে পাঠ দান করতে পারেন। তাঁর অসংখ্য প্রবন্ধ জার্নাল ও ম্যাগাজিনে ছাপা হয় এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সেমিনারে পেপার উপস্থাপন করেন।

০৬. অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ নেজামুদ্দীন (১৯৭১ খ্রি.)

উত্তর রামপুর, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

তিনি ১৯৮৯ খ্রি. চুনতী মাদ্‌রাসা হতে ১ম শ্রেণিতে কামিল পাশ করেন। তিনি চুনতী মাদ্‌রাসার আরবি প্রভাষক, গারাংগিয়া কামিল মাদ্‌রাসা ও চট্টগ্রাম দারুল উলূম কামিল মাদ্‌রাসার মুহাদ্দিস ছিলেন। বর্তমানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের অধ্যাপক।

০৭. অধ্যাপক ড.মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম (১৯৭১ খ্রি.) চিরিঙ্গা, চকরিয়া , কক্সবাজার।

তিনি চুনতী মাদরাসা হতে কৃতিত্বের সাথে কামিল পাশ করেন। তিনি রঙ্গিখালী ফাযিল মাদরাসা, কেরানীহাট ইসলামিয়া ফাযিল মাদরাসা উপাধ্যক্ষ ছিলেন। বর্তমানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের অধ্যাপক।

০৮. কাজী মাওলানা মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, সুফি মিয়াজী পাড়া, আধুনগর, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম। তিনি চুনতী মাদ্‌রাসা হতে ১৯৮৮ খ্রি. প্রথম বিভাগে ৯ম স্থান অধিকার করে ১ম শ্রেণিতে কামিল পাশ করেন। তিনি লোহাগাড়া ইসলামিয়া ফযিল মাদরাসার আরবী প্রভাষক, রঙ্গিখালী কামিল মাদ্‌রাসা, গারাংগিয়া ইসলামিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, আলম শাহ

পাড়া কামিল মাদ্‌রাসা, বায়তুশ শরফ আর্দশ কামিল মাদরাসার মুহাদ্দিস এবং চট্টগ্রাম দারুল উলূম কামিল মাদ্‌রাসার প্রধান মুহাদ্দিস ছিলেন।[১]

০৯. মাওলানা হাফিজুল হক মিজামী, চুনতী লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

তিনি চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসা কামিল পাশ করেন। তিনি দক্ষিণ সুখছড়ী খালেকিয়া ফাযিল মাদ্রাসার সহকারী অধ্যাপক এবং চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ ছিলেন।

১০. মাওলানা আবু মুছা খালেদ জমিল, চুনতী, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

তিনি গারাংগিয়া কামিল মাদরাসায় মুহাদ্দিস ও আধুনগর ইসলামিয়া কামিল মাদ্‌রাসার আরবি প্রভাষক এবং বর্তমানে অধ্যক্ষ। তিনি চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসা হতে কামিল পাশ করেন।

১১. মাওলানা নুরুল আজীম, বারবাকিয়া, পেকুয়া, কক্সবাজার।

তিনি চুনতী মাদ্‌রাসা হতে কামিল পাশ করে লোহাগাড়া ইসলামিয়া ফাযিল মাদ্‌রাসার আরবি প্রভাষক, চন্দনাইশ মকবুলিয়া ফাযিল মাদ্‌রাসার উপাধ্যক্ষ এবং বর্তমানে গারাংগিয়া ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ।

১২. মাওলানা আ.ন.ম নোমান, বড় মিয়াজ পাড়া, আধুনগর, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

তিনি চুনতী মাদ্‌রাসা হতে কামিল পাশ করে আরবি প্রভাষক ও উপাধ্যক্ষ ছিলেন। বর্তমানে পদুয়া আইনুল উলূম কামিল মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ।

১৩ . মাওলানা ছাবের হেলালী (র:)

ছদাহ, সাতকানিয়া চট্টগ্রাম। তিনি চুনতী মাদ্‌রাসা হতে কামিল পাশ করে চুনতী মাদ্‌রাসার আরবি প্রভাষক ছিলেন।

১৪. মাওলানা ফারুক হুসাইন, ডুলাজারা, চকরিয়া, কক্সবাজার।

তিনি চুনতী মাদ্‌রাসা হতে ১ম বিভাগে কামিল পাশ করে আবার এই মাদ্‌রাসায় আরবি প্রভাষক, মুহাদ্দিস, উপাধ্যক্ষ ও অধ্যক্ষ হন।

১৫. মাওলানা কামাল উদ্দীন, আমিরাবাদ, লোহাগাড়া ।

---

১. আনজুমন ১০, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১

তিনি চুনতী মাদ্‌রাসা হতে ১ম বিভাগে কামিল পাশ করে দক্ষিণ সুখছুড়ি খালেকিয়া মাদ্রাসার আরবি প্রভাষক ও সহকারী অধ্যাপক এবং এই মাদ্‌রাসার মুহাদ্দিস হন।

১৬. মাওলানা নিজাম উদ্দীন, সড়াইয়া, পুটিবিলা, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

তিনি চুনতী মাদ্‌রাসা হতে কামিল পাশ করে চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদ্রাসার সহকারী মাওলানা, গারাংগিয়া ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসার আরবি প্রভাষক এবং চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসার মুহাদ্দিস হন।

১৭. মাওলানা রিদওয়ানুল হক নিজামী, চুনতী, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

তিনি চুনতী মাদ্‌রাসা হতে কামিল পাশ করে অত্র মাদরাসার আরবি প্রভাষক ও সহকারী অধ্যাপক হন।

১৮. মাওলানা শহিদুল ইসলাম নিজামী , চুনতী, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

চুনতী মাদ্‌রাসা হতে কামিল পাশ করে আবার অত্র প্রতিষ্ঠানের সহকারী অধ্যাপক হন।

১৯. মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ, মিরশ্বরায়, চট্টগ্রাম।তিনি চুনতী মাদ্‌রাসা হতে কামিল পাশ করে দরুল উলূম কামিল মাদ্‌রাসা ও বায়তুশ শরফ কামিল মাদ্‌রাসার মুহাদ্দিস হন।

২০. মাওলানা কফিল উদ্দীন সাঈদ , ছিটুয়া পাড়া, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম ।

চুনতী মাদ্‌রাসা হতে কামিল পাশ করে আরবি প্রভাষক এবং বর্তমানে ফাযিল মাদ্‌রাসার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ।

২১. মাওলানা আব্দুল হাই নদভী, রহবরে বায়তুশ শরফ, চট্টগ্রাম।

তিনি চুনতী মাদ্‌রাসা হতে কামিল পাশ করেন। দুই শতের অধিক কিতাব প্রনেতা।

২২. মাওলানা ফজলুল কাদের, সাহারবিল, চকরিয়া, কক্সবাজার ।

চুনতী মাদ্‌রাসা হতে কামিল পাশ করে বর্তমানে বাজালিয়া ফাযিল মাদ্রাসার সহকারী অধ্যাপক।

২৩. মাওলানা নুরুল আলম, সরাইয়া, পুটিবিলা, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

১৯৮৬ খ্রি. কামিল পাশ করে বর্তমানে বাজালিয়া ফাযিল ডিগ্রি মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ ।

২৪. মাওলানা আমির হুসাইন, চুনতী মাদ্‌রাসা হতে কামিল পাশ করে বর্তমানে বাজালিয়া ফাযিল ডিগ্রি মাদ্‌রাসার উপাধ্যক্ষ।

২৫. মাওলানা মহিউদ্দীন, সুফী মিয়াজী পাড়া, আধুনগর, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম ।

চুনতী মাদ্‌রাসা হতে কামিল পাশ করে আরবি প্রভাষক ও গারাংগিয়া কামিল মাদ্‌রাসার মুহাদ্দিস হন।

২৬. মাওলানা ওয়ালী উল্লাহ, কুতুবদিয়া, কক্সবাজার, চুনতী মাদ্‌রাসা হতে কামিল পাশ আরবি প্রভাষক হন। চুনতী মাদ্‌রাসা হতে কামিল পাশ করে আরো অসংখ্য মুহাদ্দিস, প্রভাষক, সহকারী অধ্যাপক উপাধ্যক্ষ, প্রফেসর, ডক্টর এবং ওয়ায়েজ সৃষ্টি হয়েছে। যার বর্ণনা শেষ করা যাবে না। সংক্ষেপে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করলাম। এছাড়াও চুনতী মাদ্‌রাসার উন্নয়নে নানামুখী শাহ সাহেব (র:) অবদান রাখেন। হযরত শাহ সাহেব (র:) ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৭ খ্রি. হতে ইন্তেকাল পর্যন্ত মাদ্‌রাসা পরিচালনা কমিটির সভাপতি থেকে চুনতী মাদ্‌রাসার সার্বিক উন্নয়নে অবদান রাখেন। সার্বিক বিবেচনায় বলা যায় শাহ সাহেব (র:) এর জীবনের শেষ দশক চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসার উন্নয়নের গৌরব উজ্জল অধ্যায়। শাহ সাহেব (র:) এর ব্যাক্তিত্বের প্রভাবে তাঁর ভক্তবৃন্দও বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিগণ অনুদান দিয়েছেন। যেমন-

০১. প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ব্যক্তিগত ফান্ড হতে ০৫ লক্ষ টাকা অনুদান দেন।

০২. শাহ সাহেব (র:) এর একান্ত ভক্ত আলহাজ্ব মুহাম্মদ ইউসুফ মিয়া বিশিষ্ট শিল্পপতি ২ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা ব্যায়ে মাদ্‌রাসার ছাত্রাবাসের সর্ম্পূণ কাজ করে দেন।

০৩. আলহাজ্ব মুহাম্মদ ইউসুফ মিয়া মাদ্‌রাসার পুকুর ঘাটের জন্য ১ লক্ষ টাকা অনুদান দেন।

০৪. শাহ সাহবে (র:) এর ভক্তদের অসংখ্য দান এখন ও পর্যন্ত অব্যাহত আছে।

০৫. আলহাজ্ব ডা. মুহাম্মদ অনোয়ার কামিল চালু করার জন্য প্রাথমিক ব্যায়ের জন্য ২৭ হাজার টাকা অনুদান দেন।[১]

শাহ সাহেব (র:) কে মাদ্‌রাসার কালেকশনের জন্য সৌদি আরব বা অন্য কোন দেশে যাওয়ার পরার্মশ দিলে তিনি বলতেন, যে আল্লাহ ওখানে দিবেন তিনি এখানেও দিবেন। শাহ সাহেব (র:) এর সে রকম ইচ্ছা ও অনুভূতির ফলে দেশের টাকা দিয়ে চুনতী মাদ্‌রাসার প্রায় উন্নয়নের কাজ শেষ হয়। চুনতী মাদ্‌রাসার সার্বিক প্রয়োজনে যেমন

১. আনজুমন ৩৪ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী, *অনজুমনে তোলাবায়ে সবেক্বীন*, চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, প্রকাশকাল: ১৯৯৬খ্রি., পৃ: ৪৮

অকাতরে না গুনে দান করতেন তেমনি বিভিন্ন মাদ্‌রাসায় দাওয়াত দিলে মুঠভরে না গুণে বার্ষিক সভায় টাকা দান করতে।[১]

যে তিনটি গর্ভনিং বাড়িতে হযরত শাহ সাহেব (র:) সভাপতি ছিলেন তা হল

গভর্নিং বডি

সেশন ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৭ খ্রি. হতে ৩০মার্চ, ১৯৭৯ খ্রি.

১. হযরত শাহ মাওলানা হাফেজ আহমদ সাহেব	সভাপতি
২. হযরত শাহ মাওলানা আব্দুল জব্বার সাহেব	সহ সভাপতি
৩. হযরত শাহ মাওলানা হাবিব আহমদ সাহেব	সম্পাদক
৪. মাওলানা আব্দুল রশিদ সাহেব	সদস্য
৫. মাওলানা মুহাম্মদ আমিন সাহেব	সদস্য
৬. মাওলানা আব্দুল্লাহ মিয়া সাহেব	সদস্য
৭. মাওলানা মুছলিম খান সাহেব	সদস্য
৮. মাওলানা আজহার হুসাইন ছিদ্দিকী সাহেব	সদস্য
৯. মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহিয়া	সদস্য
১০. মাওলানা মাহফুজুর রহমান ছিদ্দিকী	সদস্য
১১. প্রফেসর মাওলানা আবু বকর রফীক	সদস্য
১২. ডা. লোকমান মিয়া	সদস্য

গভর্নিং বডি

সেশন ৩১ মার্চ, ১৯৭৯ খ্রি হতে ২৭ মে, ১৯৮৩ খ্রি

০১. হযরত শাহ মাওলানা হাফেজ আহমদ সাহেব	সভাপতি
০২. হযরত শাহ মাওলানা আব্দুল জব্বার সাহেব	সহ সভাপতি
০৩. হযরত মাওলানা ইয়াহিয়া সাহেব	সদস্য

১. আহমদুল ইসলাম চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬

০৪. মাওলানা আব্দুল রশিদ সাহেব	সদস্য
০৫. মাওলানা মুহাম্মদ আমিন সাহেব	সদস্য
০৬. মাওলানা আজহার হুসাইন	সদস্য
০৭. মাওলানা মুছলিম খান	সদস্য
০৮. মাওলানা আব্দুল্লাহ মিয়া	সদস্য
০৯. মাওলানা হাবিব আহমদ	সদস্য
১০. মাওলানা মাহফুজুর রহমান ছিদ্দিকী	সদস্য
১১. মাওলানা কামাল উদ্দীন মুছা খতীবী	সদস্য
১২. ডা. মুহাম্মদ লোকমান সাহেব	সদস্য
১৩. মাওলানা আবু বকর রফিক আহমদ	সম্পাদক

গভর্নিং বডি

২৮ মে, ১৯৮৩ হতে ১৩ জুন, ১৯৮৬ খ্রি.

০১. হযরত শাহ মাওলানা হাফেজ আহমদ সাহেব	সভাপতি
০২. হযরত শাহ মাওলানা আব্দুল জব্বার সাহেব	সহ সভাপতি
০৩. হযরত মাওলানা আবু বকর রফিক আহমদ	সম্পাদক
০৪. মাওলানা মাহফুজুর রহমান ছিদ্দিকী	সদস্য
০৫. মাওলানা আব্দুর রশিদ সাহেব	সদস্য
০৬. মাওলানা কামাল উদ্দীন মুছা সাহেব	সদস্য
০৭. মুফিজুর রহামান কোম্পানী	সদস্য
০৮. হাফেজ হারুনুর রশীদ	সদস্য
০৯. আহমদ সঈদ	সদস্য
১০. মাওলানা মুসলিম খান	সদস্য
১১. ড. মুহাম্মদ লোকমান মিয়া	সদস্য
১২. মাওলানা শফিক আহমদ	সদস্য
১৩. মাওলানা শফিক আহমদ	অধ্যক্ষ

২০ মে, ১৯৭৭ খ্রি. তারিখে গঠিত চুনতী হাকিমিয়া এতিমখানা কমিটির শাহ সাহেব (র:) সভাপতি।রেজুলেশনে লেখা হয়েছে। অদ্য ২০ মে, ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে জনাব শহীদ আহমদ খা, সহ সম্পাদক, চুনতী হাকিমিয়া মাদ্‌রাসা এতিম খানা এর প্রস্তাবে ও জনাব মাওলানা সিরাজুল অরেফীন ছিদ্দিকী, এম. এ, প্রাক্তন অধ্যাপক, এম ই এস কলেজ, চট্টগ্রাম এর সমর্থনে শিশু সম পবিত্র আত্মা মহা পুরুষ আল্লাহর অলি জনাব শাহ সাহেব মাওলানা হাফেজ আহমদ সাহবেকে সভাপতি পদে বরণ করা হয়।[১]

পরর্বতীতে হযরত শাহ সাহেব (র:) এর একনিষ্ঠ ও ঘনিষ্ঠ খাদেমগণ ও স্মরণীয় অনন্য সাধারণ অবদান রেখেছেন।

তাদের মধ্যে একজন হলেন, মিয়া মুহাম্মদ গোলাম কবির, প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের দেয়া ০৫ লক্ষ টাকার অনুদানের ০৪ তলা চুনতী মাদ্‌রাসার অফিস বিলিং তাঁর ব্যবস্থাপানায় শাহ সাহেব (র:) এর নির্দেশে করা হয়েছে। রাবেতা আল আলম আল ইসলামী এর দেয়া মাদ্‌রাসার ছাত্রাবাসের জন্য এক লক্ষ টাকার অনুদানের দুই রুম বিশিষ্ট বিল্ডিংয়ের কাজও শাহ সাহেব (র:) নির্দেশে মিয়া গোলাম কবিরের তত্বাবধানে হয়েছিল।[২]

শাহ সাহেব (র:) এর নির্দেশ ওদো য়ায় আরেকজন খাদেম হযরত মাওলানা কাজী অধ্যক্ষ মুহাম্মদ নাছির উদ্দীন (ম.জি.আ)ও অনন্য সাধারণ অবদান রেখেছেন যা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না, নিম্নে সংক্ষিপ্তকারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান উল্লেখ করা হল।

০১.চুনতী মাদ্‌রাসাকে কামিল শ্রেণি খুলতে সহযোগিতা করা।

০২.চুনতী মাদ্‌রাসার অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স চালু করা।

০৩.চুনতী মাদ্‌রাসাকে কামিল পরীক্ষা কেন্দ্র করা।

০৪.দাখিল স্তরে বিজ্ঞান বিভাগ চালু করা।

০৫.মাদ্‌রাসার দক্ষিণের সীমানায় বি.এস ১৮০০ খতিয়ানের জমি অনেক ঘাত- প্রতিঘাতের মাধ্যমে ক্রয় করে চার তলা সুরম্য ভবনের ব্যবস্থা করা।

০৬.উত্তরের সীমানায় ০৪ তলা বিশিষ্ট বিজ্ঞান ও শাহ হাফেজ আহমদ (র:) লাইব্রেরী ভবন নিমার্ণ করা।

---

১. আহমদুল ইসলম চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮

২. মিয়া মুহাম্মদ গোলাম কবির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

০৭.পূর্বে ইবতেদায়ী ভবনের পাশে সীমানা বিবোধ মিঠিয়ে জমি দখল করে নবনির্মিত সরকারী ভবনের জায়গা নির্ধারণ এবং ভিত্তিস্থাপন করা।

০৮.রেকসহ দুর্লভ অসংখ্য কিতাব সংগহ করে সমৃদ্ধ লাইব্রেরী করা।

০৯.৩০ কিলোওয়াট বিশাল জেনারেটর ও অত্যাধুনিক ফটোস্ট্যাট মেশিনের ব্যবস্থা করা।

১০.চুনতী মাদ্‌রাসার শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা আব্দুর রশীদ (র:) নামে সড়কের নাম করণ এবং রাস্তা কার্পেটিং এর ব্যবস্থা করা ।

১১. শাহ নজির আহমদ (র:) হল এর ৩য় তলার ব্যবস্থা করা।

১২. হিজরী নববর্ষ উদযাপনের আলোচনা সভা চালু করা।

১৩. মাদ্‌রাসার স্বর্থে বিভিন্ন জটিল ও কঠিন কাজ সমাধান করা।

১৪. দুর্যোগে কান্ডারীর ভূমিকা রাখা।

১৫. গর্ভনিং বড়ির প্রভাবশালী সদস্য হিসেবে মাদ্‌রাসার স্বার্থে আপোষহীন ভূমিকা রাখা।

১৬. মাদরাসার গভনিং বডির ১২ বছর অভিবাভক ও ১২ বছর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন।

১৭. ২০১০ খ্রি. মাদ্‌রাসার ২০০বছর পূর্তি উদযাপনের উদ্যেগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

১৮.চুনতী মাদ্‌রাসনার ঐতিহ্যবাহী প্রাক্তন ছাত্র সংগঠন আঞ্জোমনে তোলাবায়ে সাবেক্বীনের দুই সেশনের সভাপতি ছিলেন।

১৯. অসংখ্য ফ্যানের ব্যবস্থা করেন।

২০.জনশ্রুতি আছে চুনতী মাদ্‌রাসার এমন কোন স্তর নেই তাঁর অবদান নেই।

শাহ সাহেব (র:) এর আর্দশ ছিল ধর্মীয় শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করা, তিনি বলতেন; "আল্লাহর দিয়া ফন্না আসল ফন্না" অর্থাৎ কুর'আন ও হাদীসের জ্ঞান তথা ধর্মীয় শিক্ষায়ই মূল শিক্ষা। আজীবন নিজে ও জ্ঞানচর্চা করেছেন এবং জ্ঞানের পৃষ্ঠ পোষাক ছিলেন। যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি আন্তরিকতা রাখতেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দাওয়াতে যেতেন। পকেট থেতে নাগুণে টাকা দিয়ে সহযোগিতা করতেন। সব সময় বলতেন কোন সহযোগিতা করতে না পারলে ও উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন। তিনি মাদ্‌রাসা মসজিদ সমূহের বার্ষিক সভায় উপস্তিত থাকতেন।[১]

১. সম্পাদক মুহাম্মদ আব্বাস উদ্দীন, *সোনার মানুষ*, (১০ এপ্রিল ২০২৩ খ্রি.), পৃ. ১৫৬, ১৫৭

শাহ সাহেবে জিবদ্দশায় প্রতিষ্ঠিত চুনতী হাকিমিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়, চুনতী উচ্চ বিদ্যালয় এবং চুনতী মহিলা কলেজের প্রতি তাঁর দরদ ও অন্তিরিকতা ছিল। তিনি সময় ও সুযোগ পেলেই এ গুলুর অফিসে বসে খোঁজ- খবর নিতেন। নিজ ইচ্ছায় গিয়ে আবার নিজ ইচ্ছায় ফিরে আসতেন, কখনো অল্পক্ষণ আবার কখনো দীর্ঘক্ষণ বসতেন। রাষ্ট্রের উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি কর্মকর্তা ব্যবসায়ী শিল্পপতিসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার ব্যাক্তিবর্গ শাহ সাহেব (রহ:) এর সাক্ষাতে আসলে চুনতী মাদ্‌রাসার পাশাপাশি অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও যেতেন। চুনতী ফাতেমা বতুল মহিলা ফাযিল মাদ্‌রাসা শাহ সাহেব (রহ:) এর ইন্তেকালের পর প্রতিষ্ঠিত হলেও শাহ সাহেব (রহ:) এর ভক্ত শুভাখাংকী, দর্শনার্থী ইত্যাদিদের থেকে কোন না কোনভাবে লাভবান হচ্ছে তা অস্বীকার করা যাবে না।[১] শাহ সাহেবের নামেও অনেক মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় যেমন- চুনতী হাফেজীয়া রহমানিয়া আদর্শ দাখিল মাদ্‌রাসা।

হিফজ খানা প্রতিষ্ঠা

حفظ শব্দটি আরবি অর্থ মুখস্থ করা আর خانه শব্দটি ফার্সী অর্থ ঘর। সুতরাং حفظ خانه অর্থ মুখস্থ করার স্থান। পরিভাষায় যেখানে নিদিষ্ট নিয়মে ও পদ্ধতিতে কুর'আন শরীফ মুখস্থ করা হয় তাকে হিফজ খানা বলে। আল্লাহ তায়ালা কুর'আন শরীফে বলেছেন,

انا نحن نزلنا الذكر وان له لحا فظون

"নিশ্চয় আমি কুর'আন শরীফ নাযিল করেছি এবং এর হেফাজতের বা সংরক্ষণের দায়িত্ব আমিই নিয়েছি।"[২]

এই হিফাজত মানুষ ছাড়া হবে না, জিন বা ফেরেস্তা কেউই এটা হিফাজত করতে পারবে না। তাই মানুষের মাধ্যমে কুর'আন শরীফ হেফাজত হওয়ার জন্য হিফজ খানার গুরুত্ব রয়েছে। এই মর্ম বুঝতে পেরে শাহ সাহেব (র:) আজীবন হিফজ খানার পৃষ্ঠ পোষাক ছিলেন। চুনতী দারুত তাহফিজ তন্মধ্যে অন্যতম, এছাড়া ও শাহ সাহেব (র:) এর নামে পৃষ্ঠপোষকতায় অনেক হিফজখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। চুনতী শাহ হাফেজিয়া রহমানিয়া হিফজখানা ইত্যাদি।

---

১. আহমদুল ইসলাম চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১

২. আল কুর'আন, সূরা হিজর, আয়াত: ১৪

মকতব ও ফুরকানিয়া মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা

ইসলামী শিক্ষার প্রাথমিক স্তরকে মকতব বা ফুরকানিয়া বলে। এখানে ধর্মের মৌলিক বিষয় শিক্ষা দেয়া হয়। শৈশবকালিন শিক্ষা সর্ম্পকে রাসূলল্লাহ (স:) বলেছেন,

العلم فى الضغر كالنقش على الحجر-

"শৈশব জ্ঞানার্জন করা স্থায়িত্বের দিক দিয়ে পাথর খোদাই করা নকশার মতো।"[১]

রাসূলল্লাহ (স:) আরো বলেছেন,

ادّبو اولادكم

"তোমাদের সন্তানদের আদব শিক্ষা দাও।"[২]

এই ফোরকানিয়া বা মকতবের মাধ্যমে শিশুরা নাস্তিক্যবাদীর করাল গ্রাস হতে রক্ষা পায়। হযরত শাহ সাহেব (র:) এই বাস্তবতা উপলব্দি করে অনেক মকতব বা ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

শাহ সাহবে (র:) এর জীবদ্বশায় এবং ইন্তেকালের পর অনেক ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা ও ইবতিদায়ি মাদ্‌রাসা তাঁর ভক্ত ও খাদেম গণ প্রতিষ্ঠা করেন। যেমন শাহ সাহেব (র:) এর একান্ত খাদেম হযরত মাওলানা অধ্যক্ষ কাজী মুহাম্মদ নাছির উদ্দীন (ম.জি.আ) প্রতিষ্ঠা করেন, রশিদেরঘোনা শাহ হাফেজিয়া ইবতিদায়ী মাদ্‌রাসা ইত্যাদি।

মসজিদে বায়তুল্লাহ্ নির্মাণ

مسجد শব্দটি اسم ظرف অর্থ সিজদা করার স্থান। সুতরাং যেখানে সিজদা দেয়া হয় তাকেই মসজিদ বলে। পরিভাষায়, মসজিদ হল আল্লাহ সন্তুষ্ট অর্জন ও নির্দেশ পালন করার জন্য দৈনিক পাচঁ ওয়াক্ত সালাত এবং জুমার সালাত আদায় করার জন্য যেই ঘর তৈরি করা হয় তাই মসজিদ। ব্যাপক অর্থে মসজিদ হল ইসলামী শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজ সভ্যতার বিকাশ যেখানে হয়। Muslim community সবকাজের মূল কেন্দ্রভূমি তাই মসজিদ।

ইসলামে মসজিদ মিমার্ণের গুরুত্ব অপরিসিম, কেননা আল্লাহ মসজিদকে নিজের ঘর হিসেবে অখ্যায়িত করে বলেন,

---

১. *আল- বায়হাকী*, হাদীস নং ৬৪০

২. *সুনানে ইবনে মাজাহ*, হাদীস নং: ৩৬৭১

وان المساجد الله فلا تدعوا مع الله احدا

"নিশ্চয় মসজিদসমূহ আল্লাহরই জন্য। অতএব তোমার আল্লাহর সাথে কাউকে ডেক না।"[১]

আল্লাহ তায়ালা মসজিদ নির্মাণ আবাদ রক্ষণাবেক্ষণকে মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে বলেন,

انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلوة واٰتى الزّكوة ولم يخش الاالله

"বিশেষত আল্লাহর মসজিদসমূহ তারাইতো রক্ষণাবেক্ষণ করবে যারা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাস করবে, নামায প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত প্রদান করবে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করবে না।"[২]

এই ব্যাপারে রাসূলল্লাহ (স:) হাদীস শরীফে বলেন,

قال عثمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى الله مسجدا بنى الله له مثله فى الجنة-

"হযরত ওসমান (রা:) বলেন, আমি রাসূলল্লাহ (স:) কে বলতে শুনেছি, যে আল্লাহর জন্য একটি মসজিদ নিমার্ণ করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে অনুরুপ একটি ঘর নিমার্ণ করবেন।"[৩]

রাসূলল্লাহ (স:) মসজিদ নির্মাণে সহযোগীতাকারীদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন তিনি বলেন,

من بنى مسجد الله كمفحص قطاة أو أصغر بنى الله له بيتا فى الجنة

"যে ব্যাক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পাখির বাসা পরিমাণ বা তার চেয়েও ছোট মসজিদ নিমার্ণ করবে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য জান্নাতে একটি প্রসাদ নিমার্ণ করবেন।"[৪]

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, যারাই মসজিদ নিমার্ণ সামর্থ অনুযায়ী অংশগ্রহণ করবে তাদেরকে সেই হিসেবে প্রতিদান দেয়া হবে।

হযরত আয়েশা (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন,

انّ النّبى صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المسجد فى الدور

"রাসূলল্লাহ (স:) প্রত্যেক পাড়া মহাল্লায় মসজিদ প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছেন।"[৫]

---

১. আল-কুর'আন, সূরা জীন, আয়াত: ১৮।
২. আল-কুর'আন, সূরা আত তাওবা,আয়াত: ১৮।
৩. *সুনানে তিরমিযী*, হাদীস নং: ৩১৮।
৪. *ইবনে মাজাহ*, হাদীস নং: ৮৩৮।
৫. *সহিহ ইবনে হুযাইমা*, বাবুল আমরে বি বিনায়িল মসজিদি ফিদ দুর্, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭০

পৃথিবীতে প্রথম ঘর হল আল্লাহর ঘর, আল্লাহ বলেন,

انّ اوّل بيت وضع للناس للّذى ببكة مباركا و هدى للعالمين

"মানবজাতীর জন্য সর্বপ্রথম ঘর তৈরী করা হয়েছিল বককায় (মক্কায়), উহা বরকতময় বিশ্ব জগতের দিশারী।"[১]

কাবাঘর সর্বপ্রথম নিমার্ণ করেন ফেরেস্তা তারপর আদাম (আ:) এটির সংস্কার করেন। তারপর ইব্রাহিম (আ:) হতে মুহাম্মদ (স:) পর্যন্ত এটার সংস্কার করা হয়। এটি দ্বীনি শিক্ষা ও দাওয়াতের কেন্দ্র হয়। রাসূলল্লাহ (স:) মক্কা হতে মদিনায় হিজরত করে সামান্যতম দ্বীন প্রচারে সুযোগ পেয়েই সর্বপ্রথম মসজিদে কোবা প্রতিষ্ঠা করেন।

এ সর্ম্পকে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

لمسجد اسّس على التقوى من اوّل يوم

"কোবা মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন হতেই স্থাপিত হয়েছে তাকওয়ার উপর।"[২]

মদিনা শরীফে গিয়ে সর্বপ্রথম যে কাজ করেছেন তাও মসজিদে নববী।রাসূলল্লাহ (স:) এর আদেশ ও উৎসাহে অনুপ্রণিত হয়ে সাহাবীরাও স্ব স্ব এলাকায় মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। আরব দেশে দেখা যায় প্রতিটি ইসলাম, মুসলিম এবং রাসূলল্লাহ (স:) এর সৃতি বিজরিত স্থানে মসজিদ তৈরী করা হয়েছে। যুগে যুগে আল্লাহর অলিরাও কুর'আন হাদীস এবং সাহবায়েকেরামের অনুসরণে অসংখ্য মসজিদ গড়ে তোলেন। সেই হিসেবে শাহ সাহেব(র:) "মসজিদে বায়তুল্লাহ" নামে একটি মসজিদ নিমার্ণ করেন। যার আয়তন উত্তর- দক্ষিণে ১৮০ফুট পূর্ব পশ্চিমে ১২৫ ফুট উচ্চতা ৩ ফুট। প্রায় ৫০০০ পাঁচ হাজার মুসল্লি এক সাথে নামায পড়তে পারেন।[৩] শাহ সাহেব (র:) মসজিদের ভিত্তি দেয়ার সময় কান্নি দিয়ে সাতবার মসল্লা দিয়ে বারবার سبع سماوات ছবয়া সামাওয়াত (সাত আসমান) বলে সাত তলা মসজিদের আশা করেছিলেন।[৪] মসজিদে নববীতে আসহাবে মুফফা যেমন জ্ঞান আহরণ এবং বিতরণে ভূমিকা রেখেছিল সেই আদলে শাহ সাহেব ও মসজিদ বায়তুল্লাহ প্রতিষ্ঠা করেন।

এই মসজিদে বায়তুল্লাহয় জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসের পুরুষ্কার প্রাপ্ত হযরত মাওলানা আব্দুল হাই নিজামী যোগ্য ও দক্ষ, আলেম-ওলামা তৈরীর লক্ষে বিভিন্ন র্কোসের মাধ্যমে শিক্ষা

---

১. আল-কুর'আন, সূরা আল ইমরান, আয়াত: ৯৬।
২. আল- কুর'আন, সূরা আত- তাওবাহ, আয়াত : ১০৮।
৩. মিয়া গোলাম কবির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১
৪. আহমুদল ইসলাম চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২

চালু করেছেন। এ রকম আরো অনেক মসজিদ আছে যেগুলো হযরত শাহ সাহেব (র:) প্রতিষ্ঠা করেছেন অথবা পৃষ্ঠ পেষকতা করেছেন। মসজিদসমূহের বার্ষিক সভায় উপস্থিত হয়ে অকাতরে না গুণে টাকা দান করতেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ওয়াজ নছিহত ও ধর্মীয় মাহফিল চালু রাখা

হযরত শাহ সাহেব (র:) অনন্য সাধারণ একজন আল্লাহর অলি ছিলেন। তিনি সবসময় মানুষের হেদায়তের চিন্তায় বিভোর থাকতেন। তাই তিনি বিভিন্ন মাহফিল চালু করেন। তন্মধ্যে উল্লেখ যোগ্য মাহফিলগুলো উল্লেখ করা হল।

দশ মহররম তথা আশুরা

আরবি নববর্ষের প্রথম মাস 'মহররম'। এর ১০ তারিখ আশুরা নামে পরিচিত। এই দিনে পৃথিবী সৃষ্টিসহ অনেক নবীকে বিপদ হতে মুক্তিসহ অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছে। রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার পূর্বে আশুরার ১০ তারিখের রোযা ফরয ছিল।

রাসূলল্লাহ (স:) বলেছেন,

عن ابى هريرة (رضـ) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصّيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرّم (رواه المسلم)

"হযরত আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলল্লাহ (স:) ইরশাদ করেন- রমজানের রোজার পর সর্বশ্রেষ্ঠ রোজা হল আল্লাহর মাস মহররম মাসের রোযা।"[১]

আরেক হাদীসে রাসূলল্লাহ (স:) বলেছেন,

صيام يوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفّر السنة التى قبله

"রাসূলল্লাহ (স:) বলেছেন, আমি আল্লাহর দরবারে আশারাখি আশুরার রোজ উহার পূর্ববর্তী বৎসরের গোনার কাফফারা হবে।"[২]

রাসূলল্লাহ (স:) আরো বলেছেন-

من وسّع على عياله فى النّفقة يوم عشوراء وسّع الله عليه سائر سنته-

"যে ব্যাক্তি আশুরার দিনে পরিবার পরিজনের জন্য মুক্ত হস্তে ব্যায় করবে আল্লাহ তায়ালা পূর্ণ বৎসর তাকে সচ্চলতা দান করবেন।"[৩]

সবকিছু ছড়িয়ে এই দিনে সবচেয়ে হৃদয় বিধারক মর্মান্তিক ঘটনা হল ৬১ হিজরীর ১০ মুহররম হযরত হুসাইন (রা.) কারাবালার ময়দানে নির্মমভাবে শাহাদত বরণ করা। ফলে আশুরা মুক্তি

---

১. *সুনানে তিরমিযী* ,মুসলিম, হাদীস নং ১১৬৩
২. *সহীহ মুসলীম*, হাদীস নং ১১৬২।
৩. তাবরানি,*মু'জমুল আওসাত*।

দিবস শোক দিবসে পরিণত নয়। ইসলামে কোন শোক দিবস নেই। হযরত হুসাইন (রা:) কারবালা ময়দানে শহীদ হয়ে প্রকৃত পক্ষে সত্য প্রতিষ্ঠা করা, অন্যয়ের প্রতিবাদ করা, জুলম-অত্যাচার প্রতিরোধ করা, আন্যায়ে সাথে জীবন গেলেও আপোষ না করা, সত্যও ন্যায়ের জন্য প্রয়োজনে জীবনের মায়া ত্যাগ করা, ইত্যাদি শিক্ষা দিয়েছেন।

খাজা মঈন উদ্দীন শিতি (র:) সংক্ষেপে কারবালার শিক্ষা বলতে গিয়ে বলেছেন,

سرداد نہ داد دست در دست یزید

حق آکه بنایے لا الہ است حسین

"হযরত হুসাইন (রা:) কারবালার ময়াদানে মাথা দিয়েছেন, ইয়াজিদের হতে হাত মিলায়নি তথা সমজোতা করেনি, চরম সত্য হল হযরত হুসাইন (রা:)।" কারবালার ময়দানে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই অর্থাৎ কলমার দাবী বাস্তবায়ন করেছেন।

কারবালার শিক্ষা সর্ম্পকে কাজী নজরুল ইসলাম 'মুহররম' কবিতায় লিখেছেন

"ফিরে এলো আজ সেই মুহররম মহিনা

ত্যাগ চাই মর্সিয়া ক্রন্দন চাহি না।"

ভোগে সুখ নয় ত্যাগেই সুখ মহররমের শিক্ষা। কারবালার শিক্ষা সর্ম্পকে মুহাম্মদ আলী জওহর বলেন-

قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے

اسلام زندہ ہوتاہے ہرکر بلاکے بعد

"হুসাইন (রা:) এর শাহাদতে মূলত এযিদের মৃত্যুই হয়েছে। কারণ প্রতিটি কারবালার পরেই ইসলাম পূর্ণ জীবন লাভ করে।"

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় আমরা কারবালারে শিক্ষা ভুলে অনুষ্ঠান সর্বস্ব তাজিয়া বা অবৈধ হারাম শোক মিছিলের মাধ্যমে হায় হুসেন রক্ত মেখে ইত্যাদির মাধ্যমে শোক প্রকাশ করি। অথচ শোক তিন দিন। কারবালার উল্লেখিত প্রকৃত শিক্ষাকে মানুষের সমনে তুলে ধরার জন্য প্রতি বছর ১০ মুহররম শোহাদায়ে কারবালার স্মরণে চুনতী সিরাত ময়দানে মাহফিল প্রর্বতন করেন। যা বর্তমানেও চালু আছে।

২৩ সফর: হযরত শাহ সাহেব (র:) এর ইসালে সওয়াব মাহফিল

ইসাল অর্থ পৌছনো আর ছওয়াব অর্থ সওয়াব এক সাথে ইসালে সওয়াব অর্থ সওয়াব পৌছানো। পরিভাষায় ইসালে সওয়াব হল মরহুমের কল্যানে নেক আমল সৎকর্ম বা ইবাদত বন্দেগী করে তা উক্ত ব্যক্তির জন্য উৎর্সগ করা। এই সর্ম্পকে হানফি মাযহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম তাহাবি (র:) বলেন

للانسان ان يحعل ثواب عمله لغيره عند أهل السّنّة والجماعة صلوة كان أوصوما أوحجّا أو صدقة أوقرأة للقران أو الأذكار أو غير ذالك من انواع البرّ ويصل ذالك الى الميّت وينفه-

"কোন মানুষের নিজের নেক আমলের সওয়াব অন্যের নিকট পৌছানো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে জায়েজ। চাই ঐ আমল নামায হওক বা রোজা, হজ্ব, দান - সদকাহ, কুর'আন তিলাওয়াত বা জিকির আজকার বা এগুলু ছাড়া যে কোন নেক আমল হওক এ সব আমলের সওয়াব মরহুম মৃত ব্যক্তির নিকট পৌছে এবং তাকে উপকৃত করে।"[১]

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

والذين جاؤا من بعدهم يقولون ربّنا اغفر لنا ولاخوا ننا الذين سبقون بالايمان-

"যারা আমাদের পরে এসেছে তারা বলে, হে আমাদের প্রতি পালক আমাদেরকে ও আমাদের পূর্বে যে সকল আমাদের ভাইরা ইমানের সাথে কবর বাসী হয়েছেন তাদেরকে ক্ষমা কর।"[২]

এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মরহুমদের ক্ষমার জন্য দু'আ করতে মানুষদেরকে উৎসাহিত করেছেন।

হযরত আবু উসাইদ (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, বনুসালামা গোত্রের এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসুল্লাহ, আমার পিতা মাতার মৃত্যুর পর এমন কোন কল্যান মূলক কাজ কী আছে, যা করলে তাদের উপকার হবে? রাসূলল্লাহ (স:) উত্তর দিলেন,

نعم الصلوة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدها من بعدهما وصلة الرحم التى لاتوصل الابهما واكرام صديقهما-

"'হ্যা, আছে! তা হলো, তাদের উভয়ের জন্য আল্লাহর রহমত প্রার্থনা করা, উভয়ের মগফিরাতের জন্য দু'আ করা, তাদের কৃত ওয়াদা পূর্ণ করা, তাদের আত্মীয় স্বজনের সাথে সুসর্ম্পক রাখা ও তাদের বন্ধু বান্ধবদের সম্মান করা।"[১]

---

১. ইমাম তাহাবী (র:), *হাশিয়ায়ে তাহাবী*, পৃ: ৩৭৬।

২. সূরা আল কুর'আন, সূরা আল হাশর, আয়াত-১০।

হযরত আবু হুরাইরা(রা:) হতে বর্ণিত, রাসূলল্লাহ (স:) ইরশাদ করেন,

إن ممّا يلحق المؤمن من عمله وحسنايه بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالها تركه ومصحفا ورّثه أو مسجدا بناه أو بيتا لأبن السّبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله فى صحّته وحياته يلحقه من بعد موته

মুমিনের ইন্তেকালের পর যে সব সৎর্কম তার কাছে পৌছে তাহল ০১. জ্ঞান ০২. কুর'আন শরিফ যা সে দান করেছে।

০৩. তাঁর নির্মিত মসজিদ ০৪. তাঁর খননকরা খাল ০৫. তাঁর নিমির্ত মুসাফিরদের জন্য সরাইখানা ০৬. তাঁর সম্পদ থেকে দান করা সদকাহ্ মানুষরা তার মৃত্যুর পর তা হতে উপকার পেতে থাকে।[২]

হযরত আয়েশা (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন,

انّ دجلا قال للنبىّ صلى الله عليه وسلم انّ امّى افتلتبت نفسها واظنها لو تكلّمت تصدّقت فهل كها أجر إن تصدّقت عنها قال نعم

"জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসুলুল্লাহ আমার মা হঠাৎ মৃত্যুবরণ করেছেন, কোন কিছু দান করে যেতে পারেনি, আমার মনে হয় যদি তিনি কথা বলতে পারতেন, তাহলে কিছু সদকাহ করার নির্দেশ দিতেন। এখন আমি যদি তার পক্ষ থেকে সদকাহ করি, তাহলে তিনি কী তাদিয়ে উপকৃত হবেন? রাসূলল্লাহ (স:) বললেন হ্যাঁ।"[৩] অনুরূপভাবে মরহুমদের জন্য কুরবানী করা হলে তার কল্যান ও তাদের কাছে পৌঁছে।

হযরত আয়েশা ও আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বণির্ত তারা বলেন,

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا إراد أن يضحّى اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أمحين موجؤين فدبح أحدهما عن أمّته عن شهد لله بالتوجيد وشهد له بالبلاع ودبح الاخر عن محمد وعن الامحمد صلى الله عليه وسلم

"রাসূলল্লাহ (স:) যখন কুরবানি দিতে ইচ্ছা করলেন, তখন দুটো দুম্বা ক্রয় করলেন, যা ছিল বড়, হৃষ্ট পুষ্ট শিংওয়ালা, সাদা কালো বর্ণের ও খাসি, একটা তিনি তার ঐ সকল উম্মতের জন্য কুরবানি করলেন, যারা আল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং তাঁর রিসালত পৌঁছে

---

১. সুনানু আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৪৭৬, সুনানু ইবনে মাজাহ, কিতাবুল আদব, হাদীস নং ৩৬৫৪।

২. *সুনানু ইবনে মাজাহ*, হাদীস নং ২৩৮, সহীহ ইবনে হুজাইমা, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ২২৯৩।

৩. *সহীহ বুখারী*, কিতাবুল জানায়িয, হাদীস নং ১২৯৯, *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ১৬৭২ কিতাবুল ওয়াসিয়্যাত হাদীস নং: ৩০৮৩।

দেয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছে। অন্যটি তিনি তাঁর নিজের ও পরিবার বর্গের জন্য কুরবানি করেছেন।"[১]

অনুরূপভাবে মরহুমের পক্ষ থেকে হজ্ব ও 'উমরা করা হলে তাঁর কল্যাণ তাদের কাছে পৌঁছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أن امرأة من جهينة حاءت الى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت إن امى نذرت ان تحج فلم تحجّ حتى ماتت أفأحجّ عنها فقال نعم حجّى عنها أرأيت لوكان على أمّك دين أكنت قاضية اقضوا الله فالله أحق بالوفاء-

"জনৈকো মহিলা হজ্ব করার মানত করেই মারা গিয়েছিল। এরপর তার ভাই রাসূলল্লাহ (স:) এর কাছে এ ব্যাপারে জানতে চাইলেন। তিনি বললেন, তুমি কি মনে করো তোমার বোনের কোন ঋণ থাকে, তা কি তুমি আদায় করে দেবে? লোকটি বলল, হ্যাঁ, অবশ্যই। তখন রাসূলল্লাহ (স:) বললেন, তাহলে আল্লাহর হকও তোমরা আদায় কর। অধিকন্তু তাঁর হক আদায় করা অধিকতর প্রয়োজনীয়।"[২]

কোন ব্যক্তির ইসালে সওয়াব একা করলে তাতেও ফায়দা আছে আর সম্মিলিত ভাবে করলে তাতেও লাভ আছে। অধিক সংখ্যক লোকের দু'আ আল্লাহ কবুল কারেন এবং তাদের মধ্যে যদি কোন আলেম বা ওলি থাকেন তার সম্মানে সকলের দু'আ কবুল হয়। রাসূলল্লাহ (স:) বলেছেন,

يد الله على الجمعات-

"বড় দলের উপর আল্লাহর রহমত।"[৩]

এইসব কুর'আন হাদীস মাসয়ালা ইত্যাদি সব বিবেচনা করে শাহ সাহেব (র:) এর ইন্তেকালের পর হতে প্রতিবছর ২৩ সফর তাঁর ইন্তেকালের দিন ইসালে সওয়াব মাহফিল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। যাতে খতমে কুর'আন ও বোখারী শরীফ জিয়াফত সহ ও শাহ সাহেব (র:) এর একান্ত খাদেম হযরত মাওলানা অধ্যক্ষ কাজী মুহাম্মদ নাছির উদ্দীন (ম.জি.আ) এর উদ্যেগে ও ব্যবস্থাপনার শাহ সাহেব (র:) মোবারক জীবনের উপর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসার কামিলের মুহাদ্দিস ও ছাত্রদের উদ্যেগে প্রতিবছর শাহ সাহেব

১. *সুনান ইবনে মাজাহ*, কিতাবুল আদাহি, হাদীস নং ৩১১৩, *মুসনদে আহমদ*, হাদীস নং ২৪৬৬।
২. *সুনানু নসাঈ*, কিতাবুল মানসিক, হাদীস নং ২৫৮৫।
৩. *সুনানে তিরমিজী*,হাদীস নং: ২১৬৬।

(রহ:) এর অবদানের কৃতজ্ঞতা স্বরুপ ইসালে সওয়াবের উদ্দেশ্য বোখারী শরীফের খতম পড়ে আসছে।

ফাতেহায়ে এয়াজদাহম

কুর'আন শরীফে আল্লাহ তায়ালা ২৫ জন নবী রাসূলের জীবনী আলোচনার কারণ বর্ণনা করে বলেন,

وكلا نقصّ عليك من أنباء الرّسل ما نثبت به فوادك وجاءك فى هذه الحق ومو عظة وذكرى للمؤمنين

"রাসূলগণের ঐ সকল বৃত্তান্ত আমি তোমাদের নিকট বর্ণনা করেছি, যা দ্বারা আমি তোমাদের চিত্তকে দৃঢ় করি, এর মাধ্যমে তোমার নিকট এসেছে সত্য এবং মুমিনদের জন্য এসেছে উপদেশ ও সাবধান বাণী।"[১]

মহানবী (স:) বলেছেন,

اذكر محا سن موتاكم

"তোমারা মরহুমের ভাল দিকগুলো স্মারণ কর।"[২]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মসউদ (র:) বলেন, হাদীসে মত্তকুফ

من كان مستنا فليستن بمن قد مات فان الحى لاتؤمن عليه الفتنة۔

"যে ব্যক্তি অন্য কারো নিয়ম নীতি অনুসরণ করতে চায়, সে যেন যারা ইন্তেকাল করেছেন এমন ভাল মানুষদের নিয়ম নীতি মান্য করে চলে। কেননা জীবিত ব্যক্তি ফিতনা হতে নিরাপদ নয়।"[৩]

আরবিতে একটি প্রবাদ আছে,

قصص الاولين مواعظ للاخرين

"পূর্ববর্তীদের কাহিনি পরবর্তীদের জন্য শিক্ষা।"

হযরত শাহ সাহেব (র:) উল্লেখিত কুআরান, হাদীস ও উক্তিকে সামনে নিয়ে প্রতি আরবি রবিউস সানি মাসের **১১** তারিখ বড় পীর সাহেব্ আব্দুল কাদের জিলানী(র:) এর ওয়াফাত

---

১. আল- কুর'আন, সূরা হুদ আয়াত: ১২০।
২. বাইহাকী, শুয়াবুল ইমান, হাদীস নং: ১০৫১৯।
৩. ইমাম রাজিন হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, আবু নাঈম,খুলয়াতুল আউলিয়া ১/১৩৬।

বার্ষীকী উপলক্ষে ইসালে সাওয়াব মাহফিল ও আলোচনা সভার আয়োজন করেছিলেন যা এখনো চালু আছে।

শবে বরা'আত বা লাইলাতুল বারা'আত

প্রতি আরবি বছরের ১৫ তারিখের রাতকে শবে বরাত বলে। এ রাতের নাম হাদীস শরীফে এসেছে ليلة من نصف شعبان অর্থাৎ শাবান মাসের মধ্যরাত। অবশ্য তফেসীরের কিতাবে লায়লাতুল বারা'আত নাম পাওয়া যায়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) ই এটাকে ليلة البرئة লাইলাতুল বরা'আত নামে অভিহিত করেন, রাসূলল্লাহ (স:) এ মাসে বেশি রোযা রাখতেন।

এই রাতের মর্যাদ সর্ম্পকে রাসূলল্লাহ (স:) হাদীস শরীফে বলেছেন -

اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقو موا ليلها وصوموا انها رها، فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس الى سماء الدّنيا فيقول: ألامن مستغفر لى فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلى فأعافيه ألاكذا ألاكذا حتى يطلع الفجر-

"যখন শাবান মাসের মধ্যরাতের অগমন ঘটে, তখন তোমরা সে রাতে জাগ্রত থেকে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকো এবং দিনের বেলায় রোজা রাখ। অতঃপর নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সেদিন সূর্যাস্তের পর প্রথম আসমানে অবতরণ করে বলেন; তোমাদের মাঝে কেউ কি গুনাহ ক্ষমা চাওয়ার আছ? আমার কাছে ক্ষমা চাও। আমি ক্ষমা করে দিব। কোন রিযিক তালাশ কারী আছ? আমি তাকে রিযিক দিব। কোন বিপদগ্রস্থ আছ? আমি তাকে বিপদ হতে মুক্তি দিব। এভাবে ভোর হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে বিভিন্ন বিষয়ে ঘোষণা অব্যাহত থাকে।"[১]

জালাল উদ্দীন সুয়ুতী, শাইখ আব্দুল হক মুহাদেস দেহলভী, মাওলানা আশরফ আলী থানভী (র:) সহ অধিকাংশ আলেমের মতে এ রাতে ইবাদত করা মুস্তাহাব। এরাতে রাসূলল্লাহ (স:) নামায দীর্ঘ সিজদা ও আহলে বকিদের জন্য ইস্তিগফার করেছেন। রাসূলল্লাহ (স:) বলেছেন,

১. *সুনানে ইবনে মাজাহ*, হাদীস নং ১৩৭৮।

وقال عليه الصّلوة والسلام فى هذه الّيلة يعنى ليلة النصف من شعبان ان يكتب كل مولود بنى ادم فى هذه السنة وفيها ان يكتب كل ها لك من بنى ادم فى هذه السّنة وفيها تزفع اعمالهم وفيها تنزل ارزا قهم الحديث-

"রাসুল(স:) ১৫ শাবানের রাত সর্ম্পকে ইরশাদ করেছেন, এই বছর যারা জন্ম এবং মৃত্যু হবে তাদের সংখ্যা লেখা হয়। এই রাতে সারা বছরের আমল উঠিয়ে নেয়া হয় এবং তাদেরকে রিযিক দেয়া হয়।"

এই সব গুরুত্বকে সামনে রেখে শাহ সাহেব (র:) প্রতিবছর ১৪তারিখ দিবাগত রাতে লায়লাতুল বরা'আতের গুরুত্ব ও ফযিলতের উপর স্বনামধন্য ওলামায়ে কেরামগণকে দাওয়াত দিয়ে হযরত শাহ সাহেব (র:) ওয়াজের ব্যবস্থা করেছিলেন। সাথে সাথে তবরুকও বিতরণ হত। বর্তমানেও এই মাহফিল চালু আছে।

লায়লাতুল কদর (শবে কদর)

শব শব্দটি ফার্সি আর কদর শব্দটি আরবি যার অর্থ মর্যাদা সম্মান ইত্যাদি। কুর'আন শরীফ এই রাতেই নাযিল হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা কুর'আন শরীফ বলেন,

إنا انزلناه فى ليله القدر

"আমি এই (কুরআন) কে কদরের রাতে অবতরণ করেছি।"[১]

এই রাত সর্ম্পকে আল্লাহ একটি পূর্ণাঙ্গ সুরা নাযিল করেছেন।

হাদীস শরীফে এই রাত সর্ম্পকে বলা হয়েছে- هى الّيلة الّتى تقدّر فيها الأرزاق وتقضى অর্থাৎ এই রাতে বান্দার রিযিক নির্ধারণ ও ফয়সালা করা হয়। -২

এ রাতের নির্ধারিত কোন তারিখ নেই। তাবে বিভিন্ন বর্ণনা মতে বিভিন্ন তারিখে হওয়ার সম্ভাবনা পাওয়া যায়, যেমন আয়েশা (রা:) হতে বর্ণিত রাসূলল্লাহ (স:) ইরশাদ করেছেন,

تحرّوا ليلة القدر فى الوتر من العشر الأواخر من رمضان-

"তোমরা রমাজানের শেষ দশকের বেজোড় রাত গুলোতে লাইলতুল কদর তালাশ কর।"[২]

বিজোড় রাত হল ২১.২৩.২৫.২৭.২৯ রমযান। এ জন্য রাসূলল্লাহ (স:) রমজানের শেষ দশদিন ইতিকাফ করতেন। অধিকাংশ আলিম বিশেষ করে ইমাম আবু হানিফা (র:) এর মতে শবে কদর রমজানের ২৭ তারিখের রাতই। হাদীস শরীফে এ রাতের অনেক গুরুত্ব ও

১. আল কুর'আন, সূরা কদর, আয়াত: ০১।
২. *সহীহ আল বোখারী*, হাদীস নং ২০১৭।

ফাযিলতের কথা বর্ণিত হয়েছে। হযরত আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত রাসূলল্লাহ (স:) বলেছেন,

من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدّم من ذنبه

"যে ব্যাক্তি কদর রাতে ইমানসহ সওয়াবের নিয়তে ইবাদতের জন্য দাঁড়াবে তাঁর অতীতের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"[১]

হযরত আনছ ইবনে মালিক (রা:) হতে বর্ণিত রাসূলল্লাহ (স:) বলেছেন,

إن هذا الشّهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير كلّه ولا يحرم خيرها إلّا محروم-

"তোমাদের মাঝে এ মাস (রমযান) এসেছে। এ মাসের মধ্যে এমন একটি রাত আছে। যা হাজার মাস থেকেও উত্তম। যে ব্যাক্তি এ রাত থেকে বঞ্চিত হবে সে সমগ্র কল্যাণ ও বরকত থেকে বঞ্চিত হবে। এর কল্যাণ হতে একমাত্র হত ভাগা লোক ছাড়া আর কেউ বঞ্চিত হয় না।"[২]

এ রাতের আমল সর্ম্পকে আল্লামা আলুসী (রহ:) (১৮৩২-১৮৫৮খ্রি) তাঁর *তাফসীরে রহুল মা'আনী* গ্রন্থে বলেন। কদরের রাতে সব ধরণের ইবাদত করা উচিৎ, যেমন নফল নামায, পবিত্র কুর'আন তিলাওয়াত, তাসবীহ তাহলীল ক্ষমা প্রার্থনা ও দু'আ ইত্যাদি। এক কথা এই রাতে যত ইবাদত করা যায় ততই ভাল।

রাসূলল্লাহ (স:) বেশী বেশী এই পড়ার জন্য বলেছেন।

اللهم إنك عفوّ كريم تحب العفو فاعف عنّى-

"হে আল্লাহ,তুমি তো ক্ষমাশীল- দয়ালু ক্ষমাকরা ভালবাস তাই আমাকে ক্ষমা কর।"[৩]

শাহ সাহেব (র:) প্রতি আরবি বছর ২৬ তারিখ দিনগত রাত ২৭ রমজান মাহফিলের আয়োজন করেন। এতে বক্তারা লায়লতুল কদরে গুরুত্ব ফযিলত করণীয় ও বর্জনীয় সর্ম্পকে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। বর্তমানেও মাহফিল সিরাত ময়দানে চালু আছে।

মে'রাজুন্নবী (স:) মাহফিল

১. *সহীহ আল বুখারী*, হাদীস নং ১৯০১।
২. *সুনানে ইবনে মাজাহ*, আব্দুর রাজ্জাক,হাদীস নং: ৭৭৩৯।
৩. *সুনানু তিরমিজী*, হাদীস নং ৩৪৩৫।

মিরাজুন্নবী (স:) ইসলাম মুসলমান ও মহানবী (স:) এর জীবনে এক বিশেষ তাৎপর্যবহ ঘটনা। মি'রাজ (معراج) শব্দটি আরবি একবচন এর বহুবচন মাআ'রিজ (معارج) ।শব্দটি (عرج) মূলধাতু হতে উৎপাত্তি অর্থ সিঁড়ি মই লিফট (lift) ইমাম রাগেব বলেন,[১]

ذهاب فى صعود অর্থাৎ উপরে উঠা বা যাওয়া। পরিভাষায় মিরাজ বলা হয় মহানবী(স:) মক্কা হতে বায়তুল মুকাদ্দিস যাওয়া সেখান হতে সাত আসমান ভ্রমন করে আল্লাহ তায়ালার সাথে সাক্ষাত হওয়ার ঘটনাকে মিরাজ বলে। মিরাজ সংঘঠিত হওয়ার সময় কাল সর্ম্পকে বিভিন্ন মতামত থাকলেও আল্লামা যুরকানি (১৬৪৫খ্রি.-১৭১০খ্রি.) বলেন নবুয়তের ১২ তম বছরে রজব মাসের ২৭ তারিখেই সর্বধিক প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য অভিমত।[২] এ রাতে বেশী বেশী নফল নামায পড়া, রোজা রাখা, কুর'আন তিলাওয়াত করা, দান সদকা করা, যিকির আযকার করা, দু'আ দরুদ পড়া ইত্যাদি আমল করা।

এই রাত সম্পর্কে কুর'আন শরীফে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله لنريه من اياتنا إنه هوا السميع البصير-

"পবিত্র ও মহিমময় তিনি যিনি তার বান্দাকে রাতে মসজিদুল হারাম (কাবা শরীফ) হতে মসজিদুল আকসা (বায়তুল মুকাদ্দাস) পযর্ন্ত ভ্রমণ করিয়েছিলেন। যার চার পাশে আমি বরকত দিয়ে পূর্ণ করে দিয়েছি। তাঁকে আমার নিদর্শন সমূহ দেখানোর জন্য। তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।"[৩]

শাহ সাহেব (র:) এই সব গুরুত্ব ও ফজিলতকে সামনে রেখে ১৯৭৫ খ্রি. হতে প্রতি আরবী মাসের ২৬ রজব দিন গত রাতে মে'রাজুন্নবী (স:) অতি সম্মানের সাথে পালন করতেন। তিনি রজব মাসের চাঁদ উঠলেই মে'রাজের বর্ণনার উল্লেখিত কুর'আন শরীফের আয়ত পড়তে থাকতেন। তিনি বলতেন, মে'রাজের হরফ পাঁচটি মিম+ আইন+ রা+ আলিফ+ জিম একত্রে মিরাজ শব্দ গঠিত হয়। মি'রাজের নামেই মিরাজের প্রমাণ,যথা মীম অর্থ মুহাম্মদ(স:) আইন অর্থ আরশ মুয়াল্লা, রা অথ রাত্রিতে আলিফ অর্থ আল্লাহর নিকট, জিম অর্থ জাগ্রত অবস্থায়

---

১. আহমুদল ইসলাম চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭-১১৮

২. শিহাব উদ্দীন আল কস্তলানী,*আল মওয়াহিবুল লদুনিয়া* (কায়ারো: আল মাকতাবাতু তাওফিকিয়া ২০১০), ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০৭

৩. আল কুর'আন সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত.০১।

মিরজ। হযরত শাহ সাহেব (র:) মেরাজের রাত্রিতে খ্যাতনামা ওয়ায়েজীনে কেরামগণকে দাওয়াত করে সারারাত ব্যাপী ওয়াজ করাতেন। রাসূলল্লাহ (স:) এর জিয়াফত স্বরুপ ৪/ ৫ টি বড় বড় গরু জবেহ করে মেহমানদের খাওয়ানো হত। শাহ সাহেব (র:) নিজেই বসে সারারাত অভিজ্ঞ ও উন্নত আমলের অধিকারী ওলমায়ে কেরামগণের গুরুত্ব র্পূণ ওয়াজ শুনতেন । প্রতি বছর এ মাহফিলে দারুল উলূম কামিল মাদরাসা, চট্টগ্রামের প্রধান মুহাদ্দিস মুফতি মাওলানা মুহাম্মদ আমিন (র:) তশরিফ আনলে শাহ সাহেব (র:) তাঁকে নিজের শিক্ষকের প্রতি সম্মান প্রর্দশন করে নিজের নির্ধারিত চেয়ারে বসাতেন। শাহ সাহেব (র:) এর ইন্তেকালের পর তাঁর নিষ্ঠাবান ভক্তগণ বিশেষ করে তাঁর একান্ত খাদেম হযরত মাওলানা অধ্যক্ষ কাজী মাওলানা নাছির উদ্দীন (ম.জি.আ.) সুচারুরূপে জাঁকঝমক করে তা এখনো চালু রেখেছেন। জ্ঞানী- গুণী ওলমায়ে কেরাম গণের ওয়াজ নসিহত এবং যিয়াফত প্রথা এখনো পর্যন্ত চালু আছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মুসলমানদের ঐক্যের প্রয়াস

হযরত শাহ সাহেব (র:) আহলে সুন্নাত ওয়াল জমায়াতের অনুসারী ছিলেন। রাসূলল্লাহ (স:) হাদীস শরীফে বলেছেন,

خير الامور او سطها

"কাজের মধ্যে মধ্যপন্থার কাজই সর্বোত্তম।"

শাহ সাহেব (র:) ও মধ্যম পন্থী ছিলেন। শাহ সাহেব (র:) শাখাগত বিষয়ে টানাটানিও দলাদলি পছন্দ করতেন না। হানফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। শাহ সাহেব (র:) রাজনৈতিক দৃষ্টি ভঙ্গির অনেক উর্ধ্বে ছিলেন। মুসলমানদের ঐক্যের ব্যাপরে তিনি আপোষহীন ভলিষ্ট ভূমিকা রাখেন।

শাহ সাহেব (র:) সব সময় উদার পন্থী ছিলেন। কোন দলের মতের পক্ষে ছিলেন না, যা সত্য তা বলতেন। আল্লাহকে ছাড়া কাউকে ভয় করতেন না। প্রত্যেক দলের ওলমায়েকেরাম ও সুধী জনকে তাঁর প্রবর্তীত মাহফিল সমূহে দাওয়াত দিতেন। কাঁদা ছোড়া ছোড়ি করতেন না। কারো প্রতি বদদেয়া করতেন না সবসময় ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য উৎসাহ দিয়ে প্রচেষ্টা চালাতেন, তাঁর প্রবতীর্ত বিশেষ করে সিরাতুন্নবী (স:) এর কর্মসূচী পর্যালোচনা করলেই সেটা বুঝা যায়। যখন মুসলমান কোন নেতৃত্ব না পেয়ে দিশাহারা হয়ে গিয়েছিল। তখনি শাহ সাহেব (র:) সিরাত আন্দোলনের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। মাওলানা শফিউল্লাহ, খতীব, নোয়াখালী, চৌমুহনী বড় মসজিদ তিনি মন্তব্য করেছিলেন ১৯৭৬ খ্রি সিরতুন্নবী (স:) মাহফিলে, বিভিন্ন মতামতের আলেমগণ একই মঞ্চে ওয়াজ করেন যা অকল্পনীয়। বাঘ- ভল্লুক সিংহ- হরিণ, গরু- ছাগল, সকল জীবকে এক জায়গায় একই পুকুরে পানি খাওয়ায়েচ্ছেন তিনি হযরত শাহ সাহেব (র:) চুনতী, তাও আবার মুসলিম জাতীর এই- দুর্দিনে। মাওলানা আলাউদ্দীন আল আজহারী বলেন, সিরাত মাহফিল অত্যন্ত সময় উপযোগী পদক্ষেপ। শাহ সাহেব (র:) এর আহবানে সাড়া দিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এমনকি অমুসলিম দেশে ও অনুষ্ঠিত হচ্ছে। হাদীস শরীফে পাওয়া যায় বঙ্গোপসাগরের উপকূল হতে ইসলামের পুন:জাগরণ হবে এটাই কি সেই স্থান? শাহ সাহেব (র:) বলেন, আমি রাসূলল্লাহ (স:) সীরাত

একা করলে একা লাভবান হতাম, কিন্তু আমি সকলের কথা চিন্তা করে ১৯ দিন ব্যাপী সিরাতুন্নবী (স:) মাহফিল করেছি।[১]

শাহ সাহেব (র:) প্রায়শ বলতেন সিরতুন্নবী (স:) আমি নিজের জন্য করিনি; বরং শেষ জামানার গুনাহগার উম্মতের নাজাতের জন্য করেছি।[২] যখন ইসলামের নাম নেয়াই অপরাধ ছিল এবং ওয়াজ মাহফিল প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে তখন মানুষদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্যই এই সিরতুন্নবী (স:) প্রতিষ্ঠা করেন। শাহ সাহেব (র:) এই ঐক্য প্রচেষ্টার মূল কারণ হল আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ۚ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِۦٓ إِخْوَٰنًا

"তোমার সংঘবদ্ধ ভাবে আল্লাহর দ্বিনকে আকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না, আল্লাহর সে অনুগ্রকে স্বরণ কর যা তিনি তোমাদের প্রতি করেছেন, তোমরা পরস্পর দুশমন ছিলে তিনি তোমাদের অন্তরে ভালবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন ফলে তোমরা তারই অনুগ্রহে পরস্পর ভাই হয়ে গেলে।"[৩]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন,

ومن يعتصم بالله فقد هدى الى صراط مستقيم

"আর যে আল্লাহর রজজুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে সে নিশ্চয় সত্য ও সঠিকপথ প্রদর্শিত হবে।"[৪]

রাসূলল্লাহ (স:) বলেছেন,

يد الله على الجماعة ومن شذ شذ فى النار

"জামাতের উপর আল্লাহ তা,য়ালার রহমত, যে জামাত ছাড়া একা চলে সেতো একাকি দোযখেই ধাবিত হয়।"[৫]

রাসূলল্লাহ (স:) আরো বলেন,

لا اسلام الابجماعة ولا جماعت الابامارة ولا امارة الاّ بطاعة

---

১. মিয়া গোলাম কবির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩-৪৫
২. আহমদুল ইসলাম চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩
৩. আল কুর'আন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১০৩।
৪. আল কুর'আন, আলে ইমারান, আয়াত: ১০১।
৫. *তিরমিযি*, হাদীস নং ২১৬৭।

“সংগঠন ছাড়া ইসলাম নেই। নেতৃত্ব ছাড়াক সংগঠন নেই। অনোগত্য ছাড়া নেতৃত্বে নেই ইত্যাদি।”

আল্লামা ইকবাল (রহ:) বলেন

منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک
ایک ہی سب کا نبی (ص) دین بھی ایمان بھی ایک
حرم پاک بھی قران بھی اللہ بھی ایک
کچہ بڑی بات تی ہوتی جو مسلمان بھی ایک

“জাত হিসেবে মুসলমানের লাভ-ক্ষতি উভয় একই, নবী বল, ধর্ম বল, ঈমান বল সবই একই। কাবা বল, কুর’আন বল, আল্লাহ বল তাহাও একই, তবে কি যে কঠিন ছিল তারাও যদি হত একই।”[১]

১. মাওলানা তমিজুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০,৩১

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নৈতিক আন্দোলনে সমর্থন প্রদান

ইসলামী নৈতিক আন্দোলন ফরজ। নামায রোজা হজ যাকাত যে রকম ফরজ তেমনি নৈতিক আন্দোলন করা ও সমর্থন দেয়া সকল মুসলামনের কর্তব্য। আল্লাহ তায়ালা কুর'আন শরীফে বলেন,

يا ايها النبى جاهد الكفّار والمنافقين واغلظ عليهم وما وهم جهنّم وبئس المصير-

"হে নবী, কাফির ও মুনাফিক উভয়ের বিরোদ্ধে পূর্ণ শক্তিতে জিহাদ কর এবং তাদের সর্ম্পকে কাঠোর নীতি অবলম্বন কর, শেষ পর্যন্ত তাদের পরিণতি হচ্ছে জাহান্নাম আর তা হল অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্থান।"[১]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন,

وجاهدوا فى الله حق جهاده هوا جتبكم وما جعل عليكم الدين من حرج-

"আল্লাহর পথে জিহাদ কর যেমন জিহাদ করা উচিৎ তিনি তোমাদেরকে নিজের কাজের জন্য বাছাই করে নিয়েছেন আর দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা চাপিয়ে দেননি।"[২]

الّا تنصروه فقد نصره الله

اذا اخرجه الذين كفروا

"তোমরা যদি নবির সাহায্য না কর তাহলে সেই জন্য কোন পরওয়া নেই, আল্লাহ সেই সময়ও তার সাহায্য করেছেন যখন কাফিরগণ তাকে বহিস্কার করে দিয়েছিল।"[৩]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন,

ولتكن منكم امّة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون-

"তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল হওয়া উচিৎ যারা মানুষকে মঙ্গলের দিকে আহবান করবে এবং তাদেরকে সৎকাজের আদেশ দিবে ও অসৎ কাজ হতে নিষেধ করবে, তারাই হবে সফলকাম।"[১]

---

১. আল কুর'আন, সুরা তাওবা, আয়াত- ৭৩।
২. আল কুর'আন, সূরা হজ্জ,আয়াত- ৭৮।
৩. আল কুর'আন, সূরা তওবা,আয়াত- ৪০।

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন

لولاينهاهم الرّبانيون والاخبار عن قولهم الاثم واكلهم السّخت- لبئس ماكانوا يصنعون-

"আল্লাহ ওয়ালা ও ধর্ম ভীরুগণ কেন তাদেরকে তাদের অন্যায় কথাবার্তা ও হারাম দব্য ভক্ষণ হতে নিষেধ করে না? নিশ্চয় তাদের ঐ সব কার্য কলাপ অত্যান্ত মন্দ।"[২]

রাসূলল্লাহ (স:) বলেন,

عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان

"আবু সাঈদ খুদরী (রা:) হতে বণির্ত তিনি রাসূলল্লাহ (স:) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলল্লাহ (স:) ইরশাদ করেন, যে ব্যাক্তি কোন মন্দ কাজ দেখবে, সে তা নিজ হাত দ্বারা প্রতিহত করবে। যদি তাতে সে সক্ষম না হয় তবে তার যবান দ্বারা প্রতিহত করবে । যদি সে তাতেও সক্ষম না হয় তবে অন্তর দ্বারা প্রতিহত করার চিন্তা ও পরিকল্পনা করবে। আর এটাই ইমানের দুর্বলতম স্তর।"[৩] রাসূলল্লাহ (স:) আরো বলেন-

عن حذيفة (رضـ) انّ النبى صلى الله عليه وسلم قال واللذى نفسى بيده لتامرنّ بالمعروف ولتنهون عن المنكر او ليؤشكنّ الله ان يبعث عليكم عذابا من عنده ثمّ لتد عنّه ولا يستجاب لكم-

"হযরত হোযায়ফা (রা:) হতে বর্ণিত, নবী (স:) ইরশাদ করেছেন আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি যার নিয়ন্ত্রনে আমার জীবন, অবশ্যই তোমার সৎকাজের আদেশ দিবে অন্যায় ও পাপ কাজ হতে লোককে বিরত রাখবে। নতুবা তোমাদের উপর শীঘ্রয় আল্লাহর আযাব নাযিল হবে অত:পর তোমরা তাহতে নিস্কৃতি পাওয়ার জন্য দু'আ করতে থাকবে। কিন্তু তোমাদের দু'আ কবুল হবে না।"[৪]

রাসূলল্লাহ (স:) আরো বলেছেন,

عن جابر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوحى الله عزّ وجل الى جبريل عليه السّلام أن اقلب مدينة كذا وكذا بأهلها قال ياربّ إنّ فيهم عبدك فلانا لم يعصك طرفة عين، قال اقلبها عليه وعليهم فإنّ وجهه لم يتمعر فى ساعة قطّ

---

১. আল কুর'আন, সূরা আলে ইমরান,আয়াত-১০৪।
২. আল কুর'আন, সূরা মায়েদা, আয়াত-৬৩।
৩. *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং:৪৯।
৪. *জামে তিরমিযী*, হাদীস নং:২১৬৯।

"জাবির ইবনে আব্দিল্লাহ (র:) হতে বর্ণিত রাসূলল্লাহ (স:) বলেন, আল্লাহ তায়ালা জিব্রাইল (আ:) কে বলেন, অমুক অমুক শহরকে তার অধিবাসীদের সহ উল্টিয়ে দাও। তিনি জিব্রাঈল (আ:) বললেন, হে প্রভু তাদের মধ্যে আপনার অমুক অমুক বান্দা আছে যে ব্যক্তি একটি চোখের পলকেও আপনার অবাধ্যতা করেননি। রাসূলল্লাহ (স:) বলেন, তারপর আল্লাহ তায়ালা বললেন, তাকে ও অন্যান্য অধিবাসীদেরসহ উক্ত শহর উল্টিয়ে দাও। কেননা তার মুখমন্ডল কখনই (নিষিদ্ধ কাজের প্রতি ক্রোধে) মলিন হয়নি।"[১]

হযরত শাহ সাহেব (র:) উল্লেখিত কুর'আন ও হাদীসসহ অসংখ্য কুর'আন ও হাদীসের আমল হিসেবে সবসময় নৈতিক অন্দোলনে সর্মথন দান করেন। তিনি আল্লাহ ছাড়া কাউকেই ভয় করতেন না, অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোষহীন। তাঁর এই স্বভাবের কারণে সবার কাছে তিনি গ্রহণ যোগ্য ছিল। শাহ সাহেব (র:) উপলব্দি করেছিলেন, জাতির মুক্তি একমাত্র সিরাত আন্দোলনের মাধ্যমেই সম্ভব। তাই রাসূলল্লাহ (স:) এর জীবনের আর্দশ সঠিকভাবে তুলে ধরাই এর এক মাত্র পন্থা। হযরত শাহ সাহেব (র:) সেই সময় সংগঠিত সব নৈতিক আন্দোলনে সমর্থন যুগিয়েছেন, তিনি রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির অনেক উর্দ্ধে ছিলেন, যে সময় যার ব্যাপারে যেটা মন্তব্য করেছেন সেটাই অবশেষে ঘটেছে। তিনি খন্ড ভাবতের সমর্থক মুসলিম লিগকে পছন্দ করতেন। ১৯৬৩ খ্রি প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের বিরুদ্ধে ফাতেমা জিন্নাহকে দাড় করিয়ে বিরোধী দল যখন আন্দোলনে ঝাপিড়ে পড়ে ছিলতখন শাহ সাহেব (র:) আয়ুব খানকে সমর্থন করেছিলেন। আয়ুব খান নির্বাচিত হয়েছিলেন। শাহ সাহেব (র:) সবসময় বলতেন, রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব আমার হাতে। যার প্রমাণ বাংলাদেশে হওয়ার পর রাষ্ট্রপ্রধান, মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ বারবার তাঁর কাছে এসে দু'আ নিতেন। বিশেষ করে প্রেসিডেন্টে জিয়াউর রহমান ও তাঁর কাছে দু'আ নেয়ার জন্য ভক্তি সহকারে আসতেন। শাহ সাহেব (র:) ও তাঁকে পছন্দ করতেন। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি ডানপন্থি ছিলেন। কিন্তু প্রচলিত উভয়ধারার ডানও বাম রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ শাহ সাহেব (র:) কাছে গিয়ে দু'আ লাভে ধন্য হতেন। সবাই তাঁর কাছে আশ্রয় লাভ করত। অমুসলিমদেরকেও উদারতা ও মানবিক চোখে দেখতেন।

১. তবরানী, বাইহাকী।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আলেম-ওলামার পৃষ্ঠপোষকতা

আলেম শব্দটি আরবী রূপ হল عالم

(علماء) মাসদার العلم অর্থ জ্ঞানী আর ওলামা واحد مذكر এর اسم فاعل হতে باب سمع শব্দটি বহুবচন অর্থ জ্ঞানীগণ

ইসলামে আলেম ও ওলামার মর্যাদা বর্ণনাতীত আল্লাহ তায়ালা কুর'আন শরীফে বলেন-

إنّما يخش الله من عباده العلماء

"আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই আল্লাহ কে ভয় করে।"[১]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

يرفع الله الذين امنوا منكم والّذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير-

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের কে জ্ঞান দান করা হয়েছে তাদের মর্যাদা আল্লাহ বহু বাড়িয়ে দিবেন। তোমাদের সবকজের খবর আল্লাহ রাখেন।"[২]

আলেমে দ্বীনের জন্য আসমান জামিনের সবাই এমনটি পানির নিচের প্রাণীরাও দু'আ করে। রাসূলল্লাহ (স:) বলেছেন,

من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهّل الله طر يقا الى الجنّة وإنّ الملا ئكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم- وإن طالب العلم يستغفر له من فى السّماء والأرض حتّى الحيتان فى الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إنّ العلماء هم ورتة الأنبياء إن الأنبياء لم يورّثوا دينارا ولا درهما إنما ورّثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظّ وافر-

"যদি কেউ ইলম শিখার মানসে কোন পথে চলে তবে আল্লাহ তার জন্যে জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। ফেরেস্তারা ইলম শিক্ষার্থীদের এই কর্মের প্রতি খুশি হয়ে তার জন্য পাখাগুলি বিছিয়ে দেন। আলেমের জন্য আসমান ও যমিনের সকলেই ক্ষমা প্রার্থনা করে। এমনকি পানির মাছও। তারকা রাজির উপর চাঁদের যেমন মর্যাদা সাধারণ ইবাদতকারীর উপর আলেমের তেমন মর্যাদা। আলিমরাই হল নবীদের উত্তরাধিকারী, নবীরা দীনার দেরহাম রেখে যাননি।

---

১. আল কুর'আন, সূরা ফাতির, আয়াত: ২৮।

২. আল কুর'আন, সূরা মুজাদালাহ আয়াত: ১১।

তারা শুধু ইলমের উত্তরাধিকার রেখে যান। কাজেই যে ব্যাক্তি ইলম গ্রহন করল, সে সম্পদের বড় একটি অংশ গ্রহণ করল।"[১]

রাসূলল্লাহ (স:) আরো বলেন-

فقيه واحد اشد على الشيطان من الف عابد-

"একজন ফকীহ শয়তানের বিরুদ্ধে হাজার জন আবেদের চেয়ে ও শক্ত।"[২]

রাসূলল্লাহ (স:) আরো বলেন-

خيركم من تعلّم القران وعلّمه-

"তোমাদের মধ্যে তিনিই সর্বোত্তম, যিনি কুর'আন শিখেন ও শিক্ষা দেন।"[৩]

রাসূলুল্লাহ (স:) আরো বলেন-

من قرأ القران واستظهره فاحل حلاله وحرّم حرامه أدخله الله به الجنّة وشفّعه فى عشرة من اهل بيته كلّهم قد وجبت له النّار-

"যে কুর'আন পড়েছে এবং মুখস্থ করেছে (এর মাধ্যমে দ্বীনের ব্যাপারে শক্তি ও সাহায্য কামনা করেছে)। কোরআনে বর্ণিত হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম হিসেবে আমল করেছে। তাকে আল্লাহ তায়ালা বেহেস্তে প্রবেশ করাবেন এবং তার মুমিন পরিবারের এমন দশজন ব্যাক্তির ব্যাপারে সুপারিশের ক্ষমতা দিবেন যাদের গুনাহের কারণে জাহান্নাম অবধারিত হয়েছে।"[৪]

হযরত 'উমর (রা:) বলেন,

العالم من يعرف الله ويخشاه

"সেই হল জ্ঞানী যে আল্লাহ কে চিনে এবং তাঁকে ভয় করে।"[৫]

হযরত শাহ সাহেব (র:) উল্লেখিত কুর'আন ও হাদীস আমল করে আলেম ওলামাকে খুব বেশী ভালবাসতনে এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। সর্বদা অসংখ্যা আলেম ওলামায় ভরপুর থাকত তার দরবার। যেখানে যেতেন আলেম ওলামা পরিবেষ্টিত থাকতেন আলেমরাও শাহ সাহেব (র:) এর কাছে থেকে নিজেকে ধন্য মনে করতেন। আলেমগণকে তিনি শ্রেণিভেদে

---

১. *তিরমিযী শরীফ*, হাদীস নং ২৫৩৪।
২. *বোখারী শরীফ*, হাদীস নং ২৪৩০।
৩. *ইবনে মাজাহ*, হাদীস নং ২২২।
৪. *তিরমিযী শরীফ*, হাদীস নং ২৯০৫।
৫. *মুসনদে আহমদ*, হাদীস নং ৫৫৪৬২।

আদর যত্ন ও সম্মান করতেন। দেশ বিদেশের স্বনামধন্য পীর বুজুর্গগণ মাহফিলে আগত স্বনামধন্য বক্তা ও মুহাদ্দেস সাহেব গণ তাঁর দরবারে একত্রিত হলে শাহ সাহেব (র:) প্রাণ খুলে কুর'আন ও হাদীস নিয়ে আলোচনা করতেন। শাহ সাহেব (র:) বলতেন, আল্লাহ দিয়া ফন্না আসল ফন্না অর্থাৎ আল্লাহর দেয়া লেখা পাড়াই আসল লেখাপড়া।

এক কথায় বলা যায় শাহ সাহেব (র:) নিজেও আলেম ছিলেন এবং আলেম ওলামার পৃষ্ঠ পোষাক ছিলেন। আলেম উলামাকে অকাতরে দান করতেন। না গুনে দান করতেন।

উপসংহার

হযরত শাহ মাওলানা হাফেজ আহমদ (র:) শিক্ষা বিস্তার, সমাজ সংস্কার, মানব সেবা ও আধ্যাত্মিকতা বিকাশে অসমান্য অবদান রেখে দেশ ও জাতীকে কহুমুখী সেবা দিয়ে গেছেন। চুনতী হাকিমিসা কামিল মাদরাসাকে কামিল স্থরে উন্নিত করণ, ১৯দিন ব্যাপি সিরাতুন্নবী (স.) মাহফিলে বিষয় ভিত্তিক আলোচনার পদ্ধতি চালু করে উন্মুক্ত সর্বসাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থা করা সহ অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা, পৃষ্ঠ পোষকতা করা, প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার জন্য উৎসাহ করার মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তারে শাহ সাহেব পৃ অনন্য অবদান রেখেছেন। অসংখ্য শিক্ষার্থী এসব প্রতিষ্ঠান হতে দ্বীনি ও জাগতিক জ্ঞান অর্জন করে দ্বীন ও মানবসেবার মহান ব্রত নিয়ে দেশ বিদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অসামান্য অবদান রেখে যাচ্ছেন। সাধারণ মানুষরা সিরাত মাহফিলে সঠিক ইসলাম ও ইমান আমল জানতে পেরে সঠিকভাবে ধর্ম কর্ম পালন করছে।

শাহ সাহেব সমাজ সেবায় ও আর্থ মানবতার সেবায় নিজের সমগ্র জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। মানুষের দুর্দিনে কাছে থেকেছেন এবং বিপদ কালে সাহায্য করেছেন। ইসলামী মিশনারী কার্যক্রম মসজিদ, মাদরাসা, হিফজ খানা, এতিমখানা ইত্যাদির প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

সিরতুন্নবী (সঃ) মাহফিলে সবঘরণার আলেম ওলামাকে দাওয়াত দিয়ে ঐক্যবদ্ধ করে বাংদেশে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালান।

শাহ সাহেব (র:) প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান সমূহ ইসলাম বিরোধী কর্মকান্ড যেমন সিরাতুন্নবী (সঃ) মাহফিলে আলোচ্চ বিষয় শিরক ও বিদায়াত থাকার মাধ্যমে সমাজে শিরক ও বিদায়াত সর্ম্পকে উচ্ছেদে সর্বোপরি দেশ ও জনগণের স্বার্থবিরোধী বিভিন্ন কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে আজীবন 'সংগ্রাম করেন।

শাহ সাহেব (র:) প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান সমূহ বিশেষ করে সিরতুন্নবী (স.) মাহফিলে বিভিন্ন বিষয় আলোচিত হওয়ায় অনেক যুগ সমস্যার সমাধান হয়।

ইসলামী সাহিত্য- সংস্কৃতিরচর্চার মানসে প্রতিবছর সিরাতুন্নবী (স.) মাহফিল, মিরাজুন্নবী (স.) মাহফিল, আশুরা ইত্যাদি শাহ সাহেব (র:) কর্তৃক প্রবর্তনের 'মাধ্যমে এইগুলো পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রতিরোধ এবং ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত ইলম, ইসলাম, ঈমান এর খিদমত আনজাম দিয়ে গেছেন এই মহান অধ্যাত্মিক সাধক। অসংখ্য মানুষ তাঁর সংস্পর্শে এসে ইমান ও আমলকে সংশোধন করেছেন। অনেকে চারিত্রিক পরিশীলন ও অধ্যাত্মিক অনুশিলন করে কামালিয়ত (পূর্ণতা) অর্জন করেছেন।

বিস্তৃত পরিধি সম্পন্ন ও বহুগুনে গুণান্বিত ব্যক্তির প্রধান গুণ চিহ্নিত করা গবেষকদের জন্য জটিল হয়। শাহ মাওলানা হাফেজ আহমদ (র:) কে নিয়ে গবেষকরা এ সমস্যায় আবর্তীত হয়েছেন বেশি। তাই তাঁকে মূল্যায়ণ করতে গিয়ে সমকালিন শীর্ষ স্থানীয় উলামায়ে কেরামের দৃষ্টিভঙ্গিতে ও ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। অনেকে বলেছেন তাকে বাংলাদেশের একজন প্রথিতযশা আলেমে দ্বীন, পথপ্রর্দশক, সুন্নতে নববীর একনিষ্ঠ অনুসারী, এবং সংস্কার আন্দোলনের একজন সার্থক সিপাহসালার, আর কেউ সুন্নতের প্রাণ কর্তা বলেছেন, বিনয় ও সৎ সাহসের কথা বলেছেন, আর কেউ ইনসানিয়ত ও মানবতাবোধের প্রতিক বলেছেন, আর কেউ জ্ঞানী গুণীদের পৃষ্ঠপোষক, আধ্যাত্মিক পথপ্রর্দশক ও মহান সমাজ সংস্কারক ইত্যাদি বলেছেন। এসব চরিত্রগুলো পূর্ণপাত্রায় তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

এই রকম মহান ব্যক্তিত্বের মূল প্রকৃতি নিরূপণে গবেষক ও সমালোচকদের মধ্যে মতভেদ থাকা খুবই স্বাভাবিক। হযরত শাহ মাওলানা হাফেজ আহমদ (র:) এর বর্ণাঢ্য কর্মজীবন পর্যালোচনা করলে প্রমাণিত হয় বাংলাদেশের আরবী, ইসলামী ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা বিস্তারের পাশাপাশি মানবসেবার একজন অগ্রসেনানী ছিলেন। তিনি অনৈসলামিক কার্যকলাপ প্রতিরোধ করে 'সমাজে ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুন প্রতিষ্ঠায় অনবদ্য অবদান রেখেছেন। ইললাম প্রচার প্রসারে আল্লাহর দয়ায় সফলভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি সমাজ সংশোধনও সংস্কারে অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তাঁর আর্দশ অনুসরণ করে আল্লাহর প্রিয় বান্দা এবং রাসূলুল্লাহ (স.) এর প্রিয় উম্মাত হওয়া সম্ভব।

কারণ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাছউদ বলেন,

من كان مستنا فليستن بمن قدما فان الحي لا تؤمن عليه الفتنة

“যে ব্যক্তি অন্য কারো নিয়মনীতি অনুপরণ করতে চায়, সে যেন যাঁরা ইন্তেকাল করেছেন এমন (ভালো মানুষদের) নিয়মনীতি মান্য করে চলে। কেননা জীবিত ব্যক্তি ফিৎনা হতে নিরাপদ নয়।”

আরবীতে একটি প্রবাদ বাক্য আছে-

قصص الاولين مواعظ للاخرين

"পূর্ববর্তী লোকদের কাহিনী, পরবর্তীদের জন্য আদেশ।"

এ মহান ধর্মিয় পথপ্রদর্শক আত্মজীবনের অন্তিম মুহূর্তেও নিজের কল্যাণধর্মী প্রতিভাগুলোকে পরিপূর্ণ কার্যকর রেখেছেন। জীবন যুদ্ধের কোনো পর্যায়ে হতোদ্যম না হয়ে অরাধ্য স্বপ্নের সফল বাস্তবায়নের আকাঙ্কায় সর্বপ্রকার ঝড় তুফানের মুখেও আশার আলো জ্বালানোর নিরন্তর সাধনায় অনড় ও অবিচল থেকেছেন। এই তুলাদণ্ডের পরিমাপে হযরত মাওলানা শাহ হাফেজ আহমদ (র:) বিংশ শতাব্দির অন্যতম 'শ্রেষ্ঠ মুজাদ্দিদ' তথা সমাজ সংস্কারক। তিনি চিরকাল মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে তাঁর সুদূর প্রসারী কর্মকাণ্ডের মধ্যেই শুকতারার মতো জ্বলতে থকবেন। কিয়ামত পর্যন্ত দিকভ্রান্ত মানুষকে হেদায়তের পথ দেখান। শাহ সাহেবের মধ্যে মানুষ হেদায়তের দিশা পাবেন। হতাশাগ্রস্থ দিকভ্রান্ত মানুষ নতুন করে বাঁচার নিজের ভবিষ্যত তৈরী করার আশার আলো দেখার পথ বা উপায় খুঁজে পাবেন। আল্লাহর জমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করে নবুয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে খোলেফায়ে রাশেদার সোনালী দিনের মত শান্তির সমাজ প্রতিষ্ঠার আগ্রহ উদ্দিপনা উৎসাহ স্পিরিড মানুষ শাহ সাহের (র:) এর মধ্যে পাবেন।

আল্লাহ তায়ালা শাহ সাহেব (র:) এর সকল কর প্রচেষ্টা কবুল করুন এবং আল্লাহ তায়ালার নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে জান্নাতুল ফেরদৌসের উচ্চ আসনে সমাসীন করুন। তাঁর কবরকে নুরের বাগানে পরিণত করুন। আর সমাজের পথহারা মানুষকে তাঁর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে ইসলামের মৌলিক আর্দশ ও আধ্যাত্মিকতার সুশীতল ছায়ায় ফিরে আসার তাওফিক দিন। বিশেষত আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে শাহ সাহেব (র:) সে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন সেজন্য তিনি জাতীর কাছে চির স্বরণীয় হয়ে থাকতেন। বিশেষ করে শাহ সাহেবের মেধা-প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতায় যে কৃতৃত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন তা সত্যিই বিস্ময়কর। ইতিহাসের পাতায় সোনালি অক্ষরে তাঁর সে অবদান লেখা থাকবে। শাহ সাহেব (র:) এর এই কর্মজজ্ঞ কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে বলে আমাদের দৃঢ়বিশ্বাসঃ আল্লাহর কাছে কয়োমানো বাক্যে এই প্রার্থনায় করি।

حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولي ونعم النصير

আল্লামা ড. ইকবাল (র:) এর এই পংক্তি দিয়ে শেষ করছি-

آسماں تری لحد پر شبنم آفشانی کرے
سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے

"আকাশ তাঁর কবরে শিশির (রহমত) ধারা ঝরাক, নতুন নতুন তারাগুলো তাঁর ঘর (ক্ষমা প্রার্থনার) পাহারা দিক।"

আমি মানুষ হিসেবে এই গবেষণা কর্মে কোন কিছু বাদ গেলে তার জন্য আন্তরিক ভাবে দুঃখিত। মহান আল্লাহ আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াসকে কবুল করুন, আমিন।

গ্রন্থাবলি

বাংলা

১. আল-কুরআনুল করীম।

২. মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার, *ইলমে তাসাওউফের হাকীকত শাহ্ আবদুল জব্বার*, আশ শরফ একাডেমী, ১৯৯৯ খ্রি.।

৩. মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার, *শরীয়ত ও ত্বরীকতের আদাব*, শাহ্ আবদুল জব্বার আশ্ শরফ একাডেমী, ২০০৮ খ্রি.।

৪. মোঃ আবদুল খালেক, *পীর ও মুরীদ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তা. বি.।

৫. ফকীর আব্দুর রশীদ, *সূফী দর্শন*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৫ খ্রি.।

৬. ড. তাহের আল-কাদেরী, *তাসাউফের আসল রূপ*, চট্টগ্রাম, সনজরী পাবলিকেশন, ২০০৯ খ্রি.।

৭. ড. আহমদ আলী, *তাযকিয়াতুন নাফস*, ঢাকা: ইসলামিক সেন্টার, ২০১৬ খ্রি.।

৮. মাওলানা এম. ওবাইদুল হক, *বাংলাদেশের পীর আওলিয়াগণ*, মাওলানা মুহিউদ্দিন খান (সম্পাদনায়) ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন্স, ২০০৮ খ্রি.।

৯. আহমদুল ইসলাম চৌধুরী, *হযরত শাহ্ মাওলানা হাফেজ আহমদ (রহ:) চট্টগ্রাম*, ২০০৭খ্রি.।

১০. মাওলানা মুহাম্মদ কুতুব উদ্দিন, *কিতাব ও সূন্নাহার আলোকে ত্বরীকতের মূলনীতি*, বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ২০০৮ খ্রি.।

১১. মিয়া মোহাম্মদ গোলাম কবির, *স্মৃতির পাতায় হযরত শাহ্ ছাহেব কেবলা (রহ:)*, চুনতী, চট্টগ্রাম, ২০১১ খ্রি.

১২. মোহাম্মদ ইছহাক, *স্মরণ করি স্বপনে জাগরণে, শাহ্ ছাহেব কেবলা চুনতী কিছু কথা এবং পর্যালোচনা*, ১ম খণ্ড, মেসার্স আমিনুল হক এন্ড সন্স, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম, ২০১৭ খ্রি.।

১৩. ড. মো. ইবরাহীম খলিল, *সূফীবাদ এবং প্রধান প্রধান সূফী ও তাঁদের অবদান*, মেরিট ফেয়ার প্রকাশনা, ২০১৩ খ্রি.।

১৪. আশরাফ আলী থানভী, *শরী'আত ও ত্বরীকত*, অনু. আবদুল মাজিদ চাকুবী, ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরি, ১৯৯৭ খ্রি.।

১৫.মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী, *সূফীতত্ত্ব ও সূফীয়ায়ে কেরাম*, চট্টগ্রাম শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন, ২০১২ খ্রি.।

১৬.মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল জব্বার, *রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক দৃষ্টিতে পীর আউলিয়ার গুরুত্ব* চট্টগ্রাম, বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ১৯৮২ খ্রি.।

১৭.মু. আযীযুর রহমান নেছারাবাদী, *ইসলাম ও তাসাউফ*, ঝালকাঠী নেছারাবাদ হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ, ২০১০ খ্রি.।

১৮. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুন নূর সিদ্দিকী চিশতী, *হায়াতে হযরত শাহ সাহেব কেবলা কোঃ* আদর্শ মেহমান মনজিল, চুনতী, চট্টগ্রাম, ১৯৯৮ খ্রি.।

১৯.মাওলানা আব্দুল জব্বার, *জিহাদে আকবর*, বায়তুশ শরফ প্রকাশনী, ধনিয়ালা পাড়া, চট্টগ্রাম, ১৯৯১ খ্রি.।

২০. আবুল কাসিম মুহাম্মদ সিফাতুল্লাহ, *তাযকিয়ায়ে নফস*, ঢাকা: পুরানা পল্টন, ১৯৮৬ খ্রি.।

২১.আবদুর রহীম হাজারী, *সূফী তত্ত্বের আত্মকথা*, ঢাকা: নবরাগ প্রকাশনী, ২০০৬ খ্রি.।

২২. আল্লামা ইদরীস কান্দেলভী, *সিরাতে মোস্তফা*, ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা।

২৩. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল জব্বার, *আল-ইহসান*, আল্লামা শাহ্ আব্দুল জব্বার ফাউন্ডেশন, চট্টগ্রাম, ১৯৯৯ খ্রি.।

২৪. *আখলাকুন নবী*, ঢাকা: ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

২৫. আবুল হায়াত মোহাম্মদ তারেক, *আখলাকে সায়্যেদুল আম্বিয়া*, ঢাকা: ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

২৬. শফিউর রহমান মোবারকপুরী, *আর রাখিকুল মখতুম*।

২৭. শায়খুল হাদীস মাওলানা তফাজ্জল হোছাইন রচিত, ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন সম্পাদিত, *হযরত মুহাম্মদ স সমকালীন পরিবেশ ও জীবন*, ঢাকা: ১৯৯৮ খ্রি.।

২৮. মাওলানা মাহবুবুর রহমান, *শিক্ষা ও সমাজ সেবার বায়তুশ শরফের অবদান*, প্রকাশক: বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স, চট্টগ্রাম, ২০১৭ খ্রি.।

২৯. ড. সাইয়েদ মুহাম্মদ আবু নোমান, *ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচার ও প্রসারে চট্টগ্রাম*, দারুল উলুম আলীয়া মাদ্‌রাসার অবদান, ২০১৭ খ্রি.।

৩০. ড. মুহাম্মদ মাবুবুর রহমান, *শিক্ষা সংস্কৃতির বিকাশ, মানব সেবা ও সুফিবাদে শাহ সুফি* মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার এর অবদান। ২০২৩ খ্রি.।

ইংরেজি

1. Idris Shah Graves, *The Sufis*, New York: Doubledy & Company,1994.

2. J. Spencer Trimingham, *The Sufi orders in Islam*, Oxford Universty Press, 1982.

3. Dr. Mir, Validdin, *The Quranic Sufism*, Delhi Motilal Banarsidan, 1959.

আরবি/উর্দু

১. হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহ:), *গুনিয়াতুত ত্বোয়ালেবীন*।

২. মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, দিল্লী। রশীদিয়া লাইব্রেরী, তা. বি।

৩. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, দিল্লী। রশীদিয়া লাইব্রেরী, তা, বি।

৪. আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আছ, *সুনানু আবি দাউদ*, দিল্লী: রশীদিয়া লাইব্রেরী, তা. বি।

৫. আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা, *জামে'আত-তিরমিযী*, দিল্লী: রশীদিয়া লাইব্রেরী, তা. বি।

৬. মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ ইবন মাজাহ, *সুনান ইবন মাজাহ*, দিল্লী: রশীদিয়া লাইব্রেরী, তা বি।

৭. আল্লামা সাদুদ্দীন তাফতাযানী, *শারহুল 'আকায়িদ আন নাসাফিয়্যা*, চট্টগ্রাম, কুতুবখানা যমীরিয়া, তা. বি.।

৮. 'আহমদ বিন 'শু'আইব নাসা'ঈ, *সুনান আন-নাসা'ঈ*, দিল্লী: মাকতাবা রহিমীয়া, ডা.বি.।

পত্র-পত্রিকা

১. ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকাসমূহ

২. বিভিন্ন দৈনিক ও মাসিক পত্রিকাসমূহ।

বার্ষিকী/স্মরণিকা

১. হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আমিন স্মরণে *'আঞ্জুমানে তোলাবায়ে সাবেকীন*, চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদরাসা, চট্টগ্রাম, ২০০৬ খ্রি.।

২. 'আঞ্জুমান ২০১০', ২০০ বছর পূর্তি সংখ্যা, *আঞ্জুমানে তোলাবায়ে সাবেক্বীন*, চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদরাসা, চট্টগ্রাম, ২০১১খ্রি.।

৩. 'আঞ্জুমান ৩৪ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী', *আঞ্জুমানে তোলাবায়ে সাবেকীন*, চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদরাসা, চট্টগ্রাম, ১৯৯৬ খ্রি.।

৪. *আত্-তিমকার*, আধুনগর ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা, লোহাগাড়া ২০১০, ২০১৫, ২০২১

৫. *আয-যিকরা*, দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসা, চন্দনপুরা, চকবাজার, চট্টগ্রাম, ২০১৬, ২০০৮

৬. *বার্ষিকী ২০১৯,২০২০* তা'মিরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা, টঙ্গী, মিরহাজারীবাগ, ঢাকা।

৭. *আল-মানার*, কামিল বিদায়ী স্মারক ২০১৯, চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদরাসা, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

৮. *আল-আবরাত*, কামিল বিদায়ী স্মারক ২০১৭, চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদরাসা, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

৯. *শিক্ষক সম্মেলন ২০০৩*, বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক পরিষদ, ঢাকা মহানগরী।

১০. *আলো বার্ষিকী ২০১১, ২০২২* বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল মাদরাসা, চট্টগ্রাম।

১১. *আল মিরবাব*, বিদায় স্মারক ২০০৬, চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদরাসা, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

১২. *আন নকীব*, বায়তুশ শরফ আদর্শ (এম,এ) মাদরাসা, ধনিয়ালা পাড়া, চট্টগ্রাম।

বিশ্বকোষ ও সম্পাদিত উৎসমূহ

১. (সম্পাদিত), *ইসলামী বিশ্বকোষসমূহ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

২. (সম্পাদিত), *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষসমূহ*, ১ম ও ২য় খন্ড, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

৩. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলা পিডিয়া*, ১ম-১০ম খন্ড, ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩ খ্রি.।

৪. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামিয়াত*, ঢাকা: ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী, ইফাবা, ১৯৯৬ খ্রি.।

৫. সম্পাদনা পরিষদ, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০ খ্রি.।

৬. নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌ. (সম্পাদিত), *আমাদের সুফিয়ায়ে কেরাম*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খ্রি.।

৭. সম্পাদনা পরিষদ, *বাংলা বিশ্বকোষ*, ১ম খণ্ড, ২য় খণ্ড, ৪র্থ খণ্ড, ঢাকা: ১৯৭২ খ্রি., বাংলা একাডেমি।

অভিধান (বাংলা/আরবি/ইংরেজি)

১. মা'লুফ, লুইস, *আল-মুনজিদ*, বৈরূত: আল মাকতাবাহ আশ-শারকিয়া, ২০০৫ খ্রি.।

২. রাগিব আল-ইস্পাহানী, *আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল-কুরআন*, কায়রো আল-মাকতাবাতুত্-তাওফীকিয়্যাহ, তা. বি।

৩. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মু'জামুল ওয়াফী*, ঢাকা: রিয়াদ, প্রকাশনী, ২০০৯ খ্রি.।

৪. ইবরাহিম মাদুকর, *আল-মু'জামুল অসীত*, কায়রো, মিসর, ১৯৭২।

৫. মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, *আল-কাওসার* (আধুনিক আরবি বাংলা অভিধান), ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন্স, ১৯৯৭ খ্রি.।

৬. ইবনু মন্‌জুর, *লিসানুল আরব*, ১২ খণ্ড, দারু সাদের, তা. বি.।

৭. *সংসদ বাংলা অভিধান*।

৮. Moitreyee Mitra & Dipendranath Mitra, *Oxford English-English-Bangali Dictionary*, Oxford University Press, Fourth Impression, 2015.

৯. Mohammad Ali, Bangla Academy *Bengali-English Dictionary*, Dhaka Bangla Academy, Twenty ninth Reprint, November, 2011.

পরিশিষ্ট

হযরত শাহ মাওলানা হাফেজ আহমদ (রঃ), শাহ সাহেব চুনতী



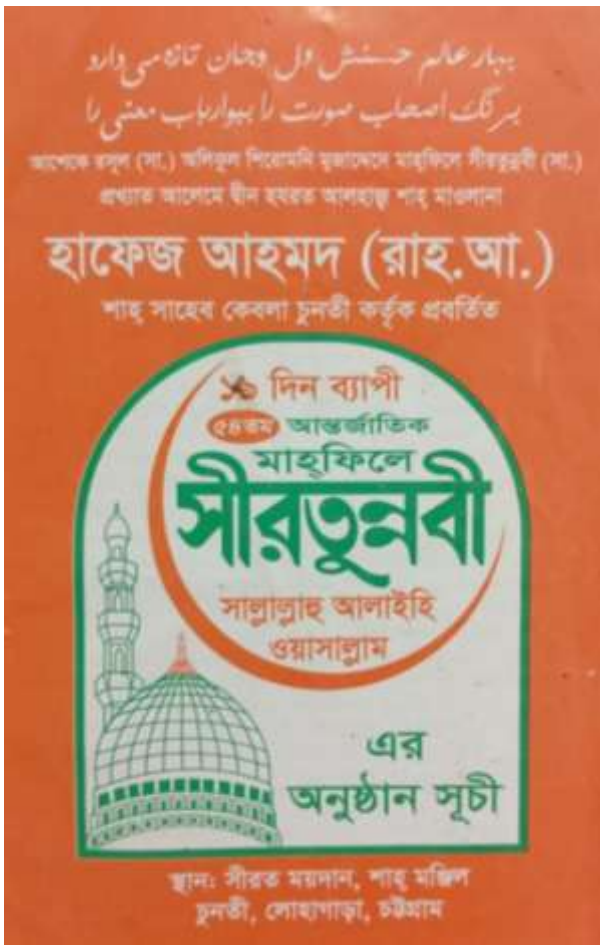






সিরাতুন্নবী (সাঃ) মাহফিল এর ব্যানার ও অনুষ্ঠানসূচি







হযরত শাহ সাহেব (রঃ) প্রবর্তিত মে'রাজুন্নবী (সাঃ) মাহফিল এর দাওয়াত নামা,খাম ও ব্যানার









হযরত শাহ্ সাহেব কেবলা (রহঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মসজিদ-এ-বায়তুল্লাহ্ পশ্চিম-দক্ষিণ অংশ

হযরত শাহ্ সাহেব কেবলার (রহঃ) মাজারের রাতের দৃশ্য





হযরত শাহ্ সাহেব কেবলা (রহঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মসজিদ-এ-বায়তুল্লাহ্'র সম্মুখ ভাগ

হযরত আলহাজ্ব শাহ্ মাওলানা হাফেজ আহমদ (রহঃ) সাহেব কেবলা চুনতী'র মাজার



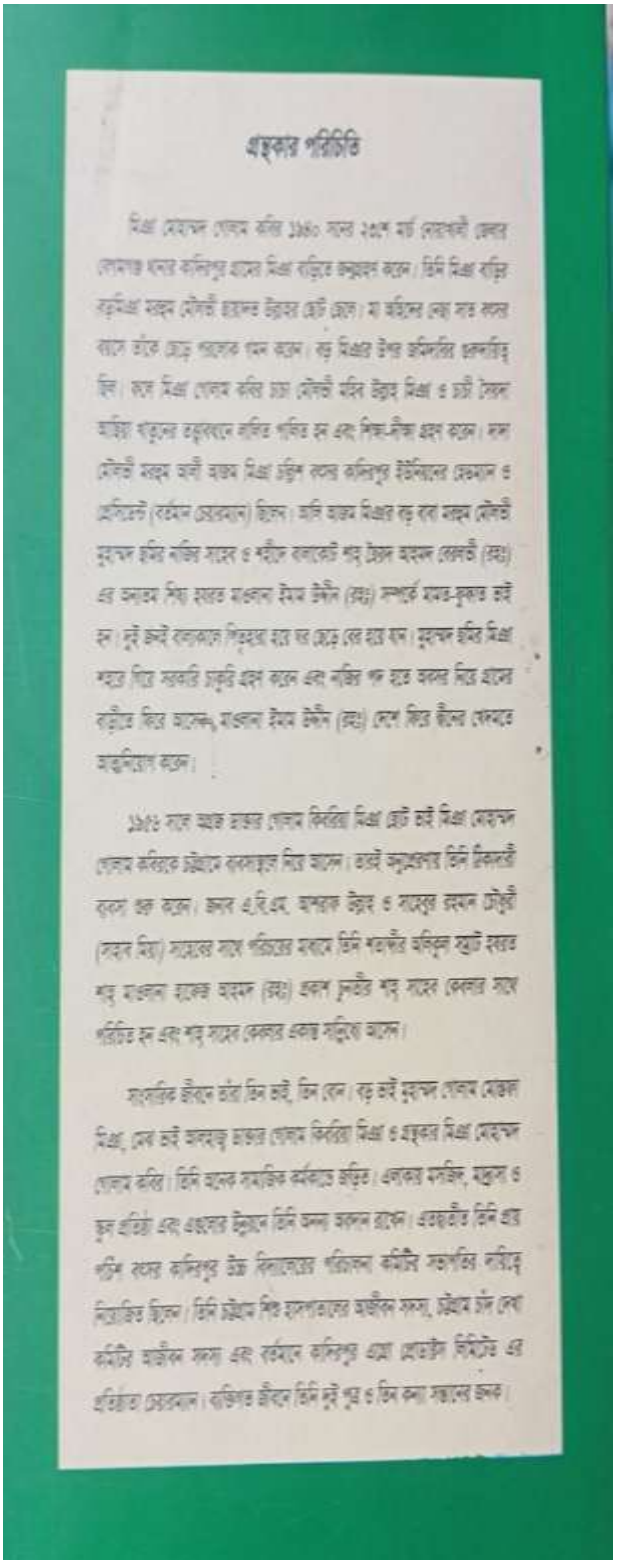
সিরাতুন্নবী (সাঃ) মাহফিলে আগত মুসল্লি ও সিরাত ময়দান





মিয়া গোলাম কবির রচিত হযরত শাহ সাহেব (রঃ) এর জীবনী গ্রন্থ





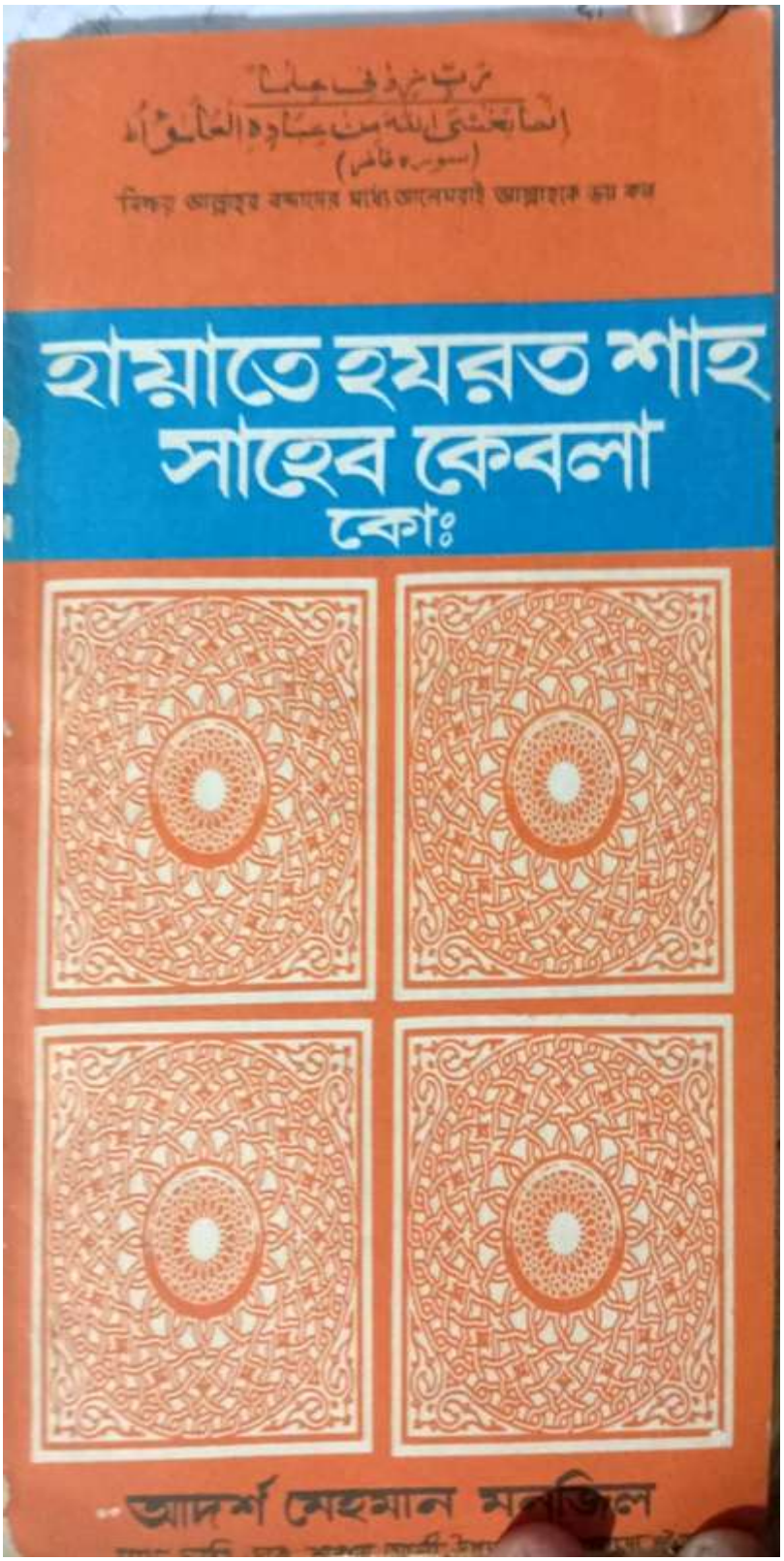
গ্রন্থকার পরিচিতি

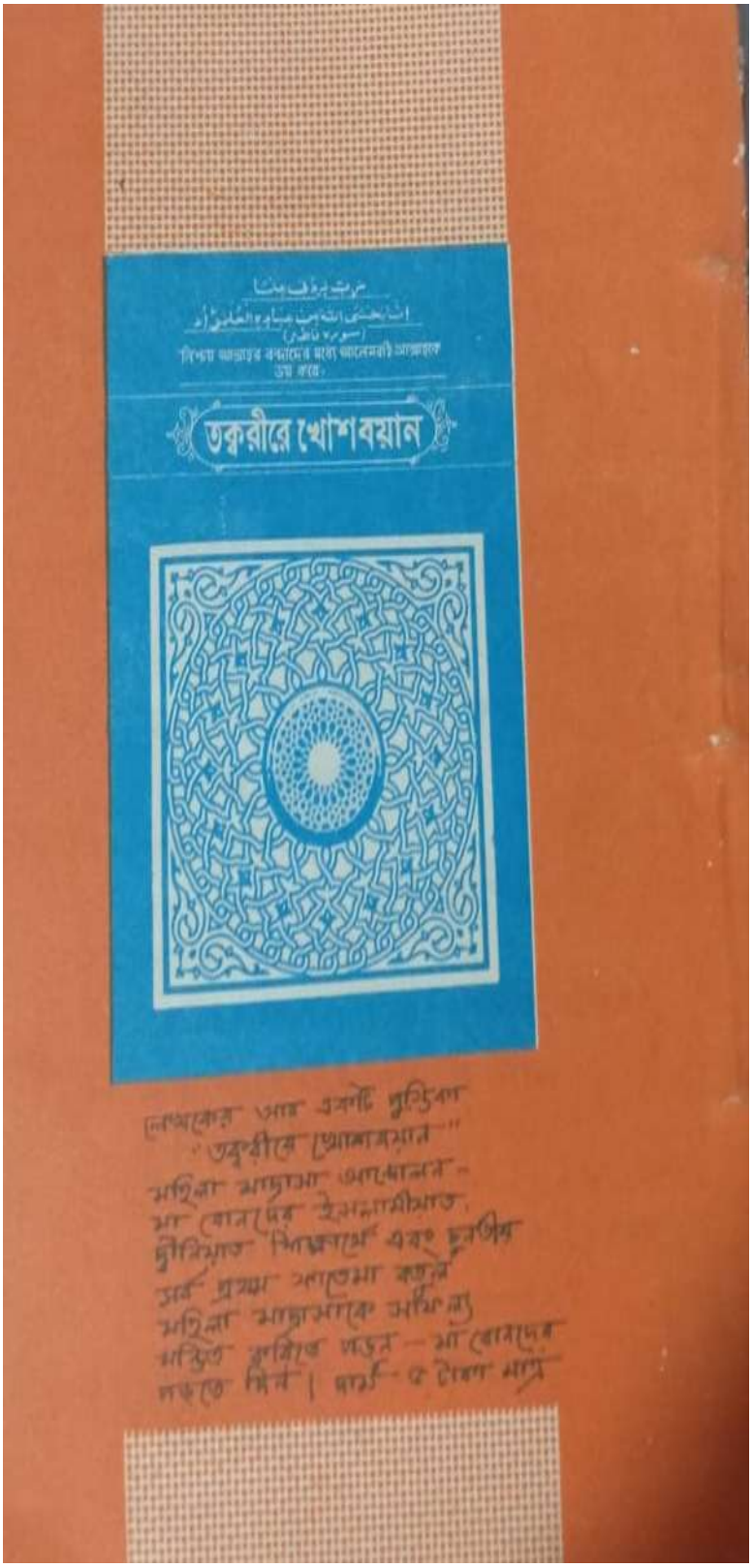
মিঞা মোহাম্মদ গোলাম কবির ১৯৪০ সালের ২৫শে মার্চ চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া থানার কলিমপুর গ্রামের মিঞা বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মিঞা বাড়ির বড়মিঞা মরহুম মৌলভী হাজেম উল্লাহর ছোট ছেলে। যা মাত্রাসা থেকে সরাসরি বাংলা ভাষে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বড় মিঞার উপর জমিদারীর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব ছিল। তবে মিঞা গোলাম কবির চাচা মৌলভী কবির উল্লাহ মিঞা ও চাচী সৈয়দা মাইমুনা খাতুনের তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হন এবং শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাদের মৌলভী মরহুম ফজলী মজিদ মিঞা চট্টগ্রাম শহরে কলিমপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও এমপিএ (পূর্বপাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ) ছিলেন। তাঁর মজিদ মিঞার বড় বোন মরহুম মৌলভী মুহাম্মদ ইদ্রিস সাহেব ও শহীদ বদরুদ্দোজা শাহ্ চাঁদগাঁও মরহুম মোলভী (রহঃ) এর জ্যেষ্ঠ পিতা হযরত মাওলানা ইমাম উদ্দীন (রহঃ) সম্পর্কে মামাত-ফুফাত ভাই হন। দুই ভাই বাল্যকালে পিতৃহারা হয়ে মা ছোট বোন হারা হন। মুহাম্মদ ইদ্রিস মিঞা শহরে পিতার সরকারি চাকুরি গ্রহণ করেন এবং নানীর গৃহ হতে মাতার পিতৃ গ্রামের বাড়ীতে ফিরে আসেন, মাওলানা ইমাম উদ্দীন (রহঃ) দেশে ফিরে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন।

১৯৫২ সালে মাত্র ১২বছর বয়সে মিঞা ছোট ভাই মিঞা মোহাম্মদ গোলাম কবিরকে চট্টগ্রামে মাতামহের নিকট আসেন। তারই অনুপ্রেরণায় তিনি ডিসেম্বরী বক্তৃতা শুরু করেন। জনাব এ.বি.এম. আশরাফ উল্লাহ ও সায়েদুল হাসান চৌধুরী (সাবেক মিঞা) সাহেবের সাথে পরিচয়ের মাধ্যমে তিনি শতাব্দীর অবিস্মরণীয় ব্যক্তি হযরত শাহ্ মাওলানা হাফেজ মোহাম্মদ (রহঃ) প্রকাশ চুনতীর শাহ্ সাহেব কেবলার সাথে পরিচিত হন এবং শাহ্ সাহেব কেবলার একান্ত সান্নিধ্যে আসেন।

কর্মজীবনে তাঁরা তিন ভাই, তিন বোন। বড় ভাই মুহাম্মদ গোলাম মোস্তফা মিঞা, মেজ ভাই অবসরপ্রাপ্ত ডাক্তার গোলাম কিবরিয়া মিঞা ও গ্রন্থকার মিঞা মোহাম্মদ গোলাম কবির। তিনি স্নাতকের কর্মজীবনে জড়িত। এলাকার কলেজ, মাদ্রাসা ও স্কুল প্রতিষ্ঠা এবং এগুলোর উন্নয়নে তিনি অনন্য অবদান রাখেন। এরমধ্যেই তিনি প্রায় পঁচিশ বছর কলিমপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটির সভাপতির দায়িত্ব নিয়োজিত ছিলেন। তিনি চট্টগ্রাম শিপ ব্রোকার্সের মজলিশ সদস্য, চট্টগ্রাম টাউন লেবার কমিটির মাননীয় সদস্য এবং বর্তমানে কলিমপুর এগ্রো ফোরেস্ট্রি লিমিটেড এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি দুই পুত্র ও তিন কন্যা সন্তানের জনক।

হযরত মাওলানা আবদুন নূর ছিদ্দিকী (রঃ) এর ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে রচিত হযরত শাহ সাহেব (রঃ) এর জীবনী গ্রন্থ




তক্বরীরে খোশবয়ান

ہم مزار محمد پہ مر جائینگے
زندگی میں یہی کام کر جائینگے

আশেকে রসুল (স.) মুজাদ্দেদে মাহফিলে সীরতুন্নবী (স.)

হযরত শাহ মাওলানা হাফেজ আহমদ (রহ.)

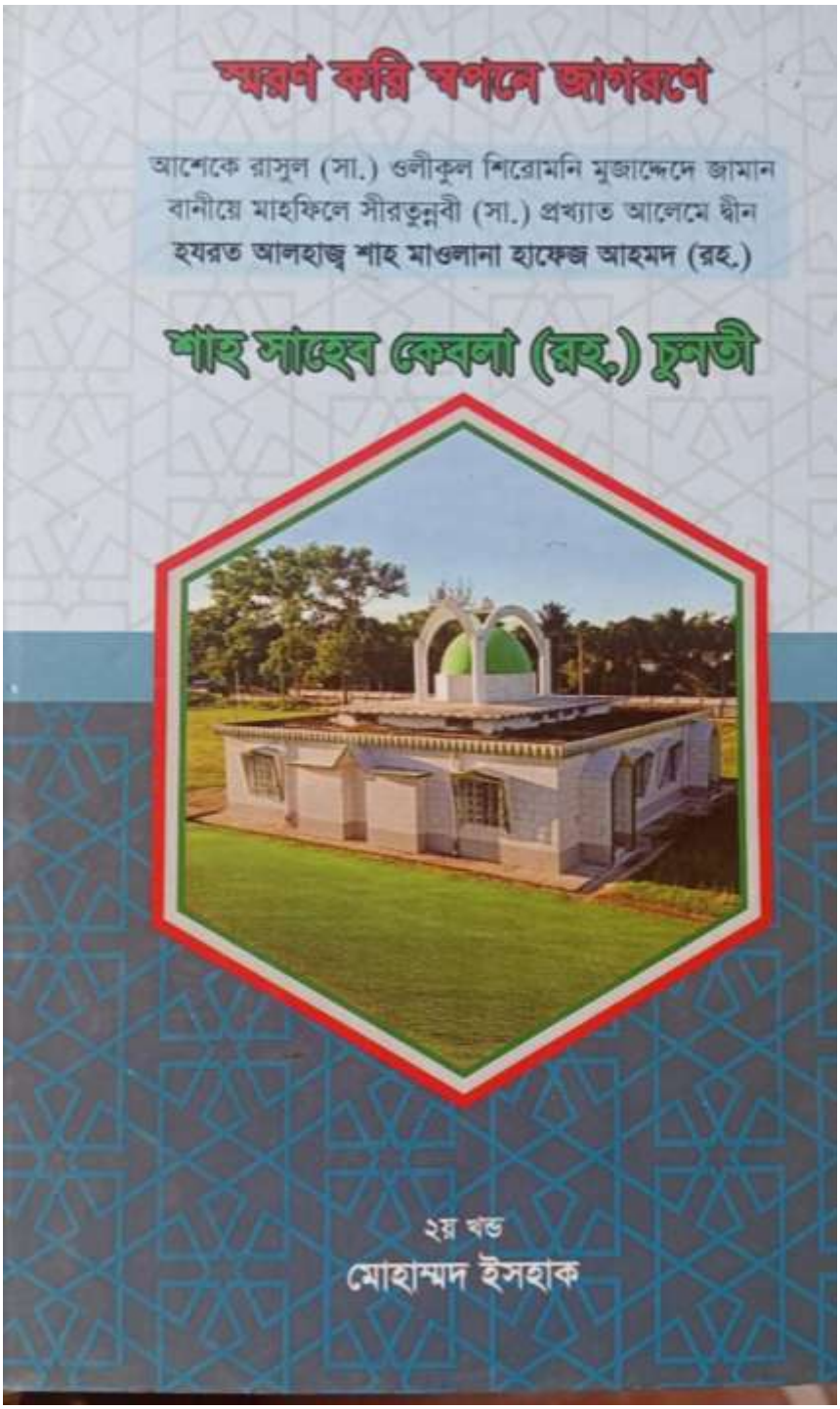
হযরত শাহ সাহেব (রহ.) চুনতী



আহমদুল ইসলাম চৌধুরী

Dhaka University Institutional Repository

আহমদুল ইসলাম চৌধুরী রচিত হযরত শাহ সাহেব (রঃ) এর জীবনী গ্রন্থ



Dhaka University Institutional Repository

পটিয়া হুলাইন নিবাসী ম্যানেজার মুহাম্মদ ইসহাক রচিত হযরত শাহ সাহেব (রঃ) এর জীবনী গ্রন্থ



গ্রন্থকারের পরিচিতি

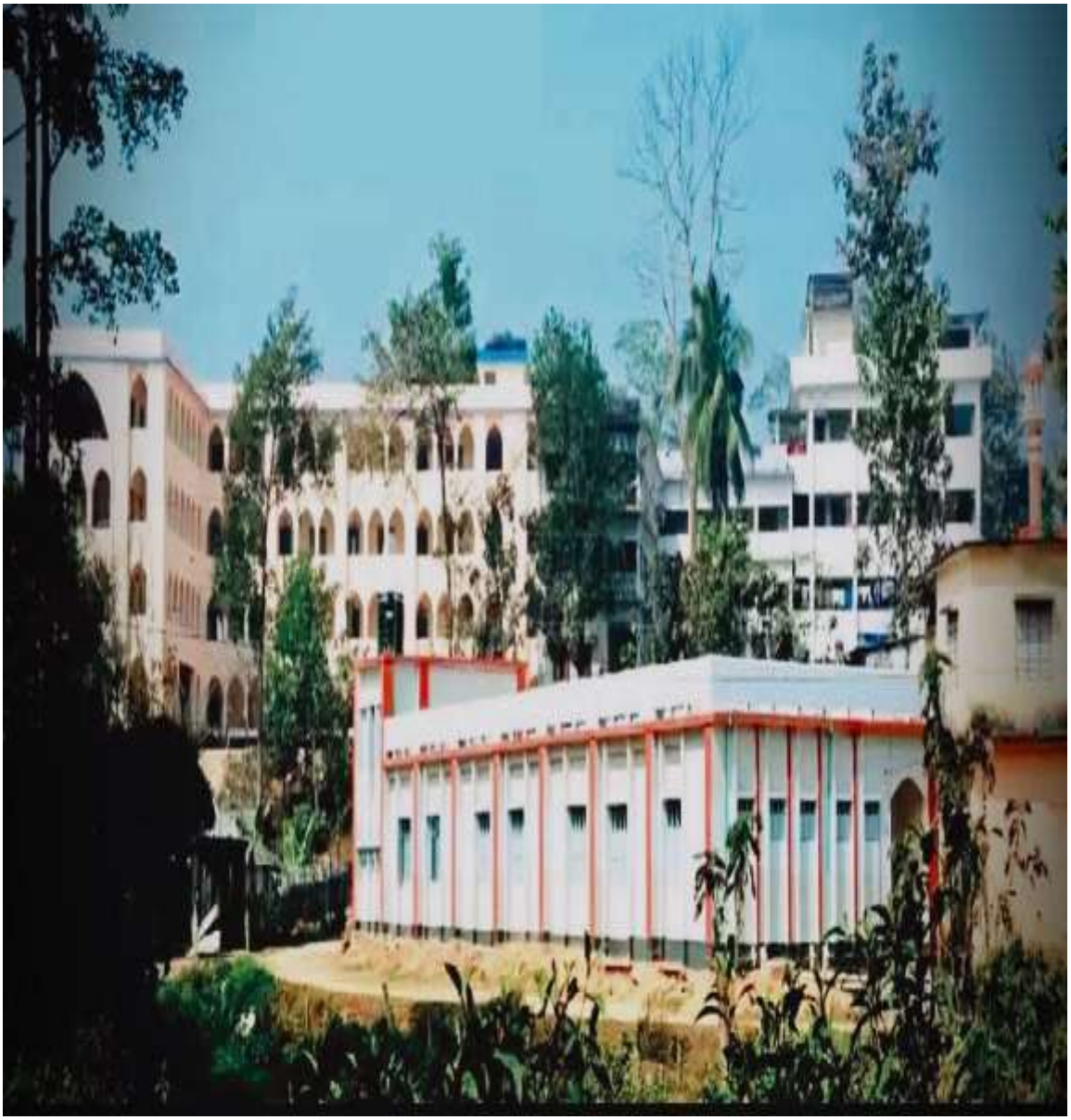
আমি মোহাম্মদ ইসহাক, জন্ম ১৯৪৩ ইংরেজী সনের ২২শে নভেম্বর, চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার, হুলাইন গ্রামে। পিতা- মরহুম মৌলভী মোখলেছুর রহমান। যিনি ১৮০০ শতকের শেষের দিকে তদানিন্তন শিক্ষা ব্যবস্থার গুরু ঠাকুরের পাঠশালায় সাহিত্য নিয়ে পড়া শুনা করা লোক ছিলেন। সারাটি জীবন পুঁথি সাহিত্য নিয়ে তার জীবন কেটেছে। কাছাছুল আম্বিয়া ও পদ্মাবতী অনেকগুলি পুঁথির মধ্যে অন্যতম ছিল। আমাদের উঠান ও কাচারীঘর ছিল এসব আড্ডার তীর্থভূমি। গ্রামে সন্ধ্যা শেষ হতে হতেই আশপাশের শ্রোতারা, পাঠকেরা আমাদের কাচারী ঘরে এসে হাজির। পান, তামাক, চা-ও মাঝে মধ্যে থাকতনা এটাও নয়। নবী জীবন ও পদ্মাবতী পুঁথির কঠিন গল্পগাঁথা গুলো শুনে শুনে বড় হয়েছি। সঙ্গত কারণে আমরা ভাই বোনেরা কমবেশী সাহিত্য প্রেমী। বর্তমানে তিন ভাই এক বোন আছি। মা মরহুমা কুলসুমা খাতুনও শিক্ষিতা মহিলা ছিলেন। নানার বাড়ি থেকে বেলমুড়ি প্রাইমারী স্কুল ১০০মিটার দূরত্বে। বলতে গেলে তাদের বাড়ির সামনেই মসজিদ, কবরস্থান ও বেলমুড়ি স্কুল। আমার মা'র তৎকালে যতটুকু লেখাপড়া ছিল তা প্রচুর বলতে হবে। আমি মা'র কাছেই বর্ণবোধ শেষ করি। আল্লাহ আমার মা বাবাকে বেহেস্তবাসী করুন। আমি ১৯৬০'র দশকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির প্রাইভেট পরীক্ষার্থী ছিলাম। তৎকালীন হাবিব ব্যাংক লিমিটেড (বর্তমানে অগ্রনী ব্যাংক লিমিটেড) ১৯৬৭-৬৮ সালে অফিসার হিসাবে যোগদান করায় আর মাস্টার্স পরীক্ষাটা দেওয়া হয়নি। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমি তৎকালীন হাবিব ব্যাংক লিমিটেড এর পটিয়া শাখার ম্যানেজার ছিলাম। বিভিন্ন পথ অতিক্রম করে আমি ২০০০ সালে অবসর গ্রহণ করি।

আমার গ্রামের ঠিকানা : হাজী মোহাম্মদ ইসহাক, প্রযত্নে হাজী ছালেহ আহমদ চৌধুরী বাড়ী, গ্রাম - হুলাইন, থানা - পটিয়া, জেলা - চট্টগ্রাম।

শহরের ঠিকানা : হাজী মোহাম্মদ ইসহাক, মেহেরুন্নেছা কটেজ, ডেপুটি রোড, (মাঝের রাস্তা) পূর্ব বাকলিয়া, চট্টগ্রাম। বাকলিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের পেছনে)।

Dhaka University Institutional Repository

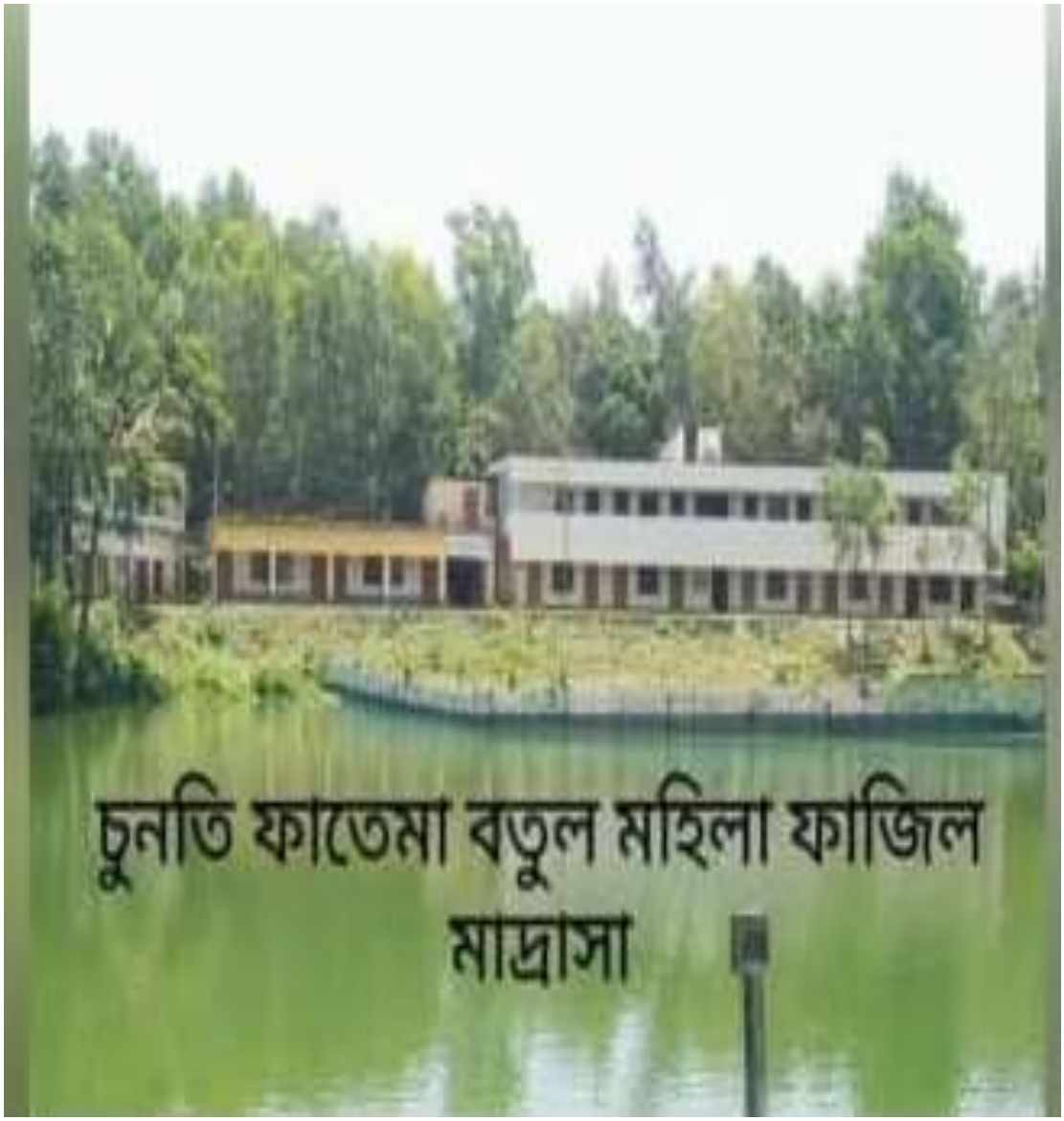
হযরত শাহ্ সাহেব (রঃ) এর পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত চুনতি হাকিমিয়া কামিল (অনার্স-মাস্টার্স) মাদ্‌রাসা



Dhaka University Institutional Repository

চুনতি ফাতেমা বতুল মহিলা ফাজিল মাদ্‌রাসা

স্বপ্নদ্রষ্টাঃ হযরত শাহ সাহেব (রঃ)



Dhaka University Institutional Repository

হযরত শাহ সাহেব (রঃ) এর ইছালে সাওয়াব মাহফিলের দাওয়াত নামা,খাম ও ব্যানার







Dhaka University Institutional Repository

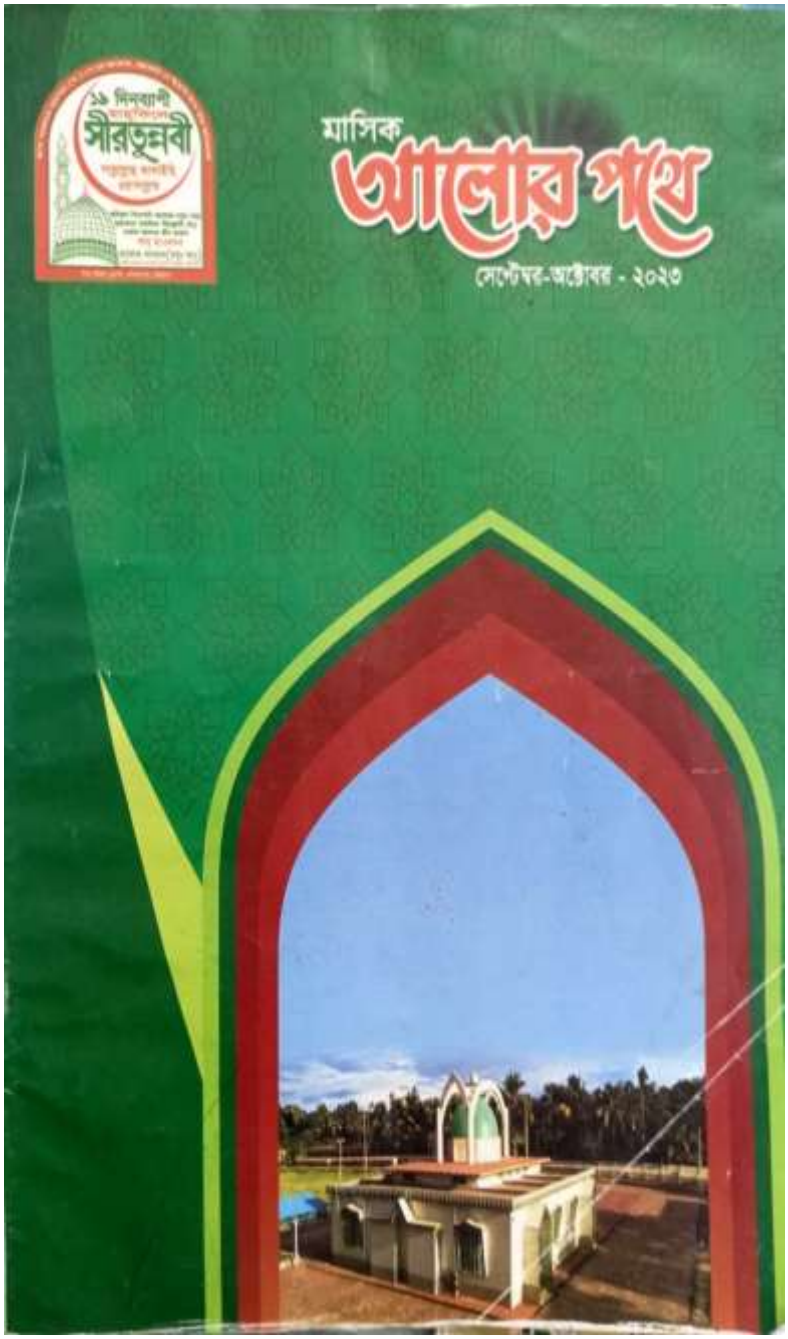
শাহ সাহেব (রঃ) এর ইছালে সাওয়াব মাহফিলে সমাপনি বক্তব্য ও মুনাজাত করেন: মাহফিলের প্রবর্তক, হযরত কাজী অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ নাছির উদ্দীন (ম.জি.আ), খাদেম, হযরত শাহ সাহেব (রঃ)।



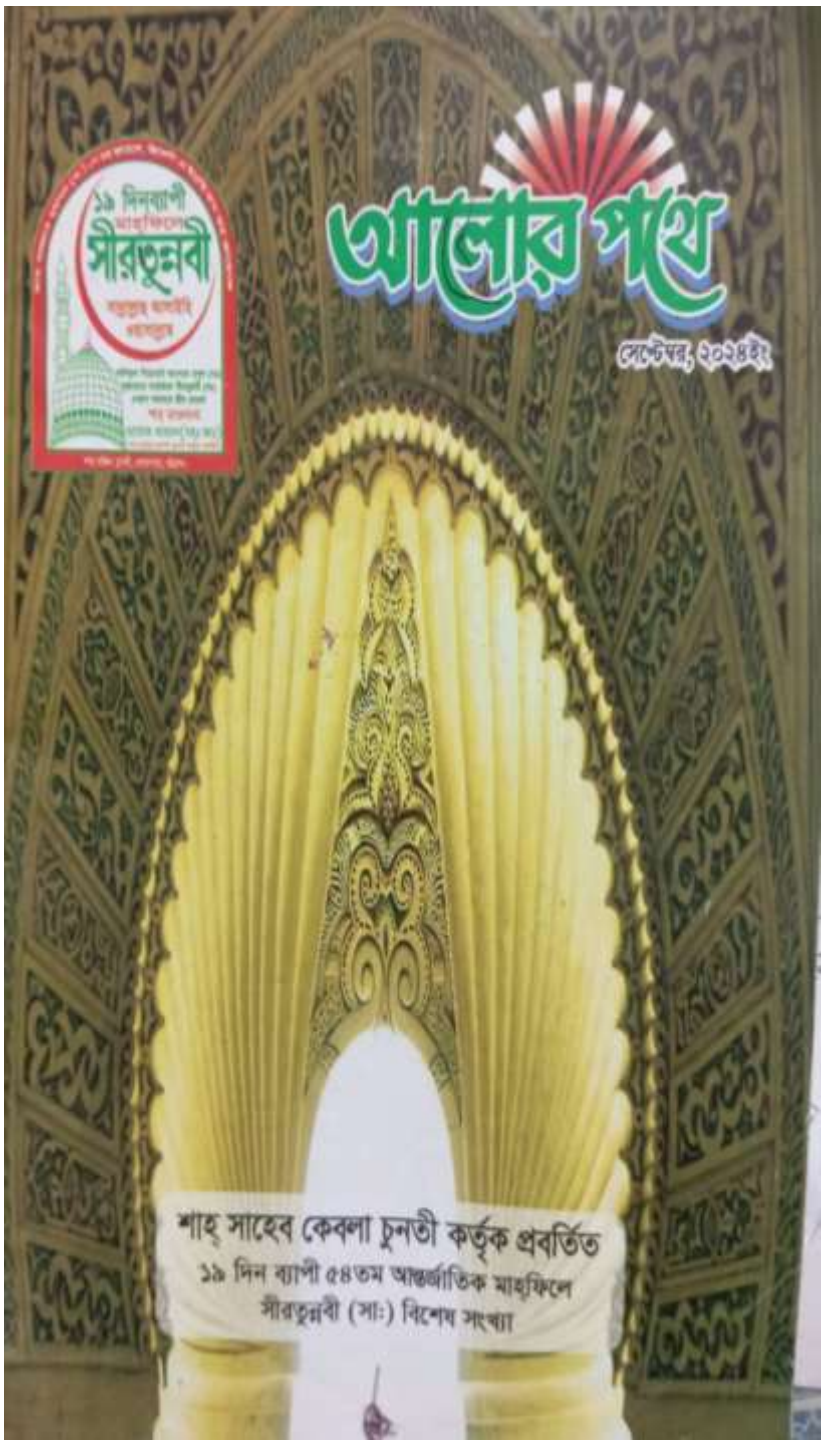


Dhaka University Institutional Repository

হযরত শাহ সাহেব কর্তৃক প্রবর্তিত সিরাতুন্নবী (সাঃ) মাহফিল উপলক্ষে বিভিন্ন প্রকাশনা



Dhaka University Institutional Repository



Dhaka University Institutional Repository

শাহ সাহেব (রঃ) প্রবর্তিত সিরাতুন্নবী (সাঃ) মাহফিল উপলক্ষে রচিত বিভিন্ন প্রবন্ধ



মোহাম্মদ ইমাদ উদ্দীন

চুনতীর ১৯ দিনব্যাপী সীরাতুন্নবী (সা) মাহফিল

ইসলাম প্রচার ও প্রসার এবং ঈমানী শক্তি বৃদ্ধির প্লাটফর্ম

ঐতিহাসিক "১৯ দিনব্যাপী সীরাত মাহফিল" প্রবর্তন করেন চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলার চুনতীর মহান আধ্যাত্মিক সাধক হযরত আলহাজ্ব শাহ মাওলানা হাফেজ আহমদ প্রকাশ (শাহ সাহেব কেবলা) (রহ.)।

মানুষ যখন ইসলামের মূল শিক্ষার বিপরীতে শিরক, বিদয়াত ও কুসংস্কারে বেড়াজালে জড়িয়ে পড়ছিল তখন দিশেহারা মানুষদের ইসলামের সঠিক জ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যে হযরত শাহ সাহেব কেবলা (রাঃ) এই মাহফিলের গোড়াপত্তন করেন ১৯৭২ সালে রবিউল আউয়াল মাসের ১১ তারিখে চুনতি শাহ মঞ্জিল চত্বরে ১ দিনব্যাপী সীরাত মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তী ১৯৭৩ সালে ৩ দিনব্যাপী, ১৯৭৪ সালে ৫ দিন, ১৯৭৬ সালে ১০ দিন, ১৯৭৭ সালে ১২ দিন, ১৯৭৯ সালে ১৫ দিন এবং একই বছর ২ দিন বাড়িয়ে ১৭ দিন, আরো ২ দিন বাড়িয়ে ১৯ দিনব্যাপী সীরাতুন্নবী মাহফিল করা হয়। সেই ১৯৮০ সাল থেকেই ১৯ দিনব্যাপী সীরাতুন্নবী (সা.) মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

হযরত শাহ আহমদ সাহেব কেবলা (রাঃ) দল-মত আর সংকীর্ণতার উর্ধে ছিলেন। এ কারণে দেশের বিভিন্ন এলাকার বরেণ্য আলেমেদ্বীন সহ সর্বস্তরের ধর্মপ্রিয় মুসলিম জনতা দল-মত নির্বিশেষে এ মাহফিলে এসে ইনি শিক্ষা অর্জন করেন।

প্রতিবছর বিশেষ করে আখেরী মুনাজাতে ঐতিহাসিক সিরাত মাহফিল কান্নায় কান্নায় পূর্ণ হয়ে উঠে। প্যান্ডেল ছাড়িয়ে খোলা আকাশের নিচে জড়ো হতে থাকে মুসল্লিরা। শীতকালেও মন কুয়াশা ও ঠান্ডা উপেক্ষা করে লাখো মানুষের উপস্থিতিতে পুরো ১৩ একর আয়তনের সীরাত ময়দান ছাড়িয়ে লোকে লোকারণ্য হয় আশপাশের গ্রাম-বাজার-ঘাট। দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে ধর্মপ্রাণ মোহিনী জনতার জন্য পুরো ১৯ দিনব্যাপী

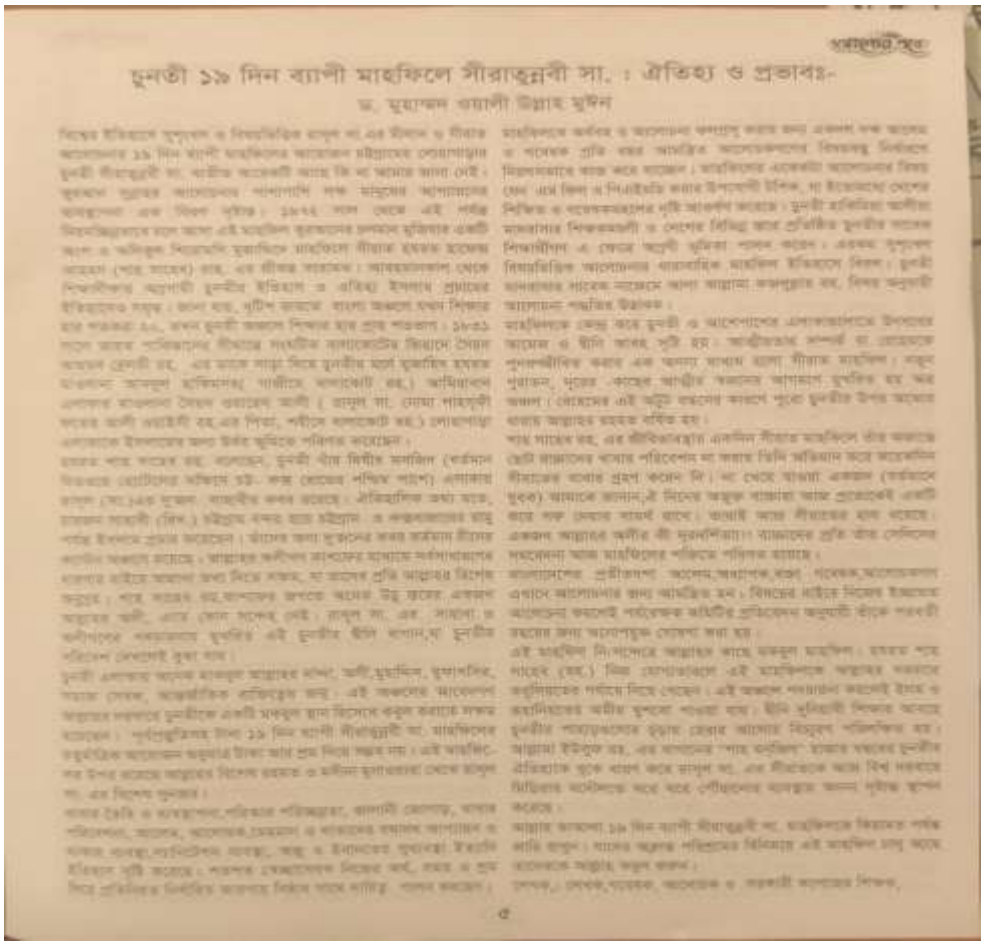
তাবারুকের ব্যবস্থা হয়ে থাকে এ মাহফিলে। যা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের খাস রহমত এবং

শাহ সাহেব কেবলার কারামতও বটে। উল্লেখ্য ঐতিহাসিক এই সীরাত মাহফিল গতানুগতিক ধারার কোন মাহফিল নয় বরং এটি সাধারণ মানুষদের প্রয়োজনীয় কঠীন জ্ঞান অর্জনের জন্য উন্মুক্ত এক শিক্ষাকেন্দ্র। মাহফিলে দেশের বিভিন্ন জায়গার আলিয়া ও কওমি ধারার আলেমরা নির্লিপ্ট বিষয়ের উপর কোরআন ও হাদিসের আলোকে গবেষণা আলোচনা করে থাকেন। এই মাহফিলে মাসয়ালা মাসায়েল সহ সময়োপযোগী যুগ জিজ্ঞাসার জবাব দেয়া হয়। এরমধ্যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কথা হাদীছে বিশেষিত পুরো বিষয় সহ বর্তমান প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের করণীয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেয়া হয়। ইসলামের সুমহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে হাজারো বেনমীরা তাদের ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন।

আশেকে রাসুল হযরত শাহ মাওলানা হাফেজ আহমদ (রাহ.) প্রকাশ শাহ সাহেব চুনতি কর্তৃক প্রবর্তিত ১৯ দিনব্যাপী সীরাতুন্নবী (সা.) মাহফিল নবী প্রেমিকদের মিলনমেলা। একইসাথে এই মাহফিল ইসলামের সঠিক দাওয়াত প্রচার ও প্রসার এবং ঈমানী শক্তি বৃদ্ধির প্লাটফর্ম। দানা চত্বরই ইথলাই পেরিয়ে ১৯ দিনব্যাপী সীরাতুন্নবী (সা.) মাহফিলের সুনাম ও সুখ্যাতি দেশের গন্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে ছড়িয়ে পড়েছে।

মাসজিদে বায়তুল্লাহর দক্ষিণ পার্শ্বে তিনি চির নিদ্রায় শায়িত থেকে যেন প্রতি মুহূর্তে প্রত্যক্ষ করছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওনাকে জান্নাতুল ফেরদৌসের মেহমান করুক এবং চুনতি হাফেজ আহমদ (রাহ.আ.) প্রকাশ শাহ সাহেব কেবলা কর্তৃক প্রবর্তিত ১৯ দিনব্যাপী সীরাতুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাহফিলের সফলতা কামনা করি এবং একইসাথে এই মাহফিলে সীরাতুন্নবী (সা) এবং তাঁর প্রতিষ্ঠানেসমূহকে কেয়ামত পর্যন্ত জারি রাখুন। আমিন সুম্মা আমিন।

* লেখক : কমান্ডিন্ট, সদস্য, চট্টগ্রাম ইতিহাস গবেষণা কেন্দ্র, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ মুসলমান ইতিহাস সমিতি।



চুনতী ১৯ দিন ব্যাপী মাহফিলে সীরাতুন্নবী সা. : ঐতিহ্য ও প্রভাবঃ-

ড. মুহাম্মদ ওয়ালী উল্লাহ মুন্সি

Dhaka University Institutional Repository



চুনতীর শাহ্ সাহেব মাওলানা হাফেজ আহমদ রহ.

১৯০৪- ১৯৮৩ সাল

হাদ মাখাদে মুহাম্মদ দেন মত জাহেদে
নিসেবনী মে ইতেহি কাদা কদ জাহেদে

তাওহীদের পীযূষসিক্ত ও ঘ্রাণে আপুলাই ঈমান। শিক্ষাআকা, সাধনা-সাধনি, আত্মীয়-স্বজন এবং দারা দুনিয়ায় সম্পর্কিত্বের ছোয়া যেমনভাবে ঘটে ঘাসে আল্লাহর পেয়ারা হাবীব মুহাম্মদ সা. — এটি তুলনাহীন-রাহীসের অবিধানী। মোহাম্মে পাগলামি আছে সত্য তবে আত্মপাকা নিবীন প্রেম স্বার্থ। চুনতীর শাহ্ সাহেব আওলানা হাফেজ আহমদ রহ. যেমনি নবী প্রেমের পাগল ছাড়ে কিন্তু সদক কালা ঘরে পাহাড়ে-জঙ্গলে আর খাল-বিলে-নালাতে ঘুরে বেড়িয়েছেন তেমনি চুনতী হাকীমিয়া আলিয়া আওলাদের নিকট ছিড়াতে নালন গ্রাদু ও ১৯ মিল বাংলা বাহুকিলে নীরবুদ্ধারী সা. প্রবর্তন করে ইতেকাতে মুহাদ্দেস ঐতিহাসিক স্বাতিত্ব আপলাম দিয়েছেন। তাই তার ঘুমে ঘুমে ফেলা উপত্যকা তরণ মু'শামি ছিল সথার্থ।

জন্ম বৃত্তান্ত

চুনতীর শাহ্ সাহেব আওলানা মোফেজ আহমদ রহ. ১৯০৪ সালে দক্ষিণ চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলাধীন আলিম-ওলামা ও মুনীজনের ঐতিহ্যমন্ডিত চুনতী গ্রামের 'হাউবুক মঞ্জিল' এ জন্ম গ্রহণ করেন। তার আব্বাজান মাওলানা ইসহাক আহমদ ও মাতাজান মাওলানা কাজী মুহাম্মদ ইউসুফ আলী রহ. ছিলেন অপদাকার নামধ্য ব্যক্তি ও চট্টগ্রামে বিদ্যা-বুদ্ধি ও ধনে-মানে অনন্য। ১৯০৭ সালে শিক্ষা জীবী সাহেব পুত্র মায়ের স্বল্প সময়ান্তরে পেলে স্নেহাশ্রয়ে, ইস্কেন্দার কথেন এবং, হাজার শতীমের অপত্যিসুলে আল্লাতুল মায়ারাহাকে সমাধিস্থ হন।" শাহ্ সাহেবের পূর্ব পুরুষদের মধ্যে অর্থ শতাব্দিক আলিম ও মুহূর্পাদন ছীনের সন্ধান পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে শাহ্ আওলানা বজুল আলী মুপসেফ ও তার ভ্রাতাগণ, শাহ্ সাহেবের নানা আওলানা কাজী মুহাম্মদ ইউসুফ আলী ও তার ভ্রাতাগণ,পাশ্বমুখ জমীদারক আওলানা ফজলুল হক মুন্সীবেদী তার ভ্রাতাগণ, আর বাহাদুর হিজিলিয়া আওলানা মুহাম্মদ হাছান, হযরত শাহ্ সাহেবের শ্বশুরাক আই ও অগ্নিপতি তার পিতা ও পীরসাহেব, চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলিয়া মাদরাসার প্রাচ্যভাজন উস্তাদ,শাহপ্রণত কবীরক শাহ্ আওলানা সফীয় আহমদ রহ.,শাহ্ সাহেবের শাহ্ সাহেবের ব্যক্তাআলাগ পক্ষ আই স্ত্রাবী হাকীম আওলানা শাহ্

মুফীয় আহমদের আম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য[**]। শাহ্ সাহেব বাবার ১ম ও বর্ণশিক্ষাগুরু নানী হাজেরা খাতুনের প্রথম সন্তান ছিলেন। জন্মের ৭ দিন পর পরিবারে তার আগমনের অনুকাদে খুশীয়াম তরাণ করেন।

শিক্ষাদীক্ষা

আলিম ও বীশক্তি সম্পন্ন শিশুর হাতেই শাহ্ সাহেবের পড়ালেখার প্রকৃকপাত। তিনি বীয়ে অত্যেধারণ হলে আব্বা সন্তানের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পাদনের জন্য পার্শ্ববর্তী গ্রাম আমিরাবাদের আওলানা বজলুর রহমান প্রবাশ মেলা মৌলবী সাহেবের নিকট কোরআন পর্যন্ত অধ্যয়ন শেষে তিনি কিছুদিন পারকলনিয়া উপজেলাধীন আফকল্যান সম্পন্ন আওলাদের পাঠশোলা আসেন। এরপর আজোপসাগরের ঐতিহাসী প্রাকৃত পীরসাহেব আজুরা আই আদরআলার তিনি আওলানা ফজলুল হক[***]র তত্ত্বাবধানে কাছেক বছর শিক্ষাদীক্ষা লাভ করেন। অতঃপরে শাহ্ সাহেব এখাদ থেকে চলে আসেন চট্টগ্রাম শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত মাকরল উলুম আলিয়া মাদরাসায়। সেখানে মুনাদ্রেস মুহাদ্দিস আওলানা ফজলুর রহমান, আওলানা নজীর আহমদ, আওলানা মুহাম্মদ আমীন প্রমুখের কাছে শিক্ষালাভ করে জমাতে ছিতীয় তথা আলিম পাশ করেন। উচ্চতর শিক্ষার আগ্রহ উৎসাহে তিনি সেখাদ থেকে আলিমকা আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন এবং সুধী সাধক আওলানা আফিজউদ্দীন আ পাশকরে মৃতিসত্বের সাথে জার্জিল পাশ করেন। অতঃপর এখাদে কামিলের হাদিস অধ্যয়নের জন্য শাহ্ সাহেব ভর্তাই পেলেন। কিন্তু বিধাতার ধরবদালা ছিল। ইতিমধ্যে তিনি অসাধক অসুস্থ হয়ে পড়ায় কামিলের ফাইনাল পরীক্ষা দা দিয়েই সেখে ফিরতে হলো। আর এখাদেই তার প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার ইতি ঘটে[****]।

** , মুহাম্মদ উসমান গনি,চুনতী হাকীমিয়া আলিয়া মাদ্রাসার প্রতি মুহাদ্মাদের নিয়ত্ব [illegible] হাফেজ আহমদ শাহ্ সাহেব রহ, এক অসাধা, প্রবাসর প্রতিভা অধিকারী সাধক, আওলাদের [illegible] শাহ্সাহিত্য চুনতী হাকীমিয়া আলীয়া মাদ্রাসা, প্রকাশকাল: ১৪ ই আগষ্ট ১৯৮৩ ইংরাজী, পৃষ্ঠা।

*** এরকমকালে হাফেজ হাজেরা খাতুনের প্রথম সন্তানের আওলাদটির প্রথম বাবীকা আওলানা মুহাম্মদ ফজলুল হক ঐতিহাসিক বাড়ীর প্রধাতার প্রাপ্তিকেরিক ব্যক্তিত্ব আওলানা মুহাম্মদ হাছান, হযরত শাহ্ সাহেবের শ্বশুরাক আই ও অগ্নিপতি তার পিতা ও পীরসাহেব, চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলিয়া মাদরাসার প্রাচ্যভাজন উস্তাদ,শাহপ্রণত কবীরক শাহ্ আওলানা সফীয় আহমদ রহ.,শাহ্ সাহেবের শাহ্ সাহেবের ব্যক্তাআলাগ পক্ষ আই স্ত্রাবী হাকীম আওলানা শাহ্ সাহেবের ১ম বিয়ে সম্পন্ন হয়। এ ঘরে ২ পুত্র ও ১ কন্যা সন্তান লাভ করেন তিনি। তবে একপুত্র ও কন্যার অকাল মৃত্যুতে দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। ছেলে শাহ্ জামাল আহমদ ও মেয়ে আমিনা বেগমের বংশ পরিক্রমা বিস্তার লাভ করে। ১৯৭৭ সালে দ্বিতীয়বার উদ্বোহ করেন শাহ্ সাহেব স্থানীয় আওলানা আবদুর নূর সিদ্দিকীর কন্যা রহমান বেগমের সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। এ ঘরে কোন সন্তান-সন্ততি জন্ম নেয়নি। প্রথম বিয়ের পর শাহ্ সাহেব চলতিধার ইসিপিয়ায় নানা স্বপ্ন জনাবুল আলী চৌধুরী বাড়ীর মসজিদে ইমামতি করেন। বড় ছেলে শাহ্ জামালের জন্মের পর কিছু সিন গভীরভাবে আধ্যাত্মিক সাধনায় নিয়োজিত হওয়ার পর আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসেন। বাবার সাথে তাদের ব্যবসায়িক ও জমিজমাই সম্পর্ক ছিল বহুদিনের। এখানকার ঈদ গীমাহে জন্ম মাসে একটি ছোট শহর রয়েছে। এখানকার একটি মসজিদে শাহ্ সাহেবের দাদা বলদীর আওলানা ইমামতীন খতীব ছিলেন। শাহ্ সাহেব এ মসজিদে বাবার চুনতীমিক হিসেবে ছয় মাস ইমাম ও খতীবের দায়িত্ব পালন করেন।

মাজদুর হাসান

শাহ্ সাহেব জন্মুর এ মসজিদে ইমামতির দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে ১৯৭৬ সালের মাসের ২৭ তারিখ সাইফুল কুবরের সন্ধান পান অতে জানা যায়। এদিন শাহ্ সাহেব আল্লাহ্ পাকের কাছে কিছু চেয়ে দেন এবং ইশকে ইলাহীর প্রেমে মজে যান। তিনি স্থির থাকতে পারছিলেন না। বন-জঙ্গলে, আড়ালে-আবডালে এমন সব পাগলামি করতে পাগলের সবাই তাকে নিয়ে মহা মুসিবতে পড়ে গেলেন। অবশেষে আব্বুর ঐ জমজিদের ছামি ইমাম আওলানা গোলাম মোস্তাফা চুনতী খতর পাঠালেন শাহ্ সাহেবকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। খবর পেয়ে হুজুরের ছোট ভাই আওলানা সালেহ আহমদ চেলাদান নিয়ে ইমাম বাহেবের তত্ত্বাবধিনায় কোমরে ও হাতে শিকল বাঁধা অবস্থায় চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে সিমাহে তুলে নেন। সেখে এসে বাবদ ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা করা হলেও তিনি স্বাভিক হয়ে উঠেননি। ফলে তাকে ঘরে আটক করে রাখার ব্যবস্থা হয়। একবারব্যুহ ভুটীকরের সময়ে আগ উপরহারেদের বিধ্যাত বুজুর্গ হযরত হামেদ হায়দার আব্বাদাদী রহ. এ মুদ্ধ সেখে অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং বলেন,"তোমরা তাকে ছেড়ে দাও। সেঁয়ে রাখলে হয় এরকম পাগল তিনি নন। এক সময় তোমরা বুঝতে পারবে"। এরপরে প্রায় ২৫/৩০ বসরর তিনি মাহসাধিক জীবন ভ্যাগ করে মাসেকে হাকীমের সন্ধানে পাহাড়-পর্বতে, বনে-জঙ্গলে, অলিতে-গলিতে, পথ্যে-বপথে, শীতে-গরমে, ঝড়-বৃষ্টিতে, অলোকে-অন্ধকারে অত্যাচার নিকট ও রাতপুলে আকাশের নী, এক প্রশংসা করে বেড়াতেন। পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পরিত্যাগ করে তিনি বেড়াতে ঘুরিয়াছি করতেন তাকে সবাই তাকে হযরত ওয়াইস আল

বিবাহ ও কর্মজীবন

কলিকাতা আলিয়া মাদরাসায় অধ্যয়নকালীন ১৯৩৪ সালে মাত্র বুলনাহে আগদ ছাত্রাবো। পাঁচ মাওলানা বদীর আহমদের কন্যা মাহমুদা খাতুনের সাথে শাহ্ সাহেবের ১ম বিয়ে সম্পন্ন হয়। এ ঘরে ২ পুত্র ও ১ কন্যা সন্তান লাভ করেন তিনি। তবে একপুত্র ও কন্যার অকাল মৃত্যুতে দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। ছেলে শাহ্ জামাল আহমদ ও মেয়ে আমিনা বেগমের বংশ পরিক্রমা বিস্তার লাভ করে। ১৯৭৭ সালে দ্বিতীয়বার উদ্বোহ করেন শাহ্ সাহেব স্থানীয় আওলানা আবদুর নূর সিদ্দিকীর কন্যা রহমান বেগমের সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। এ ঘরে কোন সন্তান-সন্ততি জন্ম নেয়নি। প্রথম বিয়ের পর শাহ্ সাহেব চলতিধার ইসিপিয়ায় নানা স্বপ্ন জনাবুল আলী চৌধুরী বাড়ীর মসজিদে ইমামতি করেন। বড় ছেলে শাহ্ জামালের জন্মের পর কিছু সিন গভীরভাবে আধ্যাত্মিক সাধনায় নিয়োজিত হওয়ার পর আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসেন। বাবার সাথে তাদের ব্যবসায়িক ও জমিজমাই সম্পর্ক ছিল বহুদিনের। এখানকার ঈদ গীমাহে জন্ম মাসে একটি ছোট শহর রয়েছে। এখানকার একটি মসজিদে শাহ্ সাহেবের দাদা বলদীর আওলানা ইমামতীন খতীব ছিলেন। শাহ্ সাহেব এ মসজিদে বাবার চুনতীমিক হিসেবে ছয় মাস ইমাম ও খতীবের দায়িত্ব পালন করেন।

মাজদুর হাসান

শাহ্ সাহেব জন্মুর এ মসজিদে ইমামতির দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে ১৯৭৬ সালের মাসের ২৭ তারিখ সাইফুল কুবরের সন্ধান পান অতে জানা যায়। এদিন শাহ্ সাহেব আল্লাহ্ পাকের কাছে কিছু চেয়ে দেন এবং ইশকে ইলাহীর প্রেমে মজে যান। তিনি স্থির থাকতে পারছিলেন না। বন-জঙ্গলে, আড়ালে-আবডালে এমন সব পাগলামি করতে পাগলের সবাই তাকে নিয়ে মহা মুসিবতে পড়ে গেলেন। অবশেষে আব্বুর ঐ জমজিদের ছামি ইমাম আওলানা গোলাম মোস্তাফা চুনতী খতর পাঠালেন শাহ্ সাহেবকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। খবর পেয়ে হুজুরের ছোট ভাই আওলানা সালেহ আহমদ চেলাদান নিয়ে ইমাম বাহেবের তত্ত্বাবধিনায় কোমরে ও হাতে শিকল বাঁধা অবস্থায় চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে সিমাহে তুলে নেন। সেখে এসে বাবদ ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা করা হলেও তিনি স্বাভিক হয়ে উঠেননি। ফলে তাকে ঘরে আটক করে রাখার ব্যবস্থা হয়। একবারব্যুহ ভুটীকরের সময়ে আগ উপরহারেদের বিধ্যাত বুজুর্গ হযরত হামেদ হায়দার আব্বাদাদী রহ. এ মুদ্ধ সেখে অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং বলেন,"তোমরা তাকে ছেড়ে দাও। সেঁয়ে রাখলে হয় এরকম পাগল তিনি নন। এক সময় তোমরা বুঝতে পারবে"। এরপরে প্রায় ২৫/৩০ বসরর তিনি মাহসাধিক জীবন ভ্যাগ করে মাসেকে হাকীমের সন্ধানে পাহাড়-পর্বতে, বনে-জঙ্গলে, অলিতে-গলিতে, পথ্যে-বপথে, শীতে-গরমে, ঝড়-বৃষ্টিতে, অলোকে-অন্ধকারে অত্যাচার নিকট ও রাতপুলে আকাশের নী, এক প্রশংসা করে বেড়াতেন। পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পরিত্যাগ করে তিনি বেড়াতে ঘুরিয়াছি করতেন তাকে সবাই তাকে হযরত ওয়াইস আল

করনী রহ. এর সাথে তুলনা করতে লাগলেন। তিনি বহুদের অধিকাংশে সময় রোজা রাখতেন। মাজদুর হাসানের তিনি পোষাক-আশাকে কিছু নিজস্ব পালন করতেন। শাহ্ সাহেবের অবস্থা দেখে লোককজনের মাঝে বিশ্ব প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলে সমকালীন পীর শায়খুল্লী আওলানা আবদুল লালাম আজকালী রহ. বলতেন, "তোমরা হাফেজজিকে ছেড়ে দাও তো না। তিনি একদিন স্বাভাবিক হয়ে আপন পরিচয় দেবে এবং বুজুর্গ হিসেবে গণ্য হয়ে আমানি হাসান এশিরিয়ার করবে"। শাহ্ সাহেব নজরের মশকের শুরু যখন ঘাসেমাত্র হাসান থেকে পর্যায়ক্রমে স্বাভাবিক অবস্থায় চলে আসতে থাকেন এবং ধীর অপরিণীম প্রচেষ্টায় নির্বিঘ্ন 'শাহ্ মঞ্জিলে' কাবধান করতে শুরু করেন। আব্বাজুর ও জমালি উভয় হাসকে তার অসংখ্য কারামত এখনও লোক মুখে শুতি হয়ে ফেরে।

ঐতিহাসিক নীরবুদ্ধারী মাহফিলের প্রবর্তন

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে ইসলামের উপর আঘাত আসতে থাকে। ভুলপ্রচারনের মাধ্যমে ওয়াজ-নসীহত ও ইসি তালিম-তরবিয়তের চর্চা বন্ধকে পড়ে। কোন্দোসা হয়ে পড়া আলিম- ওলামায় অনৈক্য ও অসুজনদিতার সেসারক নিয়ে থাকে। ফেমনি মুহূর্তে ইসলামী আদর্শে ঐক্যবদ্ধ গুটিফবার চৈতনীর লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে শাহ্ সাহেব তাকলীদে ফেলাদকের মধ্যে দাহিত্ব মাথায় নিয়ে নীরবুদ্ধারী মাহফিলের যাত্রা করেন। প্রথম বছর একদিনের এ মাহফিল শাহ্ মঞ্জিল চত্বরেই অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭৩ সালে মাহফিল শাহ্ মঞ্জিলের দক্ষিণ পার্শ্বের বিলে ৩ দিন ধরে পরিচালিত হয়। এভাবে ১৯৭৪ সালে ৫দিন, ১৯৭৬ সালে ১০দিন, ১৯৭৭-৭৮ সালে ১২দিন এবং ১৯৭৯ সালে ১৫ দিন হিসেবে ধার্য করা হলেও শাহ্ সাহেবের ঐ পর পর ২ দিন করে বাড়িয়ে ১৯দিনে নিয়ে গিয়ে সমাপ্ত করেন। ১৯৮০ সাল হতে অদ্যাবধি মাহফিল ১৯ দিন করেই চলে আসছে। সূচনার ২য় বছরেই মাহফিলে লোক সমাগম বৃদ্ধি পেতে থাকলে ২/৩ একর খালী জমিতে জায়গা সংকুলান না হওয়ায় শাহ্ সাহেব ও অন্যান্য উদ্যোক্তারা চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে পড়েন। এমনি অবস্থায় পীরত চলাকালীন সময় একদিন ইশার নামাজের পর শাহ্ সাহেব বলেন, " এদিকে (পশ্চিম দিকে) পীরতের মাঠ হয়ে যাবে"। পরবর্তীতে পশ্চিম দিকের প্যারাডিসা এলাকার অধিবাসীদের সাথে যোগাযোগ করতঃ উপযুক্ত মাইমান বিনিময়ে তা খরিদ করা হয় এবং সাথে শাহ্ সাহেবের নিজ পরিবারের জন্যানদের কিছু জমাদাধিকার সম্পত্তিও একীভুক্ত করে ৩২ কানির বিশাল পীরত মাঠ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৭৭ সাল হতে এ মাঠেই পীরবুদ্ধারী মাহফিল উদ্দযাপিত হয়ে আসছে। এ পীরবুদ্ধারীর বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে ১১-০০ ঘরিকাল আহিয়াল ট্রাফিল দিবসাদ্দী সকাল বিকাল লক্ষ লক্ষ নারী -পুরুষ ও শিশু-কিশোর সবার জন্য খাবার-আখার উন্মুক্ত। মাহফিলে দেশ-বিদেশের বরেণ্য আলী-গুনীজনের পক্ষ হতে তুরস্কাণ-সুস্নাহর আলোকে বিষয়ভিত্তিক

Dhaka University Institutional Repository

চুনতি সীরাতুন্নবী (সা) মাহফিল
আধ্যাত্মিক প্রেক্ষাপট

ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী

সৃষ্টির শুরু থেকে পৃথিবীতে যত ধর্ম এসেছে সব ধর্মের প্রধান ও একমাত্র লক্ষ্য ছিল স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ। তুলে তুলে মহানুভবগণ স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে এই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য আজীবন সাধনা করেছেন। প্রশ্ন হল, আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা কীভাবে সম্ভব? কীভাবে অসীমের সান্নিধ্য অর্জন করতে পারে? মানবের কুলবৃত্তির এই প্রক্রিয়াটি খুব সহজে এসেছে।

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل، قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة

"আনাস ইবনে মালেক (রা) হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার রবের কথা থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ পাক বলেন, বান্দা যখন আমার দিকে এক বিঘত পরিমাণ আসার হয় আমি তখন তার দিকে এক হাত পরিমাণ এগিয়ে যাই। সে যখন আমার দিকে এক হাত পরিমাণ এগিয়ে আসে আমি তখন তার দিকে দুই হাত পরিমাণ এগিয়ে যাই। বান্দা যখন আমার দিকে হেঁটে হেঁটে আসে আমি তখন তার দিকে দৌড়ের গতিতে এগিয়ে যাই।" (বুখারী : ৭৪০৬, ৭৪০৫, ৭৪২৮; মুসলিম : ২৬৭৫)

এই হাদীস থেকে বুঝা যায়, বান্দা আল্লাহর দিকে আসার ব্যবস্থার বাপে বাপে তিনি এগিয়ে এসে বান্দাকে কবল করে নেন। হাদীসের বাক্যগুলি থেকে আরো বুঝা যায়, আল্লাহর সন্নিধ্য লাভের দুটি ধরন আছে। একটি হল, ধীরের হেঁটে। এই হেঁটে হয় ইবাদত বন্দেগী ও সাধনার জীবন অতিবাহিত করার মাধ্যমে। দ্বিতীয়টি ধরন হচ্ছে, যখন আল্লাহ বান্দাকে নিজের সান্নিধ্যে নিয়ে যাওয়ার। তখন হচ্ছে, বান্দা নিজ থেকে সাধনা হেঁটে। তখনই আল্লাহ বান্দাকে নিজের কাছে টেনে নেন। আল্লাহ যাদেরকে টেনে নেন, তারা আল্লাহর ওলীতে পরিণত হন।

মক্কাশরীফ ছাড়ি (র) একটি ছোট উপমার সাহায্যে বিষয়টির চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আল্লাহর পথে আসার ব্যবস্থার সাধনা এবং আল্লাহ নিজে বান্দাকে টেনে নেওয়ার প্রক্রিয়াটিকে তিনি মরিচ শিশুরের উপমা দিয়ে বুঝিয়েছেন। শিশুরী প্রথমে আসল মরিচ পানিতে দেখে দেখে। কিন্তুদূর অগ্রসর পর পানিতে নয়, বরং কস্তুরী মাটির তৈরি আরেকে সুগন্ধি এসে শিশুরীকে মাতোয়ারা করে ফেলল। এখান থেকে সেই সুবাসই সাধককে প্রবল আকর্ষণে নিয়ন্ত্রণসহায় করে ফেলে। সে তখন শিশুর মাপালে পাওয়ার জন্য পাগল উন্মাতাল হয়ে ওঠে। একে বলে উপরের আকর্ষণ। এতক্ষণ ছিল সাধনা। সাধনার পরের ধাপে এসে আকর্ষণ।

چشنگاش گشتم آهو در خور است
بعد از آن خود ناف آهو رهبر است

প্রথম পরিবেশ খুঁজে আছে সবাইকে আজ
যার আমিন যেথা নাভে আছে তাহারা আজ
আরার সুবাসে হরিণের পানিয়ে পথের নিশানী

তার পরে হয়, কস্তুরি নাভী হতে যায় বাহারী। ২/১২৩

সেই আকর্ষণে, প্রেমের টানে সে ধীরে পরিবারে ছুটে। এখানে সাধক সে পথ পাক মনযিলে অতিক্রম করে মেঞ্জিক সে পথ পাড়ি দেয় এক মনযিলে।

رفتن یک منزلی بر بوی ناف
بهتر از صد منزل گام و طواف

রফতনে য়াক মনযিলী বর বুয়ে নাফ
বেহতর আয় সদ মনযিলে গাম ও তওয়াফ

এক মনযিল পাড়ি দেয়া কস্তুরির সুবাস টানে
পালাক, চক্কর পদক্ষেপ চেয়ে উত্তম শতগুণে। ২/১২৩

আলিমে আকর্ষণকে বলা হয় ফানা। ফানা শেষে মঞ্জযুর শুরু পরিক্রমা। আধ্যাত্মিক পরিভাষায় মজযুব বলে এমন একটি অবস্থাকে, যাদের নিজস্ব নিজের কাছে নেই। তাদের জীবনযাত্রা, আচার বিচার আভাবিক মানুষের মতো নয়। তারা আল্লাহর ভালোবাসার আকর্ষণে উন্মাতাল। চুম্বক যেমন লৌহখণ্ডকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে যেমনি এরা আল্লাহর মহব্বতের উপাদানগুলোর দিকে আকর্ষিত থাকে। সুতরাং আল্লাহর ওলীদের দুটি পরিচয় সাধক ও মজযুব।

এদেশে ইসলামের প্রচার প্রসার হয়েছে আল্লাহর ওলীদের মাধ্যমে। পরিশোষে আধ্যায় পুথি পড়বেশ। ইতিহাস বলে, বাংলার জমিনের এমন কোনো অলিগলি নেই, যেখানে কোনো না কোনো ওলী আল্লাহর পদার্পণ হয় নি। ইসলামী আধ্যাসে তাসাউফের আক্রমণে ইরান ও বাগদাদ প্রাক্কালে পরিণত হলে অনেক অলিয়ে ওলী সরবেশ, ইসলাম প্রচারক দলে দলে এসেশে হলে আসেন। তারা এখানে গিয়ে শাখী করে সাধারণ মানুষের সাথে মিশে যান। এভাবেই যা ধন দেখে সাধারণ মানুষের কাছে আল্লাহ ও রাসূলের বাণী প্রথম ছিল তাদের জীবনের একমাত্র সাধনা। আল্লাহ ও রাসূল (সা) এর মহব্বতের বাতাবরণে মানুষকে ইসলামের সৌন্দর্যের দিকে আকর্ষণের এই ধারা পরবর্তী যুগেও অব্যাহত থাকে। সরবেশ সমাজে চট্টগ্রামে কোনো বাঙ্গালী সাধারণ এই ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন।

আমরা যে মাহফিল নিয়ে আলোচনা করছি তার প্রবর্তকও ছিলেন মজযুব ওলী। তিনি ছিলেন চুনতির শাহ হাবেদ নামে পরিচিত মওলানা হাফেজ আহমদ (র)। তুর্কিশ আমলে বাংলার মানুষের বিশেষ আকর্ষণ ছিল আরবি প্রতি। বিশেষত চট্টগ্রামের লোকদের অর্থ-উপার্জনের উর্বর ক্ষেত্র ছিল আরবি, আরাকের মায়ানমার। হিন্দুস্তান হতে মাদ্রাসায় উচ্চতর লেখাপড়া শেষ করে মওলানা হাফেজ আহমদ কর্মাধ্য একটি মনযিলে ইমামতিতে নিয়োজিত হন। এক রমযানে শেষ তারাবের আগে তাকে তিনি উপস্থিতদের এমন আকর্ষণ বলতে পড়ে যান যেখান থেকে তের হজারের পথ আর ছিল না। এরপর থেকে আর জীবনের দীর্ঘ ৩৭ টি বছর তেটি যান পাগল বেশে, পাগল পরিয়ে বনে জঙ্গলে। চুনতি অঞ্চলবাসীর যান তত্ত্বাবের সঙ্গে ছিল তার অধিবাস।

মজযুবরা আল্লাহর পাগল। আল্লাহর দিকে আকৃষ্ট থাকেন। চুনতির শাহ হাফেজ আহমদ (র) এর বেলায় তবু আকৃষ্ট বলবে কম বলা হবে। সমুদ্রে যখন ঝড় উঠে, প্রবল ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়। ঘূর্ণাবর্তের মাঝে যা কিছু পড়ে, উচ্চতাকারে নিজের মধ্যে তলিয়ে নেয়। চুনতির শাহ হাফেজ ভেতরে এমন ঘূর্ণাবর্তে পড়েছিলেন। যা সত্যিই বিস্ময়কর। কারণ, আল্লাহর ওলীদের জীবনে 'তুফান' বা 'অস্থতা' আসে, আবার 'সাহত' বা 'ঠেকন' অবস্থা বলবে হয়। কখন তারা স্বাভাবিক জীবন যাপন করেন। কিন্তু দীর্ঘ ৩৭ বছর তুফান বা অস্থতার মধ্যে থর সংসার, স্বাভাবিক জীবন থেকে বঞ্চিত হয়ে বন্ধ পাগল বেশে কাটিয়ে দিয়েছেন এমন কোনো ওলী

বর্তমানে আরেকটি ভিত্র প্রকাশ হচ্ছে, আলেকে রাসূল করিমের কিছু লোকের দুটে রাসূল (সা) এর প্রকাশের খবী দুটে। তার বাস্তব জীবনে শরীয়তের বিধিবিধান ও সুন্নাত অনুসরণের বালাই নেই। নবীজির পূর্ণাঙ্গ জীবনের সুন্নাত এবং ইসলামের বিভিন্নমান রাষ্ট্রীয় জীবনে বাস্তবায়নের কথা বলা হলে, এরা বলে, এসব ঢের তাকনীতি। নবীজির ১০ বছরের মদনী জীবন ও খেলাফতে রাশেদার ৩০ বছরের রাষ্ট্র পরিচালনার ইতিহাস বাদ দিলে ইসলামের আর কি থাকে, জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়। এদের সামনে ইসলাম ও নবী জীবন মানে নবীজির পাক-নাম ও অলৌকিক ঘটনাবলীর ঘাটের আর কিছু নেই।

আজর বিধান আলোচিত দুই শিশুরীবুদি 'উর প্রবর্তনার মেকলিয়ার চুনতি সীরাতুন্নবী (সা) মাহফিল মেলাবেরের আগে ভূমিকেছে। এ মাহফিলের আয়োজন, তবু নবীজির আলোকবাসার সাথি কথনেই হবে না, নবীজির আলোবাসা মুখে ধারণ করে নিজের বাড়ি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে নবীজির সন্ধান জীবনাদর্শের আলে আলোকের চেকনা আয়ার থাকতে হবে। তাকলেই সীরাতুন্নবী মাহফিলের এই দর্শন ও আয়োজন বাস্তবে রূপায়নের জন্য এগিয়ে এসেছিলেন একজন আলেমাপাল। তিনি ছিলেন চুনতি আন্তানার বাজের 'আল আমার' নামের উচ্চাল আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠানের আগের দীন ব্যবস্থার মওলানা আব্দুল্লাহ (র)। তিনি মনের সাধুটুকু আরেক মিশিয়ে ১৯দিন ব্যাপী সীরাত মাহফিলের জন্য এলাকাবাসে বিষয় নির্বাচন ও বিন্যস্ত করেন, যাতে নবী করিম (সা) এর গোটা জীবনটির ও ইসলামের পূর্ণাঙ্গ পরিচয়ের একটি ছক অঙ্কিত হয়।

আজকের সমাজে বর্তমান মাহফিলের এক প্রধান আলোচ্য বক্তা ছিলেন ও আছেন। তার সাথে যারা ঘুরে ঘুরিয়ে মিলিয়ে একই পরাজয় আসেন। নবী জীবনের আলোকিক ঘটনাবলী নিয়ে প্রোগ্রামের মূল কথাই আসের লক্ষ্য ছিল। চুনতি সীরাতুন্নবী (সা) মাহফিলে প্রত্যেক বক্তার জন্য আলাদা বিষয়বস্তু ঠিক করে দেয়ার পর এই প্রোগ্রামে পরিবর্তন আসে। বক্তারা পূর্ব নির্ধারিত বিষয়বস্তুর উপর লেখাপড়া ও গবেষণা করে বক্তৃতার মেটা তৈরি করতে বাধ্য হন। এর ফলে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা পরিষেবের যে ধারা শুরু হয়, তাকে আমাদের বর্তমান মাহফিল মাহফিলের ইতিহাসে বিপ্লবী পদক্ষেপ হিসেবে মূল্যায়ন করতে হবে।

১৯৭২ সালে মেশাল্লুহে ইসলামী চট্টগ্রাম ও আলেম সমাজের দৃষ্টিনে আশার আলোকবর্তিকা হয়ে জ্বলে উঠেছিল ১ দিনের সীরাত মাহফিল। পরের বছরগুলোতে ৩ দিন, ৫ দিন, ৭ দিন, ১০ দিন, ১২ দিন, ১৭ দিন ও সর্বশেষ ১৯ দিনের এই সীরাতুন্নবী মাহফিল মেকলিয়ে সবার দৃষ্টিকে বাধাবন্ধ আয়োজনের বিষয়টিকে বিষয়কর। ৮০ বছর বয়সে ১৯৮৩ সালে শাহ হাবেদের ইন্তিকালের পর মেলো মেলো ভক্ত মেলের অপারাগ প্রকাশ করায় বিরাট মাহফিলের মেয়াদকাল চলু রাখার আকাশী মেলা নিল। মাহফিল ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতা বাস্তবভাবে ভিত্তির হয়ে পড়লেন। তাদের একজন নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে আমাকে বলেন। মাহফিল শুরু হলে আমরা সাকী উপরোধে নামে পর নিয়ে ভাবছিলাম। খাবার এক মেলা কথা বা শিশু-বিশেষজ্ঞের বক্তব্য করার জন্যও নিমেজনায় আসেন। কিন্তু পরীর হায় পর্যন্ত তিনি সিদ্ধান্তহীনভাবে দুলতেই থাকে গেল। হাতে বাসার ফিরে আসে দেখি, পাশ হাবের মেকলা আয়োজন ধলছেন, মেলার মানুষকে সীরাত মাহফিলে আসার জন্য সাওয়াত দাও না কেন?

শুরুতে উঠে ভাবছিলাম, মানুষ মেলি হলে, এ নিয়ে আমরা দুশ্চিন্তায়। অথচ আজ যা ঘুরলাম, তাতে আমে মেলি মানুষ ডাকার আগলা। মোকলো দুলতেই মৈতিকে আমার বাসলাম। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হল, একটী মাইক্রো নিয়ে পাড়ায়, মহল্লায়, বাজারে গিয়ে মানুষকে সীরাত মাহফিলে আসার দাওয়াত দিতে হবে। একটী মাইক্রোতে মেলে আমরা কতিপয় গ্রামের বিভিন্ন হাটে বাজারে ও লোকালয়ে গিয়ে সীরাত মাহফিলের দাওয়াত দিলাম। আমাদের দাওয়াতে অকল্পনীয় দুটি মেলি উপস্থিতির হল। মাহফিলে আসার উদ্দীপনায় তারা ছুটল, বাসি হতে কীভাবে যাই। মাহফিলের মেহমানদের জন্য তার গরু ও চালমল মোগাড় করল। এভাবেরাতিকে অনুষ্ঠানের সাড়া পড়ে মেল এবং মাহফিলের আয়ার বলতে আর কিছু থাকল না।

আরেকটি বিষয় সমাজে প্রথমে মাহফিলের আরেকটী মেলিক দুটে উঠেছে। পাশ, হাবের কেলনা তার কোনো খলিফা বা পরিবর্তীন রেখে যান নি। তিনি কাউকে দুটিনও করেন নি। কখনো মাইকের সামনে দু'কথা বলেন নি, নামাযে ইমামতি করেন নি বা লোকদের নিয়ে কোন মোনাজাতও কোনো দিন করেন নি। এরপরও একবার মাহফিল এতো সুন্দরভাবে পরিচালিত হওয়া এবং তার মেশের নানা ভিন্ন ও স্থানার দীর্ঘ আলোচনা মাহফিলে অংশগ্রহণের মধ্যে মিলাই রহস্য আছে। সাতকানিয়া উপজেলার পারাশিয়ার ছোট ধুয়ুর ও পরাশিয়া মাদ্রাসার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মওলানা আব্দুর রশীদ (র) সীরাতুন্নবী মাহফিলে একবার সভাপতির ভাষণে বলেন, পীর হাবেদরা চুনিদের কলবে আল্লাহকে দেন। তাতে তাদের দিলের আঁধারি দূর হয়ে যায়, মোমাজের বাতি জ্বলে ওঠে। কিন্তু চুনতির শাহ হাবেদ আল্লাহকে দেন না, তুলিন করেন না, সবক দেন না। এরপরও মানুষ তার কাছ থেকে মোমাজের আলো পায়। কেননা, তিনি হলেন 'শামসুল আরেফীন' মারেফাতের সূর্য। সূর্য উদিত হলে এমনিতেই অন্ধকার দূর হয়ে যায়। আলাদা বাতি জ্বেলে আলোর ব্যবস্থা করার প্রয়োজন হয় না।

আল্লামা ইকবালের শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়া নামক দুটি কবিতার খ্যাতি জগত জোড়া। শেকওয়ায় তিনি মুসলিম উম্মাহর সমস্যাগুলো তুলে ধরেন এবং তার জবাব চান আল্লাহর কাছে অভিযোগ আকারে। শোনা যায়, তার এরকম দুঃসাহস জন্য কেউ কেউ তাকে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়ার ফতোয়া দেয়ার ব্যবস্থা করেছিল প্রথমে। পরে জওয়াবে শেকওয়া লিখে তিনি শেকওয়ার উত্থাপিত অভিযোগ গুলোর জবাব আল্লাহর পক্ষ হতে দেন, যা গোটা মুসলিম উম্মাহর কাছে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয় এবং ইকবাল এ সূত্রে ইসলামের তাত্ত্বিকতার মর্যাদায় অভিষিক্ত হন। জওয়াবে শেকওয়ার উপসংহারে উম্মাহ ঐক্য ও কবিবার শিল্প নিয়ে ইকবাল বলেছেন, উম্মতের যাবতীয় সমস্যার সমাধান হবে, যদি রাসূল পাক (সা) এর ভালোবাসার বন্ধনে তার সুন্দরের আবার নিয়ে সংঘবদ্ধ হওয়া যায়। ইকবাল বলেন, পৃথিবীতে একটী বিপ্লব চাই। এ বিপ্লবের জন্য একটী শক্তির দরকার। সেই শক্তি হতে হবে প্রেমের। তিনি বলেন,

قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے
دہر کو اسم محمد سے اجالا کر دے

কুওয়তে ইশক সে হার পস্ত কু বালা কর দে
প্রেমের শক্তিতে উঁচুমিচু সব ওলট পালট করে দাও,
বিশ্ব এই প্রেমের শক্তি কোথায় মিলবে? পরের ছত্রে তিনি সেই উৎসের কথা বলছেন এভাবে।

দাহর কো ইসমে মুহাম্মদ সে উজালা কর দে
জাগতটাকে মুহাম্মদের নামে আলোকিত করে দাও।

জওয়াবে শেকওয়ার শেষ চরণ দুটির মধ্যেও ইকবালের এই জীবন দর্শনের অনুরণন লক্ষণীয়। ইকবালের ভাষায় আল্লাহ পাক বলছেন-

کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

কী মুহাম্মদ সে ওয়াফা তো সে তো হাম তেরে হাঁ
ইয়ে জাহা কিয়া চিজ হে কেয়া লৌহ ও কলম তেরে হাঁ

মুহাম্মদের সাথে বিশ্বস্ততা রেখেছ তো আমি তোমার হয়ে যাব,
এ জগত তো তুচ্ছ, লৌহ কলমও তখন তোমার হয়ে যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহর জীবনকথা আমরা ইতিহাসে পড়েছি, এর আগে কোথায় যেন শুনেছি। যখনকার যুদ্ধের আগে আগে তিনি যখন স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসেন তখন আমি চুনতি হাফিজিয়া আলিয়া মাদ্রাসায় নিচের ক্লাসের ছাত্র। স্বচ্ছন্দবিহার জীবনে শান্ত ছায়াঘেরা বনাঞ্চলে ফিরবার গল্প শুনেছি, কিন্তু নিজের চোখে দেখিনি, তবে তার আগের চুলের যে ছবিটির কথা আমার মনে আছে। তার সাথে ব্যক্তিগত বহু স্মৃতির মানসপটে এখনো অঙ্কিত।

তার জীবনের এই ছোট্ট বৃত্তকে হলে আধ্যাত্মিক সাধনার কয়েকটি মূল কথা সামনে রাখতে হবে। সাধনার পথে সাধকের প্রথম কাজ হয় 'আত্ম নিগ্রহাস ইলাল্লাহ।' মানুষের চেতনার স্রোত আল্লাহর দিকে পরিচালন। এ স্তরে সাধক, সমাজের সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ আল্লাহমুখি করে তোলেন। আগেই বলেছি, এ কাজটি হয়ত সাধক নিজেই করেন, যা অত্যন্ত কঠিন ও কষ্টসাধ্য। অনেকটি গভন হয়ে উর্ধ্বলোকের আকর্ষণ। এই আকর্ষণে পড়লে সাধক যে পথ একদম সহজে অতিক্রম করে মঞ্জিলে তা এক হাতে পাড়ি দেয়।

সোজাসুজি স্রোতে আল্লাহমুখি হওয়ার সাধনা আপাতিক অর্থেও মতে পারে, কিংবা জনপদ্রে বর্জন করে 'খালওয়াত সহ জার' হিসেবে রূপক অর্থেও মতে পারে। অর্থাৎ সবার মাঝে বিরাজ, অথচ একমাত্র আল্লাহর সাথে মন। কা'বাঘরের তওয়াফ করতে আমেরকে সাথেই ঘুরতে হয়, কিন্তু তওয়াফকারীর ধ্যানে ও জ্ঞানে থাকে কেবল একজন। তার জন্যই সে পাগলপারা, দেওয়ানা। মৃত্যুমুক্ত পাড়ি দিয়ে তার সন্নিধ্যে পৌছার আগের সে সফরের সব কষ্ট মাথায় পেতে নিয়েছে। সাধকের সাধনের অন্যথা এর ব্যতিক্রম নয়। সবার সাথে জন্মতে নামায পড়ছে। কিন্তু তার মন কি কারো সাথে আছে? দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দিয়ে নিজেই এক হাতের অঙ্গুল নিয়ে অনেক হাতে কন্যা পানিয়ে বেঁচেছে হাজুল আসবীনের সবীপে। এতকম খাওয়া-পরা, কথা বলা, মানুষের সাথে মেলামেশা আছে, এমনকি সংসারের কাজ কিন্তু আল্লাহর সন্ধানী হওয়ার পর এসব সব বন্ধ, সম্পূর্ণ হারাম।

সাধনার প্রথম স্তরের পর শুরু হয় সাধক বিপ্লাহ (আল্লাহর মাঝে পরিভ্রমন)। অর্থাৎ আল্লাহর অসীম কুদরতের ভুবনে পরিভ্রমন। এই স্তরটি জন্য বিপ্লাহর। এখানে আসে আল্লাহ ছাড়া আর কিছুই থাকে না সাধকের সামনে। এখানে তার পাওয়ের স্বরবৈশিষ্ট্য বসতে যায়। আল্লাহর সুন্দর চরিত্রের ঝোকানে তার আত্মার স্বরূপের স্বর্গীয় সৌন্দর্য ফুটে উঠে। জন্য বিপ্লাহর পরের স্তরটি হাকা বিপ্লাহর। অর্থাৎ সাধক এই স্তরে নিজেকে হারিয়ে ফেলেন না। বরং আল্লাহর শক্তিতে বলিয়ান হন। আল্লাহর চরিত্রের মুখময় আলোকিত হন। এই স্তরেই তার নতুন পরিচয় ঘলিশাল্লুল্লাহ। পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি। আল্লাহ পাক প্রথম যখন ফেরেশতাদের সমবেশ ডেকে ঘোষণা করেন, আমি পৃথিবীতে মানুষকে আমার প্রতিনিধি করে পাঠাতে চাই। তখন না বুঝে ফেরেশতারা আপত্তি জানিয়েছিল, আসলেই তোমার ইবাদত বন্দেগীর জন্য যথেষ্ট। পৃথিবীতে নতুন করে অরাজকতা সৃষ্টির জন্য কেন মানুষ সৃষ্টি করবে? সৃষ্টিকর্তিকরা বলেন, সৃষ্টিজগতে বিভিন্ন ভালোবাসার জীবন দর্শন বুঝতে অক্ষমতাই ছিল ফেরেশতাদের আপত্তির মূল কারণ।

মানুষ মাত্রই কোনো না কোনো মেলা ও প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু যারা জ্ঞান চর্চা করে তাদের মাঝেই সেই সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ হয়। ব্যক্তীদের প্রতিভা ও মেধা অক্ষেত্রে হয়ে অন্যত্র অনেকগুণ এক পর্যায়ে অপমুত্যুর শিকার হয়। আল্লাহর ঘোষণাকের প্রতিভাও জন্মসূত্রে সব আদম সন্তানের মধ্যে সুপ্তভাবে পঞ্জিত। কিন্তু সাধনার পথে এই স্তর অতিক্রম করার পরই সেই প্রতিভার বিকাশ ঘটে ও আল্লাহর দুনিয়ায় মানুষকে ফেরাতের দায়িত্ব তারা পালন করেন। এই স্তরকে বলা হয় সাফর 'মিনাল্লাহ ইলাল্লাহ' অর্থাৎ 'আল্লাহ থেকে মানুষের দিকে পরিভ্রমন।' এই পরিভ্রমণে মানুষকে আল্লাহ ও রাসূলের পথে আহ্বানের বিভিন্ন উপায় উপকরণ তার কাছে লাগল। বস্তুত সাধনার পথে ফানাফিল্লাহর পরের স্তরে সাধকের মধ্যে খলিফা হওয়ার ঘোগ্যতার বিকাশ হয়।

চুনতির পীর হজরত (র.) ৩১ বছরের দীর্ঘ পরিভ্রমণে কোন তুফান বিয়ছ করেছিলেন তার একটা প্রমাণ একটি উর্দু কবিতার প্রথম দুপংক্তি। উপরোক্ত অবস্থায় যখন তাকালে যখন ঘুরতেন তখন এই পংক্তিটি ছিল তার জপমন্ত্র। তখন এর মর্মকথা কেউ বুঝতে না পারলেও ১৯৭২ সাল থেকে মাঝেমিলে পীরসুলতী প্রবর্তন করার পর অনেকে তার মর্মার্থ বুঝতে সক্ষম হয়েছেন। পরে সবার কেবলার নিয়ে জপতার সেই কবিতা পাকি ছিল।

هم مزار محمد پر هر حاجاتے
زندگی میں بھی کام کر جاتے

'হাম মাযারে মুহাম্মদ পে মর জাঁয়েঙ্গে
ফিরভী মে এহী কাম কর জাঁয়েঙ্গে'

আমি মুহাম্মদ (সা) এর মাযারে 'পাত মরে যাব
জীবন তরে এই একটী কাজ আমি করে যাব।

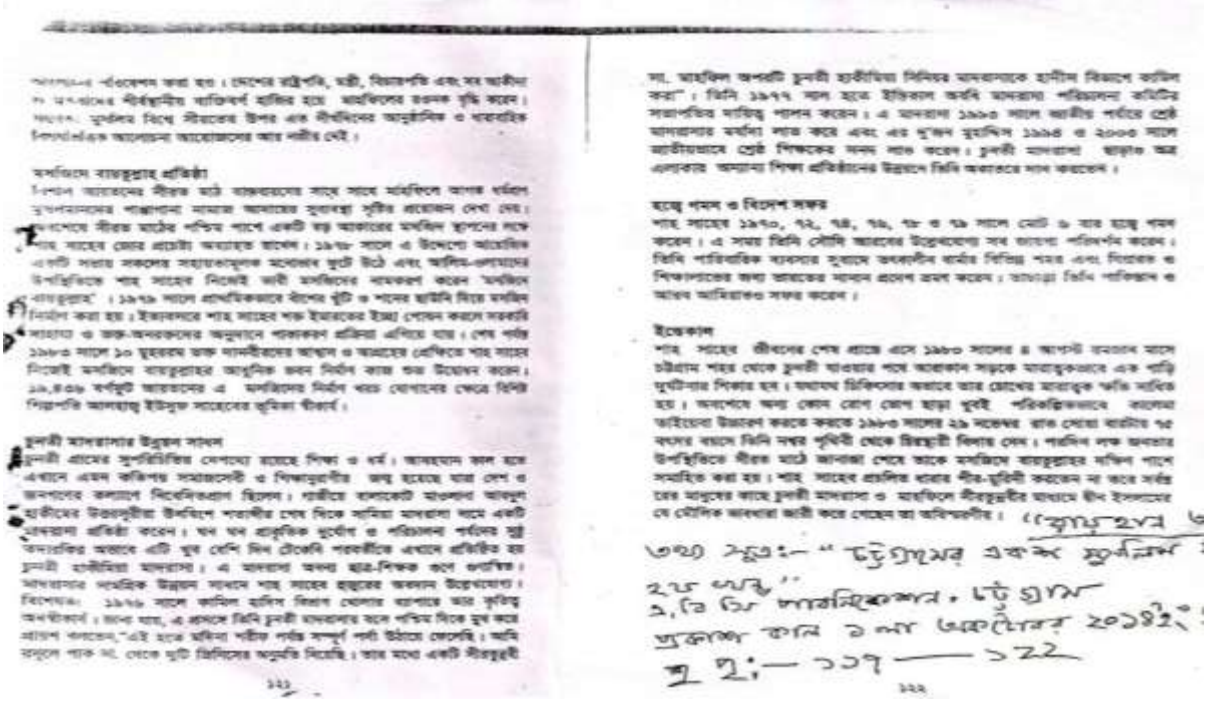
অর্থাৎ তিনি প্রেমের যে তুফানে উন্মাতান হিলেন তা ছিল আল্লাহর রাসূলের প্রেমের তুফান। সেই তুফানের ঐশ্বর্য নিয়ে মানুষকে আল্লাহ মুখো করার আকর্ষণে মাতোয়ারা হওয়ার জন্য। হাদীস শরীফে বর্ণিত-

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من ولده ووالده والناس أجمعين

হযরত নবী করিম (সা) ইরশাদ করেছেন। তোমাদের ঐ ততক্ষণ মুমিন হবে না যতক্ষণ আমি (রাসূল) তার কাছে তার নিজের জীবন, সন্তান-সন্ততি, পিতামাতা ও দুনিয়ার সকল মানুষের চাইতে অধিক প্রিয় না হব। (বুখারী : ১৫; মুসলিম : ৪৪) মুহাদ্দিসগণ সাধারণ মানুষকে ঈমানের জন্য 'মুমিন হবে না' কথাটির ব্যাখ্যা করেছেন 'পূর্ণাঙ্গ মুমিন হবে না' অর্থে।

রাসূল পাকের এই ভালোবাসা গুরুত্ব মুসলমানের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের জন্য এমন অপরিহার্য যে, বাক্যালাপে ও সাহিত্যে ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রোপাগান এমন তাগদারা হয়ে হয়েছে, যেখানে সন্তান ও ঈমানকে বিপদ মনে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। মূলত ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে বাস্তব করার জন্যই এমন মতবাদের শিল্পর গড়ানো হচ্ছে। এরা নিজেদের অপরূপ ঘরে পরীক্ষকে যে কোনো বিধানকে দেশের নামে আখ্যায়িত করার ঈমান দেখাচ্ছে। রাসূল পাকের তারিফ, বাপালে বা ভালোবাসার কথা বলা হলে তারা তাৎক্ষণিক পরিপন্থি বলে উড়িয়ে দেয়। এখেকে বাহ্যত ইসলামী দেশগুলো ও সুন্নাহর কঠোর অনুসারী মনে হবে কিন্তু নিজের মতবাদের বিরুদ্ধে হলে মানুষ হত্যার মতো পাপের তাদের বুক কাঁপে না। এই মতবাদের উপাদি হয়েছিল নজরুল আই থেকে। তবে এর শিকড় প্রোথিত ইসলামের প্রথম যুগের খারেজী আন্দোলনে। অতি মাত্রিক খারেজীদের যুক্তি যারই শক্ত থেকে তাদের আন্দোলন ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য কত ভয়াবহ ছিল, তা ইতিহাসের ছাত্রদের অজানা নয়। ইমামি মক্কা ও মদীনা শরীফের মুখ্যা থেকেও এই মতবাদের বিরুদ্ধে জোরালো ওকালা তথা হচ্ছে। কিন্তু পরিষ্টিতি শিক্ষাগের বইয়ে রাজনৈতিক মতবাদের রূপ নিয়েছে। আমাদের দেশের ৬৩টি জেলার একমোরে ঘোষা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার যে মহড়া দেখানো হয়েছিল তার উপসংহ আছে সেই ঈদ মতবাদ।

ইসলামের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই শিল্পাগত বাড়াবাড়ি থেকে বাঁচার পথ, আল্লাহর রাসূলের মহব্বতের মাঝামাঝি সবচাইতে সহীহে পাইল করা। উপমহাদেশে ওলী দরবেশ ও ইসলাম মৃত্যুবিশ্বাস আল্লাহর পথে জিহাদ করেছেন, সম্পন্ন সংগঠিত করেছেন। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই তাদের তপসরতা আল্লাহ ও রাসূলের মহব্বতে এবং সেই সূত্রে মানুষের ভালোবাসার মাঝামাঝির বাইরে যায় নি।



Dhaka University Institutional Repository

মাহফিলে সীরতুন্নবী (স.) সম্পর্কে অভিমত

জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান

শিক্ষা উপদেষ্টা

মাহফিলে সীরতুন্নবী (স.) হযরত শাহ সাহেব (রহ.) সম্পর্কে জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান স্মৃতিচারণ করেছিলেন। তাঁর একটি স্মৃতিকথায় তিনি লিখেছেন-

চট্টগ্রাম শহরে যে সমস্ত এলাকা রয়েছে সেসব জায়গায় আমি গিয়েছি, শহরের বাইরে গ্রামাঞ্চলেও গিয়েছি। এই রকম একটি জায়গা ছিল চুনতী। চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার যাওয়ার পথে প্রায় মাঝামাঝি বাঁ-দিকে পাহাড়ী এলাকা সেটাই চুনতী। এককালে প্রচুর গাছপালা ছিল। এখনও আছে। তবে বাড়িঘর তৈরির ফলে অনেক জায়গা-জঙ্গল পরিষ্কার হয়েছে। চট্টগ্রামবাসীদের কাছে চুনতী এলাকার কথা খুব শুনতাম। চুনতীর শাহ সাহেব নামে আল্লাহর প্রতি নিবেদিতপ্রাণ একজন সাধু এখানে বাস করতেন। তিনি অল্পবয়সে রেঙ্গুন ছিলেন। রেঙ্গুনেই পড়াশুনা করেন এবং ধর্মীয়শিক্ষায় দক্ষতা লাভ করেন। যুবক বয়সে কলকাতায় পড়াশুনা করেন এবং ধর্ম শিক্ষার বিভিন্ন শাখায় গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি সুফিতত্ত্বে দীক্ষিত হন এবং তারই এক পর্যায়ে সংসার ছেড়ে জঙ্গলে গিয়ে বসবাস আরম্ভ করেন।

দীর্ঘ ৩ দশকের অধিককাল তিনি লোকালয়ের বাইরে ছিলেন। কখনও কখনও লোকালয়ে তাঁকে দেখা গেলেও বেশিক্ষণ তিনি লোকালয়ে থাকতেন না। অনেকে তাঁকে পাগল ভাবতো। কিন্তু ক্রমশ লোকেরা তাঁর নানাবিধ অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় পায় এবং অবশেষে চুনতীতে বসবাসের ব্যবস্থা করে দেয়। তিনি গৃহবাসী হন। আমি তাঁর সাথে পরিচিত হই এবং তাঁর সঙ্গে আমার একটি হৃদ্যতা গড়ে ওঠে।

তিনি কাউকে মুরিদ করতেন না। তিনি বেশী কথা বলতেন না এবং যখন বলতেন তখন খুব দ্রুত বলতেন। আমি তাঁর কাছে বসে শান্তি পেতাম। তিনি গৃহবাসী হলেও মূলত সংসারত্যাগী ছিলেন। সকল শ্রেণীর লোক তাঁর কাছে আসতো এবং তাঁকে ঘিরে বসে থাকতো দীর্ঘ সময় ধরে। তিনি হয়তো কিছু

◆ হযরত শাহ সাহেব (রহ.) চুনতী

বলতেন অথবা বলতেন না। কিন্তু লোকেরা তাঁকে দর্শন মাত্র স্বস্তি পেত এবং উৎসাহিত হত।

আমি এর কথা বলছি এ কারণে যে, চট্টগ্রাম থেকে আরম্ভ করে জীবনের বিভিন্ন কর্মে আমার যে পদক্ষেপ সে সকল পদক্ষেপের সময় আমি তাঁর আশ্বাস এবং আশীর্বাদ পেয়েছি। তিনি ওরশ করতেন না। কিন্তু বছরের রবিউল আউয়াল মাসে পক্ষকাল ধরে সীরত মাহফিল করতেন। এই সীরত মাহফিলে লক্ষাধিক লোক হত। মাহফিলের শেষদিন ফজরের নামাযের আগে থেকে মোনাজাত আরম্ভ হত। সুদীর্ঘ দুই ঘন্টাব্যাপী মোনাজাতের পর ফজরের নামায পড়া হত এবং তারপর মাহফিল ভাঙ্গতো। এই মোনাজাতে আমি একবার অংশগ্রহণ করেছিলাম। যে ভদ্রলোক মোনাজাত পরিচালনা করেছিলেন তিনি দীর্ঘ সময় ধরে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় আল্লাহর গুণকীর্তন করেন, রাসূলের প্রশংসা করেন এবং মানুষের সকল পাপের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেন। প্রার্থনার এই ক্ষমা ভিক্ষার পর্যায়ে মোনাজাতে অংশগ্রহণকারী অগণিত জনগণ ক্রন্দনে আপ্লুত হত। আমি এই মোনাজাতে অংশগ্রহণ করে অভিভূত হয়েছিলাম।

আমার মনে হয় মানুষের জীবনে এই প্রার্থনার অসম্ভব গুরুত্ব আছে। চিত্তশুদ্ধির জন্য প্রার্থনাতুল্য আর কিছুই নেই। উত্থালগ্নের এই প্রার্থনা চিত্তকে পরিচ্ছন্ন করে এবং মানুষ তখন সত্যই সকল পাপমুক্ত হয়ে আল্লাহর কাছে নিবেদন করতে সক্ষম হয়। চুনতীতে এই সীরত মাহফিলের আখেরি মোনাজাতের কথা আমি কখনই ভুলব না। বহুদিন পর্যন্ত এর প্রভাব আমার মনের মধ্যে ছিল। চট্টগ্রাম ছেড়ে চলে আসার পরও চুনতীর সঙ্গে যোগসূত্র আমার ছিল এবং চুনতীর শাহ সাহেব আমাকে তাঁর ওখানে যাবার জন্য প্রায়ই আমন্ত্রণ জানাতেন। আমি সব আমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারিনি কিন্তু আরও দুএকবার চুনতীতে গিয়েছি। চুনতীর শাহ সাহেবকে আমি আল্লাহর প্রতি একজন নিবেদিত পুরুষ হিসেবে পেয়েছি।

(পালাবদল ম্যাগাজিন থেকে সংগৃহীত)

Dhaka University Institutional Repository

পবিত্র মাহফিলে সীরতুন্নবী (সঃ)-এর পটভূমি ও উদ্দেশ্য

আল্লামা মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ (রহ.)
নায়েমে আ'লা, চুনতী হাকিমিয়া আলীয়া মাদ্‌রাসা

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন :

لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة

অর্থাৎ মহানবী হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবন কথা, তাঁর প্রতিটি আদেশ নিষেধ, উঠাবসা, চলাফেরা, ব্যক্তিগত অভ্যাস- তথা পছন্দ-অপছন্দ আচার- আচরণের প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় পর্যন্ত উম্মতের হেদায়তের প্রধানতম উৎস।

হযরত আয়েশা ছিদ্দিকার ভাষায় মহানবীর জীবন চরিত ছিল পবিত্র কুরআনের বাস্তব রূপায়ণ। কেননা আল- কুরআনের প্রতিটি পর্যায়ই বাস্তব ও জীবন্তরূপে উদ্ভাসিত হয়েছিল মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দৈনন্দিন জীবনে। কুরআনের অনুশাসনকে যদি কেউ জীবনে বাস্তবায়িত করতে চায় তবে তার পক্ষে মহানবীর (স.) জীবনালেখ্য সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান লাভ করা ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ খোলা নেই। মহানবী (স.) এর পূত পবিত্র জীবনের কোন দিক বা আলেখ্যই এখন মানবচক্ষুর অন্তরালে নেই। প্রত্যেকটি মুহূর্তই সকলের সামনে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট। দীর্ঘ তেরশ বছর ধরে মহানবী (স.) এর আদর্শ জীবনের উপর চলছে বিস্তর গবেষণা এবং ব্যাপক আলোচনা। যুগে যুগে মানব সমাজে কোনো নৈতিক অধঃপতন ও ধর্মীয় বিপর্যয় দেখা দিলে তখন উহা দূরীকরণের নিমিত্ত নবীজীবনের ঐ দিকটা বিশেষভাবে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরে তাদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দেয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। বিশেষ করে যখন কোন সময় দেশময় ধর্মীয় বিপর্যয় দেখা দেয়, অত্যাচার অনাচার মাথা চড়া দিয়ে উঠে, জনসাধারণ ধর্মীয় অনুশাসনকে ভুলে গিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও কলহে লিপ্ত হয়ে, একে অন্যের ইজ্জত-আবরু লুণ্ঠনের জন্যে হন্যে হয়ে উঠে, মানুষ মনুষ্যত্বের স্তর থেকে নেমে আসে পশুত্বের স্তরে; তখন মহানবীর (স.) এর আদর্শ শিক্ষার বিশদ আলোচনার প্রয়োজন দেখা দেয় যেন জনসাধারণকে ইহা সঠিক পথের দিক নির্দেশ করতে সক্ষম হয়।

এমনিতর একটি অবস্থা বিরাজ করেছিল আমাদের এই বাংলাদেশে- স্বাধীনতার পূর্বাপর সময়ে। মুসলমান মুসলমানের প্রতি ছিল খড়্গহস্ত- ইসলাম হয়েছিল দেশের অধিকাংশ জনতার কাছে একটি অত্যন্ত অপ্রিয় বস্তু। সত্য ও ন্যায়ের

কথাটি ছিল তাদের কাছে অত্যন্ত তিক্ত। ইসলামের কোন কথা বলার সাহসটুকু যেন কারো ছিল না। প্রাক- ইসলামী যুগের তথা আইয়ামে জাহেলিয়াতের নমুনা যেন এখানে বাস্তবরূপে দেখা দিয়েছিল। এ জাতি যে আবার কখনও ধর্মীয় অনুভূতি ফিরে পাবে তা ছিল অকল্পনীয় বস্তু। জাতীয় ঐক্যের প্রবক্তারা যারা ধর্মীয় দিকে দেশবাসীকে আহবান করেছিল মাত্র এটুকু অপরাধে অনেকের জীবন দিতে হয়েছে আর অনেককে হতে হয়েছে দেশত্যাগী। এহেন জাতীয় বিপর্যয়ের মুহূর্তে এ অধঃপতিত জাতিকে ধর্মীয় ও নৈতিক অবনতির অতল গহবর থেকে মনুষ্যত্বের স্তরে উন্নীত করার দুরসাহসিক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন যিনি তিনি হলেন হযরত আলহাজ্ব শাহ মাওলানা হাফেজ আহমদ (চুনতীর শাহ সাহেব কেবলা) তিনিই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করলেন ও সুতীক্ষ্ণ আধ্যাত্মিক চক্ষু দিয়ে দেখতে পেলেন এ জাতির পরিত্রাণের ব্যবস্থা একমাত্র সীরত আন্দোলনের মাধ্যমেই করা যেতে পারে। বিশ্বমানবতার ত্রাণকর্তা রাহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আদর্শ জীবনের সঠিক চিত্রটুকু জনতার সম্মুখে তুলে ধরাই এর একমাত্র পন্থা।

তাই হযরত শাহ সাহেব (রহ.) ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে মহানবী (স.) এর জীবনের বিশেষ বিশেষ দিনসমূহের উপর আলোচনার উদ্দেশ্যে ২৪ ঘন্টার একটা দীর্ঘ প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করলেন। পরবর্তী বছর নবীজীবনের গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ সুচিন্তিত ভাবে বিন্যস্ত করতঃ তিনদিন ব্যাপী এক সীরত মাহফিলের ব্যবস্থা করলেন। যা পরবর্তী বছরসমূহে পাঁচ দিন সাত দিন, দশ দিন এমন কি এবার তা বার দিনের এক দীর্ঘ কোর্সে উন্নীত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, এ সীরত মাহফিল কোন নিছক অনুষ্ঠান নয়- ইহা একটি বাস্তব প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (Training Course)। এ সীরত মাহফিলের আয়োজনের পেছনে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর প্রধান উদ্দেশ্যও এই, জনসাধারণ যেন কয়েকদিন একনাগাড়ে পার্থিব কায়- কারবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এ মাহফিলে দেহ- মন নিয়ে উপস্থিত হয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে ইসলামের পবিত্র আদর্শ ও শিক্ষা সম্পর্কে একটা বাস্তব ধারণা নিয়ে যেতে পারে। যার উপর ভিত্তি করতঃ তার পরবর্তী জীবনটুকু যেন সেই আদর্শে ঢালাই করার জন্য সচেষ্ট হয়। এ সীরত মাহফিলে নবীজীবনের প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর সুবিন্যস্তভাবে সারগর্ভ আলোচনা করা হয়।

এ মাহফিলের একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এই, আন্যান্য মাহফিলের মত ইহা শুধু আলোচনা সভায় সীমাবদ্ধ নয়- বরং এখানে অংশগ্রহণকারী সমস্ত শ্রোতাদের জন্য বিশেষ এন্তেজামের সাথে ব্যবস্থা হয় দু'বেলা খাবারও। কারো নিকট থেকে নেয়া হয় না কোন বাধ্যতামূলক চাঁদা বা কখনও জিজ্ঞাসাও করা হয়

না কোন চাঁদা ইত্যাদি আদায় করেছেন কিনা। এমনকি মাহফিল কর্মীদের কেউ নামাজ খেলাপ করেছে বা শরিয়ত বিরোধী কোন কার্য করেছে বলে জানা গেলে তাকে বহিস্কার করা হয় সাধারণ কর্ম তালিকা থেকেও । আশ্চর্যের বিষয় হলো- এই প্রতি বছর যে পাঁচ ছয় লাখ টাকা নগদ এ মাহফিল উপলক্ষে ব্যয় হয় তার ব্যবস্থা হবে কিনা এ বিষয়ে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) কে কোনদিনই এতটুকু ভ্রুকুঞ্চিত করতেও দেখা যায়নি। তাঁর মুখে একটি মাত্র কথা- ইহা মহানবীর (স.) পবিত্র মাহফিল আমার তোমার ভাবনা কিসের? বরং কেউ কোনরূপ ব্যয় সংকোচনের প্রস্তাব দিলে তিনি তা সজোরে এ বলে প্রত্যাখান করেছেন যে- ইহা মহানবীর কাজ, এতে আবার কার্পণ্য কেন? সত্যিই এ মাহফিলের এত সুবৃহৎ' কাজের আঞ্জাম ও ফান্ডের ব্যবস্থা কিভাবে যে হয়ে যায় তা আমাদের কল্পনাতীত। এ ফান্ড উসুলকৃত টাকা- পয়সা থেকে একটা পয়সাও অন্য খাতে খরচ করতে তিনি এতো কঠোর বিরোধী যে একে তিনি কবিরা গুনাহ্ বলে মনে করেন। এ ধরণের একটা মাহফিলের আয়োজন একমাত্র ঐ মহান ব্যক্তিত্বের পক্ষেই সম্ভব, যার রয়েছে মহানবী (স.) এর প্রতি অগাধ মুহাব্বত, সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাস ও অসামান্য আধ্যাত্মিক ক্ষমতা। এসব গুণাবলীর মূর্ত প্রতীক হলেন হযরত আলহাজ্ব শাহ মাওলানা হাফেজ আহমদ সাহেব। তাঁর এ মহান সীরাত আন্দোলনের ফলে আজ বাংলাদেশের আনাচে কানাচে দিবারাত্রি সীরত মাহফিলের একটা আলোড়ন পড়ে গেছে। দেশবাসী সত্যিকারভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছে তাদের ভুলভ্রান্তি ও মহানবীর মহান শিক্ষার মূলকথা, আর তাতে করে এ বাঙ্গালি জাতি তার অধঃপতনের অতল গহবর থেকে আবার আলোর পথে পা বাড়াচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।

অল্লাহ তাঁর এ সীরত আন্দোলনের মাধ্যমে দেশ, ধর্ম ও জাতির সর্ববিধ কল্যাণ সাধন করুন। আমিন।

(১৯৭৭ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত সীরত স্মরণিকা থেকে সংগৃহীত)

Dhaka University Institutional Repository

হযরত শাহ সাহেব (রঃ) প্রবর্তিত সিরাতুন্নবী (সাঃ) মাহফিলের অনুষ্ঠান সূচির ভূমিকা



১৯ দিন ব্যাপী ৫৩ তম আন্তর্জাতিক

মাহফিলে

সীরতুন্নবী

স্থান:
সীরত ময়দান, শাহ্ মঞ্জিল
চুনতী, লোহাগাড়া
চট্টগ্রাম

'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন, ওয়াসসালাতু ওয়াস্সালামু আলা সাইয়্যেদিল মুরসালীন, ওয়া আলা আলিহী ওয়াআসহাবিহী ওয়া আউলিয়াহি উম্মতিহী আজমা'ইন'

পেশ কালাম

হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে হযরত ঈসা (আ.) পর্যন্ত আম্বিয়া (আ.) এর শুভাগমন দুনিয়ার ইসলাম নামের যে প্রাসাদ গড়ে উঠেছিল তার পূর্ণতা সাধন করেন সাইয়েদুল মুরসালীন খাতেমুন নবীয়ীন বরকতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ (সা.)। আল-কুরআনে হযরত মহানবী (সা.) এর উপর নিলসিলায়ে নবুওয়াতের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করা হয়েছে। নবুওয়াতের ধারা ভারপরে কিয়ামত পর্যন্ত চিরতরে রুদ্ধ। নবী ও রসূলগনের আগমন শেষ, কিন্তু তাঁদের দাওয়াতি মিশন কেয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। তবে কলুষ-কালিমা, পাপ-পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত সমাজ জীবনের সন্ধের সাধনে বিভিন্ন সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে আবির্ভূত হবেন অনেক আউলিয়া, বুজুর্গ, মুজতাহিদ ও মুজাদ্দিদ; যাদের পরশে পরম স্বস্তি লাভ করবে সত্যানুসন্ধানীদের হাহাকার অন্তর।

হিজরি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সারা বিশ্বে ইসলামের চরম অবনতি পরিলক্ষিত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়ে খেলাফতের ধ্বজাধারী তুরস্ক সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে খেলাফতের অবসানে ইসলামের ঐক্যবদ্ধ শক্তির উৎস নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে। অপর দিকে অভদ্র পাশ্চাত্য জড়বাদ, নাস্তিক সমাজতন্ত্রবাদ ক্রম বিকাশমান বিশ্বে মুসলমানদের তৌহিদী চেতনাকে বিপর্যস্ত করে তোলে। এই সুযোগে ইহুদীরা ধ্বংতুল মোকাদ্দাস দখল করে ইসলামকে ধ্বংস করার পাঁয়তারা করতে থাকে। বাংলাদেশের মুসলমানেরাও এই ষড়যন্ত্রে পতিত হয়ে আল্লাহর প্রদত্ত ও হযরত মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ (সা.) প্রদর্শিত মূল সত্য থেকে অনেক দূরে সরে পড়তে থাকে। বাংলার জমিনেও নবীজির সীরতের আলো নিষ্প্রাণ হয়ে যাচ্ছিল। বিভিন্ন মতবাদের বাতাস প্রবাহিত হতে লাগল। ইসলামের এই দুঃসময়ে যুগে যুগে সমাজের সংস্কার সাধনের জন্য আবির্ভূত হলেন আশেকে রসূল (সা.) প্রখ্যাত আলেম, অলিয়ে কামেল, মোজাদ্দেদে মিল্লাত, বাঙ্গীয় মাহফিলে সীরতুন্নবী (সা.) হযরত আলহাজ্ব শাহ্ মাওলানা হাফেজ আহমদ (রাহ. আ.) প্রকাশ শাহ্ সাহেব কেবলা চুনতী।

তিনি সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেছিলেন আল্লাহ প্রদত্ত ও রসূল (সা.) প্রদর্শিত মূল সত্য থেকে বিচ্যুতিই মুসলমান সমাজের দুরাবস্থা ও অধঃপতনের একমাত্র কারণ। তাই তিনি সীরতুন্নবী (সা.) তথা আল-কুরআনের শিক্ষা ও মহানবী (সা.) এর জীবনাদর্শ ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে সর্বপ্রথম ১৯৭২ ইংরেজি মোতাবেক ১৩৯২ হিজরি ১২ রবিউল আউয়াল অশ্রুতপূর্ব সীরতুন্নবী (সা.) নামে ১৯ দিন ব্যাপী এক ঐতিহাসিক মাহফিলের গোড়াপত্তন করেন।

হযরত শাহ্ সাহেব কেবলা (রাহ. আ.) এর প্রবর্তিত ১৯ দিন ব্যাপী এই মাহফিলে নিশোয়ারা তৌহিদি জনতা এক প্লাটফর্মে জড়ো হয়ে বিদাতিধারা খোদাদ্রোহী মতবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার সুযোগ পায়।

আসুন আমরা আল্লাহর কিতাব ও নবীজী (সা.) এর সুন্নাহ্ এর যথাযথিক আলোচনা সমূহ শ্রবণ করে ইসলামের সুষ্ঠু ধারণা অর্জন করে আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রসূলের (সা.) সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে দোজাহানের কল্যাণ ও সাফল্য লাভ করি। আল্লাহ আমাদের সহায় হউন।

"হযরত শাহ্ সাহেব কেবলাকে যেমন দেখেছি"

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ১৯ দিন ব্যাপী ঐতিহাসিক মাহফিলে সীরতুন্নবী (সা.) এর প্রতিষ্ঠাতা, প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন আলহাজ্ব শাহ্ মাওলানা হাফেজ আহমদ (রাহ. আ.) দক্ষিণ চট্টগ্রামে ইতিহাস প্রসিদ্ধ বুজুর্গদের দ্বীনের আবাদ ভূমি চুনতী গ্রামে ১৯০৭ ইংরেজি এক মুসলিম সম্ভ্রান্ত জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আলহাজ্ব সৈয়দ আহমদ (রাহ.)। মাতা হাজেরা খাতুন তিনি ৭ বছর বয়সে তাঁকে ছেড়ে পরলোকে চলে যান। তিনি পিতামহ আলহাজ্ব মুফতি মাওলানা কাজী ইউসুফ (রা.) এর পারিবারিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, প্রসিদ্ধ দারুল উলুম আলিয়া মাদ্‌রাসা এবং উপমহাদেশের বিখ্যাত কলিকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসায় শিক্ষা গ্রহণ করেন।

তিনি প্রায় বলতেন আল্লাহ পাকের নিকট তাঁর দুটি আরজ ছিল। তার মধ্যে একটি ছিল জ্ঞান, অপরটি প্রকাশ করতেন না। তিনি ইলম, আমল, ইমান ও এবাদতের জন্য সব সময় আল্লাহ পাকের নিকট শুকরিয়া আদায় করতেন।

শিক্ষা জীবনের পর একবার আকিয়াবে তাঁদের জমিদারি দেখার জন্য গিয়েছিলেন। সেখান থেকে বার্মার বর্তমান মায়ানমারের রাজ্য শহরে বেড়াতে যান। ওখানকার জনগণ তাঁর এলেম ও আমলে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খতিবের দায়িত্ব অর্পণ করেন।

কর্মজীবনে শরীয়তের ইলম, নামাজ, রোজা ইত্যাদির সঙ্গে বাতেনী ইবাদতও আবশ্যক মনে করে কাজ করতে করতে এক সময়ে সত্যের সন্ধানে লোকালয় ত্যাগ করে ৩৭ বৎসর আল্লাহর বিকির ও রসূল (সা.) এর প্রশংসা করে ঘুরে বেড়াতেন, পাহাড়ে-অরণ্যে, গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে এবং গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। তখন তিনি সর্বদা নিম্নলিখিত পংক্তিগুলো বারবার পড়ে চলতেন.....

হাম মাজারে মুহাম্মদ (সা.) পে মর জায়েঙ্গে,
জিন্দেগি মে ছাহি কাম কর জায়েঙ্গে।

(অর্থঃ হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর উদ্দেশ্যে আমার জীবন উৎসর্গিত, সারা জীবন তাঁর ধ্যানেই আমি থাকব নিয়োজিত)। আল্লাহ পাকের অশেষ মেহেরবাণীতে অবশেষে তিনি মোহাম্মদের মশাল হাতে ফিরে আসেন লোকালয়ে। তিনি অসাধারণ স্মরণশক্তির অধিকারী ছিলেন।

ছাত্র জীবনে পঞ্চাশ/ষাট বৎসর পূর্বে পঠিত আরবি, ফার্সি, উর্দু কবিতা এমন কি তাফসির, হাদিস ও ফিকাহ্ সহ বিভিন্ন বিষয়ে মুখস্থ বলতে পারতেন। দেশ বিদেশের প্রখ্যাত আলেমগণ যখনই তাঁর দরবারে আসতেন উনার কোরআন হাদিসের আলোচনা শুনে তাঁরা মুগ্ধ হয়ে একমনিতে তাঁর পানে চেয়ে থাকতেন।

তিনি ছিলেন সকল ভয় ভীতির উর্দ্ধে। উনার গোটা জীবনটাই ছিল একমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন এবং রসূলে পাক (সা.) এর প্রতি অগাধ ভালবাসা ও মোহাব্বতের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত।

রবিউল আউয়াল মাস সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম মহামানব হযরত মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ (সা.) দুনিয়ার বুকে আবির্ভাবের পবিত্র মাস। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে বিশ্ব জগতের রহমতরুপে, বিশ্বমানবতার আদর্শরূপে, ইহকালীন জীবনের শান্তি ও পরকালীন জীবনের মুক্তি ও নাজাতের পয়গাম দিয়ে পাঠিয়েছেন। তিনি স্রষ্টার সঠিক পরিচয় মানুষের কাছে তুলে ধরেছেন। আমাদের পেয়ারা রসূল (সা.) জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের সকল ব্যাপারে প্রতিটি ক্ষেত্রে রেখে গেছেন সুস্পষ্ট নির্দেশ, সর্বোত্তম আদর্শ। আধুনিক সভ্যতা সর্বপেক্ষা তাঁর কাছে ঋণী। দুনিয়া যত সামনে এগিয়ে যাবে তাঁর প্রভাব, তাঁর অবদান তত বেশি অনুভূত হবে, তিনি সমগ্র পৃথিবীর মানুষের শান্তি, কল্যাণ ও অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য প্রমাণিত হবেন। বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হবে সালতানাতে মোস্তফা (সা.)। এই অনিবার্য পরিণতির আলামত উপলব্ধি করে বস্তুবাদী ও পুঁজিবাদী পাশ্চাত্য দুনিয়া আজ দিশেহারা। তারা মেতে উঠেছে রসূলুল্লাহ (সা.) এর আর্দশের বিরুদ্ধে। হযরত শাহ্ সাহেব কেবলা (রাহ. আ.) এর ভাষ্য অনুযায়ী তিনি রসূলুল্লাহ (সা.) এর এযাজত প্রাপ্তির পর আপামর জনসাধারণের জন্য মাহফিলে সীরতুন্নবী (সা.) ও চুনতী হাকিমিয়া মাদ্রাসাকে কামিল পর্যায়ে (টাইটেল স্তরে) উন্নীত করে হাদিসের উচ্চ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। মাহফিলে সীরতুন্নবী (সা.) এর শুরু থেকে হযরত শাহ্ সাহেব কেবলা (রাহ. আ.) এর সাথে তিনি অনুষ্ঠান সূচি সাজানো, বিষয় নির্ধারণ, মাহফিলের নামকরণসহ গুরুত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন চুনতী হাকিমিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসার তৎকালীন নাজেমে আলা, উপমহাদেশের স্বনামধন্য আলেমেদ্বীন উচ্চমানের পবিত্র হযরত আল্লামা ফজলুল্লাহ (রাহ. আ.)। হযরত শাহ্ সাহেব কেবলা (রাহ. আ.) এর অভিপ্রায়ে থাকে চুনতী মাদ্‌রাসার পূর্ব পার্শ্বে চুনতীর সামাজিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

হযরত শাহ্ সাহেব কেবলা (রাহ. আ.) কর্তৃক প্রবর্তিত সীরত মাহফিল বিশ্বব্যাপী সুন্নতের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাগরণ মূখর একটি সুমহান ঐতিহ্যের পদক্ষেপ। ১৯ দিন ব্যাপী স্থায়ী মাহফিলের অনুষ্ঠান সূচির আলোচ্য বিষয়বস্তুর পর্যালোচনা করলে এ সত্য পরিস্কার হয়ে উঠবে। 'সীরত' আরবি শব্দ, এর অর্থ চরিত্র, জীবন ব্যবস্থা, জীবনের অবলম্বন, জীবন ব্যাপী ঘটনাবলী ইত্যাদি।

বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত রাহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ (সা.) এর জন্মলগ্নের কিছু সংক্ষিপ্ত ঘটনাবলীর উপর আলোচনাই ছিল এককালে ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) তথা ইয়াউন্নবী (সা.) বা নবী দিবসের আলোচ্য বিষয়। বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ (সা.) তেষট্টি বৎসর, বিশেষত নবুওয়াতের তেইশ বছর এই পৃথিবীকে সত্য ও আলোর সন্ধান দিয়ে আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেলেন, রেখে গেলেন মানব সমাজের জন্য অমূল্য দুইটি সম্পদ 'আল্লাহর কিতাব' ও 'তাঁর সুন্নাহ্'। আমাদের জন্য রাখা এই অফুরন্ত ভাণ্ডার যুগ যুগ ধরে আলোচনা ও পর্যালোচনার দাবি রাখে। তাই সীরতুন্নবী (সা.) মাহফিলে নবীজীর পবিত্র জীবনের বিভিন্নমুখী আলোচনা মুসলমানদের জন্য তো বটেই, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আপামর জনগোষ্ঠীর জন্য এক অনন্য সাধারণ তাৎপর্য বহন করে; যা মহাপ্রলয়ের দিন পর্যন্ত লিখে ও বলে শেষ করার নয়। আজ সমগ্র বিশ্বে এমনকি মুসলিম শক্তিতে ঈর্ষান্বিত পাশ্চাত্য দেশেও সীরতুন্নবী (সা.) মাহফিল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এ বিষয়টি তৌহিদী জনতার জাগরণের এক শুভ সূচনা। তাই একবিংশ শতাব্দীতে মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ (সা.) এর উম্মতগণের অবশ্য কর্তব্য হবে এই চ্যালেঞ্জের সাথে মোকাবেলা করা। সর্বত্র বিশ্ব নবীর উম্মতের দাবিদার প্রায় ২০০ কোটিরও অধিক মানুষ। এই উম্মতদের অধীনে অর্ধ শতাধিক দেশের কর্তৃত্ব, শুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক, বাণিজ্যিক ও সামরিক স্থানসমূহের অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তারা আজ বিজাতি-বিধর্মীদের হামলার লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত, নির্যাতিত ও নিপীড়িত। তাঁদের ভুল-ত্রুটি উপলব্ধি করার এবং সংশোধন করার প্রয়োজন আজ সর্বাধিক।

প্রখ্যাত আলেমগণের ভাষ্য অনুযায়ী "তিনি ছিলেন সমসাময়িক কালের মধ্যে এক বিশিষ্ট মর্যাদা প্রাপ্ত উঁচু মাপের একজন আল্লাহর অলি"। উনার বিষয়কর কারামত সম্পর্কে এত স্বল্প পরিসরে যথাযথ ভাবে তুলে ধরা সম্ভব নয়। তথাপি কিছু কথা এখানে উল্লেখ না করলেই নয়।

হযরত শাহ্ সাহেব কেবলা (রাহ. আ.) এর সবচেয়ে বড় কারামত হলো উনার প্রতিষ্ঠিত নবী প্রেমের মহান এক নিদর্শন; ১৯ দিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক মাহফিলে সীরতুন্নবী (সা.), যা বিগত ৫৫ বছর ধরে চলমান। দিন দিন এই মাহফিলের রওনক, রওশন যেন বেড়েই চলেছে আলহামদুলিল্লাহ্। এমনকি উনার মৃত্যুর ৪৩ বছর পেরিয়ে গেলেও এই মাহফিলের সার্বিক পরিসর যেন দিন দিন বেড়েই চলেছে। মহান আল্লাহ পাকের অবারিত রহমত এবং হযরত শাহ্ সাহেব কেবলা (রাহ. আ.)-র নবী প্রেমের ফসিলতে এই মাহফিল আজ সারা বিশ্বের বুকে বাংলাদেশের আবহমূর্তি উজ্জ্বল করে চলেছে।

উল্লেখ্য যে, অর্থ সম্পদের ব্যাপারে উনার কোন মোহ ছিল না। ভক্তদের দেয়া অর্থও তিনি গরিব-দুঃখীদেরকে বিতরণ করে দিতেন। মৃত্যুকালে তাঁর নিকট সঞ্চয় বলতে এক কলর্দকও ছিল না। হযরত শাহ্ সাহেব কেবলা (রাহ. আ.) ছিলেন এক জোতির্ময় চেহারার অধিকারী, উনার সংস্পর্শে এসে পরম শান্তি লাভ করতেন সত্যানুসন্ধানীরা। উনার পবিত্র চেহারা দর্শনে সবার হৃদয় জুড়িয়ে যেত।

রবিউল আউয়াল মাসের চাঁদ উঠার পর হতে উনার অন্তর ব্যাকুল হয়ে যেত। মাহফিলে সীরতুন্নবী (সা.) এর আখেরি মোনাজাতের পর বেশ কিছু দিন উনি শোকাহত মনে কান্না জড়িত অবস্থায় থাকতেন। মাহফিল চলাকালে উনি প্রায়ই গ্রামের প্রান্তিক অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, ওয়াজেজীনগণের উপর অর্পিত বিষয়বস্তু কতটুকু আলোচনা হয়েছে, কি ভুলত্রুটি হয়েছে, পরবর্তীতে উনি তা বলে দিতেন। এমন কি মাহফিলের কাজে সার্বক্ষণিক যারা নিয়োজিত থাকতেন তাদের ভুলত্রান্তির উনার দৃষ্টির বাইরে ছিল না। উনার এহেন কারামত দেখে ও শুনে সকলে ভয়ে ভয়ে থাকত। হযরত শাহ্ সাহেব কেবলার ইন্তিকালের পর আজ পর্যন্ত এই ভুল-ত্রুটি অন্তরে পোষণ করে মাহফিলের সর্বস্তরের কর্মীগণ নিজ নিজ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম করে যাচ্ছেন। এটা উনার নবীপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছাড়া আর কিছু নয়। আল্লাহ তাঁর মর্যাদা আরও বুলন্দ করুন। আমিন।

আশেকে রসূল (সা.) মুজাদ্দেদে মিল্লাত দ্বীনের সীরত আলহাজ্ব হযরত শাহ্ মাওলানা হাফেজ আহমদ (রাহ. আ.) তাঁর প্রবর্তিত সীরতুন্নবী (সা.) মাহফিলের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য গড়ে গেছেন ১৩ একর আয়তন বিশিষ্ট এক বিশাল সীরত ময়দান। যার পশ্চিম প্রান্তে উনার অভিপ্রায় অনুযায়ী নির্মিত হয়েছে একটি সুরম্য জামে মসজিদ 'মসজিদে রাব্বুল্লাহ'।

হযরত শাহ্ সাহেব কেবলা (রাহ. আ.) অসংখ্য ভক্ত ও গুণগ্রাহীকে শোক সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে সীরতুন্নবী (সা.) মাহফিল এর ১৯দিন পূর্বে ২৩ সফর ১৪০৪ হিজরি, ২৯ নভেম্বর ১৯৮৩ ইংরেজি, ১১ অগ্রহায়ণ ১৩৯০ বাংলা সোমবার দিবাগত রাত ১২টা ১৫ মিনিটে উনার রবের সান্নিধ্যে চলে যান "ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহে রাজেউন"।

মসজিদে রাব্বুল্লাহর দক্ষিণ পার্শ্বে তিনি চির নিদ্রায় শায়িত থেকে যেন প্রত্যক্ষ করছেন উনার প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান সমূহ। রাব্বুল আলামীন উনাকে জান্নাতের আলা মকাম নসিব করুন এবং উনার এই প্রতিষ্ঠান সমূহকে কেয়ামত পর্যন্ত জারি রাখুন। আমিন।

মাহফিলে সীরতুন্নবী (সা.) এর কর্মীবৃন্দ ও অশেষানে ভক্তবৃন্দ

Dhaka University Institutional Repository

হযরত শাহ সাহেব (রঃ), সিরাতুন্নবী (সাঃ) মাহফিল ও চুনতী মাদ্‌রাসা বিষয়ে বাহরুল উলুম শাহ মাওলানা কুতুব উদ্দীন (রঃ), পীর সাহেব কেবলা, বায়তুশ শরফ এর রচিত কবিতা সমূহ

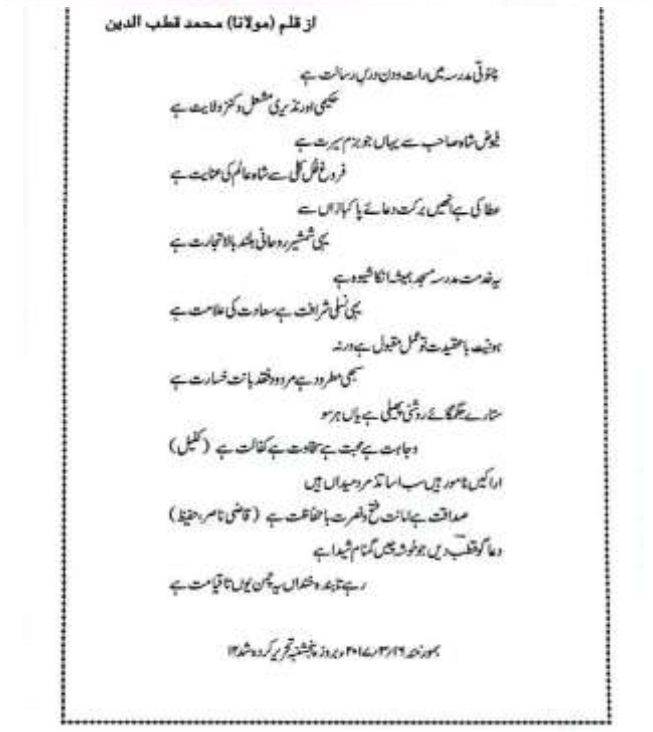


بیت الشرف انجمن اتحاد بنغلادیش

বায়তুশ শরফ আনজুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ

BAITUSH SHARAF ANJUMAN-E-ITTEHAD BANGLADESH





از قلم (مولانا) محمد قطب الدین

چنوتی مدرسہ میں رات دن درس رسالت ہے
یہی اور تدریسی مشغل و محور و لایعت ہے
فیوض شاہ صاحب سے یہاں جو بزم سیرت ہے
فروغ فضل کل سے شاہ عالم کی عنایت ہے
عطا کی ہے انھیں برکت دعائے پاکبازاں سے
یہی شمشیر روحانی بلکہ بالا تجارت ہے
یہ خدمت مدرسہ مسجد ہمیشہ ناگشودہ ہے
یہی نسل شرافت ہے سعادت کی علامت ہے
ہو نیت با عقیدت تو عمل مقبول ہے ورنہ
یہی مطرود ہے مردود خفت بالت خسارت ہے
ستارے جگمگاتے ہیں روشنی پھیلی ہے یاں ہر سو
وجاہت ہے محبت ہے حقانیت ہے کفالت ہے (کفیل)
ادائیں با ہنر ہیں سب اساتذہ مرد میداں ہیں
صداقت ہے امانت ہے فطرت با خلافت ہے (قاضی ناصر حفیظ)
دعا کو قطب دیں ہو خوش یہیں گمنام شیدا ہے
رہے تابندہ و خنداں یہ چمن یوں تا قیامت ہے

بمورخہ ۱۹/۳/۲۰۱۷ء بروز پنجشنبہ تحریر کردہ شد ۱۲

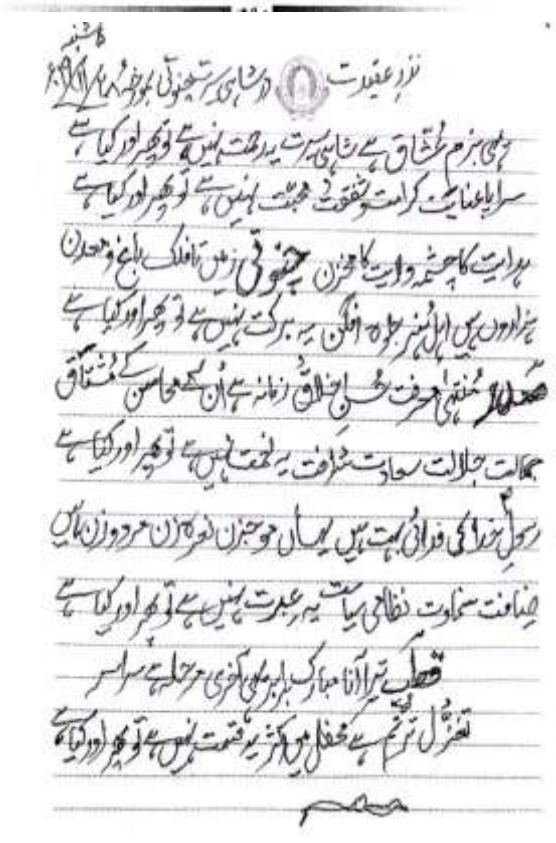
হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর ইছালে সওয়াব মাহফিল

উপলক্ষে হযরত মাওলানা কুতুব উদ্দিন, পীর সাহেব,
বায়তুশ শরফ কর্তৃক রচিত কসিদা

حضرت شاہ چنوتیؒ کی یاد میں

شاہ صاحب ہیں ہمارے اولیاء کے تاجدار — محفل سیرت، چنوتی مدرسہ ہے یادگار
عاشق رب اعلیٰ، خیر الوریٰ وہ تھے بہم — زاہد راشد وہ عابد تھے سدا لیل ونہار
تھی نہ کچھ حرص وہوا فیاض تھا بے مثل وہ — تھی سخاوت داریاں بایاں انکی بس دور وکنار
شاکر اللہ نعمہ اول ہیں توکل میں متین — ہر مصیبت میں شکیبائی حلیم وبردبار
کی عطا حق نے انھیں اعلیٰ فراست مستقر — صاف دل، قلب سلیم، آسودہ خاطر مثل بار
دور اندیش ویدا خوار امت بے ریا — مشعل ایماں جلایا ہے یہ سیرت لالہ زار شاعدار
یہ چنوتی معدن اخیار وکان اولیاً — شاہ صاحبؒ ہیں خلف جو تھے سلف یاں نامدار
گلستان مہر والفت میں جو تھی ام جمالؒ — مہربان وسائبان وپاسبان وراز دار
مہتمم صاحب وادر چل بے وہ یک بیک — صدمۂ فرقت کلیجے کو بنایا داغدار
چل بسے میدان خالی ہوگیا ہے سر بسر — ناظم اعلیٰ امیں اللہؒ جو تھے یارغار
کل سن ہے فان یہ اعلان قرآن میں پڑا — پی لئے جام محبت ہوکے محو کردگار
یہ یقیں کامل عقیدت اولیاً کی آس ہے — جتنے دامنگیر ہیں ہر مشکل آساں بیڑا پار
آستانے دو جہاں انکی قبر معمور ہو — نور احمدؐ سے ابدتک ہو صلہ دار القرار
جب انکی جاں فداتھی سید الابرار ہیں — وہ مدینہ کا چمک انوار منزل ہو مزار
ناظم خستہ پراگندہ طبیعت پر گناہ — قلب دیں ہے خاکپائے عاشقاں اک خاکسار

بمورخہ ۳/۸/۱۹۹۲ء بروز پنجشنبہ بعد نماز فجر بتقریب ایصال ثواب شاہ صاحب قبلہؒ مطابق ۲۳ صفر ۱۴۱۳ھ تحریر کردہ شد ۱۲



نذرِ عقیدت

در شانِ سرکارِ چنوتی بموقعہ سالانہ

ہر بزمِ عشاق ہے ثنائے سیرت پہ رطب اللسان ہے تو پھر اور کیا ہے
سراپا عنایت کرامت و شفقت محبت انسان ہے تو پھر اور کیا ہے
ہدایت کا چشمہ و رایت کا خزن چنوتی زمین تا فلک باغ و گلشن
ہزاروں ہیں اہلِ ہنر جلوہ افگن یہ برکت انہیں ہے تو پھر اور کیا ہے
معلم مخلص حرف حسنِ اخلاق زمانہ ہے ان کے محاسن کے مشتاق
حکایات حالات سعادت شرافت یہ لغت انہیں ہے تو پھر اور کیا ہے
رسولِ خدا کی فراوانی رحمت ہیں یہاں موجزن نورِ رحمان مردوزن ہیں
ضیافت سخاوت نظافی ریاست یہ عبرت انہیں ہے تو پھر اور کیا ہے
قطب تیرا آنا مبارک ہو ہر بار ہی آخری مرحلہ ہے سراسر
تغزل ترنم ہے محفل میں اکثر یہ قسمت انہیں ہے تو پھر اور کیا ہے

Dhaka University Institutional Repository

হযরত শাহ্ সাহেব (রঃ) এর ইন্তেকাল ও কবর বিষয়ে হযরত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী (রঃ), সাবেক প্রধান মুহাদ্দিস, দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম, এর রচিত কসিদা

زمیں روتی زماں روتا فلک آنسو بہاتا ہے
چنوتی کا ستارہ خاک میں مدفون ہوتا ہے
جنازہ کیا سمندر تھا بنی آدم کی موجیں تھیں
کہ منظر دیکھلے کیسے ولی اللہ سے ملتا ہے
یہی ہے روضۂ خاکی شہنشاہ چنوتی کا
یہاں مخفی ہے مخزن لؤلؤ و مرجان و موتی کا
ولی واصل حق موجد سیرت کا مرقد ہے
چمکتا ہے یہ تربت سے ستارہ نیک بختی کا

Dhaka University Institutional Repository

হযরত শাহ সাহেব (রঃ) এর শানে হযরত মাওলানা মুসলিম খান (রঃ), সাবেক, সাংগঠিক সম্পাদক, ১৯ দিন ব্যাপী সিরাতুন্নবী (সাঃ) মাহফিল এর রচিত কসিদা

شاہ حافظ احمدؒ

نقارۂ سیرت کا یہ پھلا منادی — شاہ چنوتی نے دیا حافظ قلندر
جب جبکہ دیا حب نبی کا وہ جلاکر — یہ خطہ چنوتی کا جگایا ہے مقدر
حافظ کے محبت کے مثیل ملنا ہے مشکل — ہرآن میں وہ عشق نبی میں تھے ڈبوکر
گردون حوادث سے کبھی ترساں نہیں تھے — افلاک کے کرشمہ سے وہ راضی برضا تھے
آنکھوں کو جبکہ کھوے اف تک زباں سے نہ بولے — شان خدا کو ڈونڈے دشت وجبل نہ چھوڑے
در پہ خدا کے ایک التجا تھا انکا — یہ خطہ چنوتی کو خدایا! قطعۂ محشر دے
چہرہ جو تھا پر نور لب پہ تبسم — بے گور وکفن بعد نزاع سب نے یہ دیکھا
کسنے کہا ہے تو شاہ چنو تی — اقلیم کے ولایت کو دیا تجھکو خدا نے
مسلم کو کیا علم ہے پہچانے تیرے بھید — حافظؒ کے تعارف سے وہ حد سے بہت دور

مسلم خان

Dhaka University Institutional Repository

হযরত শাহ সাহেব (রঃ) এর শানে নাতনী-জামাই সৈয়দ আমিনুল ইসলাম, (ইসলাম কাওয়াল) রচিত কসিদা

منقبت دوشان شاہ صاحب قبلہؒ

حافظ احمد شاہؒ کا دربار کیا دربار ہے
نور حق نور نبی سے پرتخی سرکار ہے

آپ کی شان سخاوت بے نظیر و بے مثال
ان سے منگتا جو بھی مانگا وہ ہوا سرشار ہے

لو لگایا جس نے ان سے اسکو یہ کہتے سنا
اس جہاں کی شان و شوکت کچھ نہیں درکار ہے

واہ کیا شان ولایت در پہ جتنے آئے ہیں
سبکے لب پر دیکھئے اب ذکر ہے اذکار ہے

شاہ صاحبؒ کا ہے کہنا جھوٹا وھوکا باز جو
اسکا اس دربار میں آنا ہی تو بے کار ہے

آستانہ ان کا ہے میخانہ جام نبی ﷺ
جام وحدت اسکو حاصل ہے کہ جو میخوار ہے

وہ مجدد محفل سیرت کے ہیں زندہ ولی
جان بیجاں ان سے کہہ جو بھی تجھے درکار ہے

سید امین الاسلام
بیجان چاٹگامی

Dhaka University Institutional Repository

হযরত শাহ সাহেব কেবলা (রঃ) এর শানে মাওলানা আবু ছালেহ মুহাম্মদ সলিম উল্লাহ (ম.জি.আ) অধ্যক্ষ, বায়তুশ শরফ আর্দশ কামিল মাদ্‌রাসা,চট্টগ্রাম এর রচিত কসিদা

কসিদা

قصيدة الثناء على فقيد زبدة الصالحين وقدوة الشاكرين وخير العاشقين لرسول رب العالمين الشاه العلامة حافظ احمد رحمه الله ونور الله مرقده وجعل أعلى الجنة مثواه

حمدت الله رب الصالحين ... وأصلي على الفضل العالمين
والأواصحابا واعوانا كراما ... وعلى التابعين ومن تبعهم أجمعين
كان الحافظ مشائخ مخلصين ... عاشق النبي ومعشوق السماوين
هو احمد الملقب بشاه ... صاحب المجد وخير السالكين
نور عنوانى بشونه ثم من ... فى بلادنا من أحب الأرضين
كان داعيا مخلصا ومرشدا ... كاملا بالعلم ومعرفة العاشقين
كان لايخاف الله لومة لائم ... لافى المجتمع ولا فى الحاكمين
تخضع له اعناق كل باغ ... حتى من هم سادات الظالمين
وكان مرغوبا فى القلوب ... حتى فى نسمات غير الناطقين
والبال وحيات ومن بغابة ... يزدلفن رحاله كالطايعين
وحبب اليه الخلاء دائما ... مع ربه ليكون من الفائزين
خدماته اثنات أسماء بقاع ... من علم وعرفان وميان للراغبين
التحق دورة لأحاديث صحاح ... لمن يرغب اليها مع المحدثين
بمدرسة صنوتى الحكيمية العالية ... ام المدارس فى البقاع للعارفين

◆ হযরত শাহ সাহেব (রহ.) চুনতী

وحفلة سيرة التاريخية لكون ... اسمها للخطابة الدعاة السماهرين
كما اسمها لتكون ذريعة نجاة ... فى الدارين وفلاحا للحاضرين
قامت هى بزمن من شاقة ... ضيفت الأرض بها للمؤمنين
تشغرق هى لتسعة عشر ... هى كأحرف البسملة للعاذبين
تبدأ من الحادى عشر للربيع ... غايتها بالتاسع والعشرين
فيها المواعظ والخطب عديدة ... مع الضيافة العامة للقادمين
ويكثر فيها الأطفال والصبيان ... هم عنادل الحدائق للناظرين
ونسوة فيها بالقوافل اتيات ... فى مثل ماللضيوف والشاركين
جزى الله كل خير وفضل ... على موسها ومن عليها ساعين
وشيخنا الحافظ فى جوار ربه ... بفردوس العلى مع الصالحين
زاده الله مجدا وشرفا ... باعلى عليين مع النبيين
ملاالله مرقده بنور ومسك ... ليكون طيبا للزائرين
ادام الله صدقاته باقية ... الى يوم يقوم للحاشرين
وسليم خاطى بكل عيب ... يتمنى حشره مع المنعمين

ابوصالح محمد سليم

Dhaka University Institutional Repository

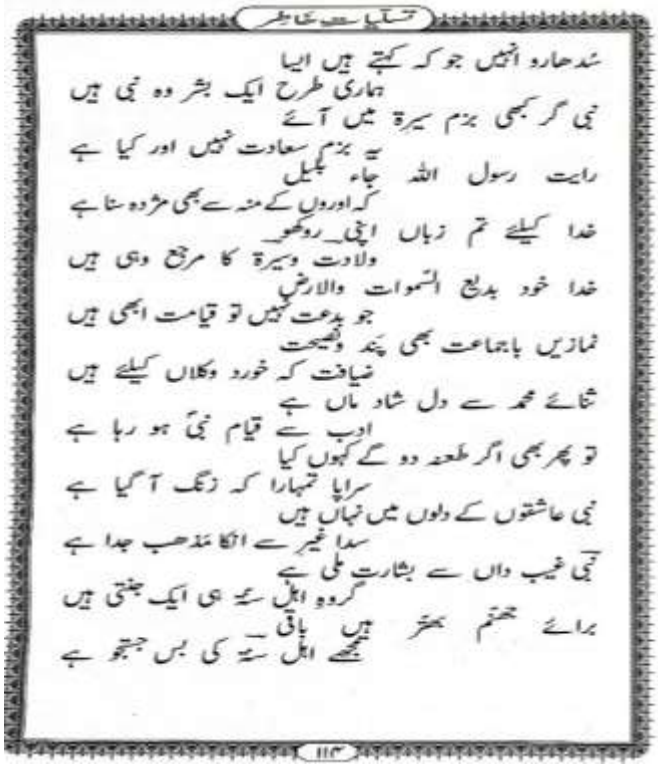
হযরত শাহ সাহেব (রঃ) এর শানে হযরত মাওলানা শফিক আহমদ (রঃ), সাবেক চেয়ারম্যান, আধুনগর ইউনিয়ন পরিষদ,লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম এর রচিত কসিদা



چشمۂ سعادت برائے اُمت شاہ صاحب و محفل سیرۃ چنوتی

ولی کی زباں جب خدا کی زباں ہے
جو نکلا زباں سے وہ رب کی رضا ہے
اگر کوئی بدظن ہو بد خواہ ولی کا
اسے خوار کرنیکو رب کی سزا ہے
نبی جن سے خوش ہیں وہ بیشک ولی ہیں
وہ بدکار ہے جسکو بغض ولی ہے
ولی کو نبی سے ہے مضبوط رشتہ
نبی پر فدا گر نہ ہو کب ولی ہے
گرامی قدر شاہ صاحب چنوتی
نمونہ سلمان وویس قرن ہیں
انہیں اپنا ہمسر نہ بھولے بھی سمجھو
رسول خدا پر ہمہ تن فدا ہیں
یہ سیرۃ کی محفل بھی وہ درس کامل
نبی سے اجازت لئے کر گئے ہیں
رہے تا قیامت کہ سیرۃ کا چرچا
وہ درس نبوت جوسب کو دیا ہے
تمہیں کیا ملی ہے پہر آپسیں خرابی
کہ فضلائے اُمت جہاں سرنگوں ہیں
مناؤ جہاں میں بھی یوم ولادت
کرے بزم سیرۃ کوئی کیا بھلا ہے
ولادت نہیں جب تو سیرۃ کہاں سے
جو سیرۃ نہیں تب مسلماں کہاں ہے

* وزاد احمد عن حدیث عائشۃ ولسانہ الذی یتکلم بہ۔ بخاری صہ ۹۶۳، ج۲



سدھارو انہیں جو کہ کہتے ہیں ایسا
ہماری طرح ایک بشر وہ نبی ہیں
نبی گر کبھی بزم سیرۃ میں آئے
یہ بزم سعادت نہیں اور کیا ہے
رایت رسول اللہ جاء یمیل
کہ اوروں کے منہ سے بھی مژدہ سنا ہے
خدا کیلئے تم زباں اپنی روکھو
ولادت وسیرۃ کا مرجع وہی ہیں
خدا خود بدیع السموات والارض
جو بدعت نہیں تو قیامت ابھی ہیں
نمازیں باجماعت بھی پند ونصیحت
ضیافت کہ خورد وکلاں کیلئے ہیں
ثنائے محمد سے دل شاد ماں ہے
ادب سے قیام نبیؐ ہو رہا ہے
تو پھر بھی اگر طعنہ دو کے کہوں کیا
سراپا تمہارا کہ زنگ آ گیا ہے
نبی عاشقوں کے دلوں میں نہاں ہیں
سدا غیر سے انکا مذہب جدا ہے
نبی غیب داں سے بشارت ملی ہے
گروہ اہل سنۃ ہی ایک جنتی ہیں
برائے جہنم بہتر ہیں باقی
مجھے اہل سنۃ کی بس جستجو ہے



سیرۃ کا نقشہ ولایت کا صدقہ

یاد آتا ہے مدینہ جشن سیرۃ دیکھ کر
شعلہ زن ہے فرقت یار نقش سیرۃ دیکھ کر
ذکر محبوب خدا سے ہر جگہ پُر نور ہے
ہر کس وناکس ہے شیدا بزم سیرۃ دیکھ کر
عرشی کا رتبہ ملا فرشی کو خاک پائے او
عرشی بھی منتا ہے فرشی یہ کرشمہ دیکھ کر
عاشقان مصطفےٰ کو جام کوثر ملگیا
ہوگیا سیراب پیاسا بزم نوری دیکھ کر
خادمان بزم سیرۃ کو تھکان آتا نہیں
مہمان مصطفےٰ کے خندہ چہرہ دیکھ کر
رات دن پند ونصیحت کا بڑا ایک دھوم ہے
ہیں ثناخواں جن وانسان یہ تماشا دیکھ کر
بے نمازی کو بھی ہوتا ہے بڑا شوق نماز
سرنگوں دربار حق ہیں یوں جماعت دیکھ کر
جسکو کعبہ کی جوالفت نے کبھی مارا نہیں
خود بخود بنتا ہے شیدا نقش مسجد دیکھ کر
جو ولی اللہ کے دربار میں آتا نہیں
ہوتی ہے شوق زیارت نقش گنبد دیکھ کر
پیر صاحباں گرامی قدر واعظان ہم
آتے ہیں مہمان بنکر قدر مہمان دیکھ کر
جانثاران نبی کے دلمیں آتا ہے خیال
جشن سیرۃ کا جلال ہر ربیع کو دیکھ کر
یہ شہنشاہ ولایت کا بڑا احسان ہے
کر گئے ایجاد سیرۃ کیف پستی دیکھ کر
بزم سیرۃ نے بڑھادی عالموں کی شان کو
تھا پریشاں شاہ صاحب انکی ذلت دیکھ کر
عاشق شاہ ولایت شیدا ہیں اس بزم کا
خاتم دوراں بنا یوسف کرامت دیکھ کر
بیمثال ایثار کرتے ہیں سدا اس جشن میں
مرد وزن ہوتا ہے حیراں ایسا عاشق دیکھ کر
محفل سیرۃ کے بانی سوتے ہیں گنبد تلے
ہو شفیق تجھکو تسلی شاہ منزل دیکھ کر

Dhaka University Institutional Repository

হযরত শাহ সাহেব (র:) চুনতী এর শানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক মুহাম্মদ ফরিদ উদ্দীন ফারুক এর রচিত কসিদা।

بمناسبۂ روز وفات شهنشاه ولایت، عاشق رسول رحمت، مؤسس محفل سیرت،
حضرت مولانا حافظ احمد شاه صاحب چنوتی قبله رحمه الله
شعر خودنویسی برجاء سعادت ازد. محمد فریدالدین فاروق

مراثی ناله شد تسبیح

نه بست بهمن سال زده خنجر بروح را ☆ ز هر بارش شده بر ما پر احزان کرد حیاتی را
مراثی ناله شد تسبیح عاشقان شاه چنوتی را ☆ بمثل کربلا یا بم که محفل شاه چنوتی را
ز دنیا رحلت او بود ترحل راحت جان دل ☆ غروب افتاب دنیا شد چه گویم هر کشیده را
چه می گویم چه می گویم گل وگلزار شده ویران ☆ عرش کرسی به نالیده چنان دیدم مدینه را
مدینه پر حزین بوده مدم شد همه جیلان ☆ کجا یا بم کجا یا بم دوم شخصی فرفته را
خدایا این مصیبت را چرا دادی رحم کرده ☆ نه بودم صابر و یعقوب ندیدم نوح و منصور را
بمردن در مدینه هست یکم ارزوی قلب او ☆ همه عمرش بسر کرده مدینه کرد قلب را
بدن پاک گرچه می گنجد در ارض خداوندی ☆ نمی قدرت ترا (عالم ارواح) داری که تو گنجی مدینه را
مدینه در مدینه رفت انتظام خوشنودی کرده ☆ ازین علت شنو مجمع بخوشی گفته اورا

گفته او بخوشنودی

روم امروز بخوش حالی بدر بار رفیق اعلی ☆ شوم مهمان خداوندی الان دیدم بهشت بارا
رضا یا بم بهشت یا بم تحیه کردگار یا بم ☆ رسول رحمتان یا بم نصیم لانهایه را
همه نعمت بهشتی را شدم یافته درین لمحه ☆ (خدا گفت) تحیه کن ایا عرشی شهنشاه چنوتی را
نشیمن او عرش خدا برای عشق رسول فدا ☆ ازین مانه کن جدا تا یا بم شفاعت را
فرید فاروق بسی کن تو مدح شاه شهنشاهان ☆ که این چند پر کند میزان که این کرد جنتی تو را

Dhaka University Institutional Repository

সারসংক্ষেপ (Abstract)

এম.ফিল অভিসন্দর্ভের শিরোনাম

"চট্টগ্রামে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে মাওলানা হাফেজ আহমদ (রঃ) এর অবদান"

(Contribution of Maulana Hafez Ahmad (R.) in spreading Arabic and Islamic Teachings in Chittagong)

চট্টগ্রাম অঞ্চল ঐতিহাসিকভাবে আরবী ও ইসলামী শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। এই অঞ্চলে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে যেসকল মনীষীর অবদান অনস্বীকার্য, তাঁদের মধ্যে মাওলানা হাফেজ আহমদ (রঃ) অন্যতম। তাঁর শিক্ষা, দাওয়াত ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম চট্টগ্রামের ইসলামী শিক্ষার ধারা সুসংহত ও গতিশীল করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই গবেষণায় মাওলানা হাফেজ আহমদ (রঃ) এর জীবন, শিক্ষা-দীক্ষা, চিন্তাধারা এবং 'আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে তাঁর বহুমুখী অবদান বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণায় তাঁর প্রতিষ্ঠিত ও সংশ্লিষ্ট মাদরাসা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ, পাঠক্রম উন্নয়নে ভূমিকা, দক্ষ 'আলেম ও হাফেয গঠনে অবদান এবং সমাজসংস্কারমূলক কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি সীরাতুন্নবী (স.), মে'রাজুন্নবী (স.) বিষয়ভিত্তিক মাহফিল প্রবর্তনসহ চট্টগ্রামের সামাজিক-ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে তাঁর শিক্ষাদর্শ ও কর্মপদ্ধতির প্রভাব বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাঁর অবদানকে ঐতিহাসিক ও শিক্ষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করা হয়েছে। এই গবেষণায় তথ্যসংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রাথমিক ও দ্বৈতীয়ক উভয় উৎস ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎস (Primary sources) হিসেবে মৌখিক সাক্ষাৎকার, অপ্রকাশিত তথ্যাদি ও প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ এবং দ্বৈতীয়ক উৎস (Secondary sources) হিসেবে দেশে-বিদেশে প্রকাশিত পুস্তকাদি অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং এতদসংক্রান্ত প্রবন্ধ, পত্র-পত্রিকা, প্রচারপত্র, অপ্রকাশিত প্রবন্ধ, ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাসহ যাবতীয় তথ্যাবলি সংশ্লিষ্ট গবেষণাকর্ম গ্রহণ করা হয়েছে। গবেষণার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয়েছে যে, মাওলানা হাফেজ আহমদ (রঃ) কেবল একজন শিক্ষাবিদই নন; বরং তিনি চট্টগ্রামে 'আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে আধ্যাত্মিকতাচর্চাসহ সার্বিক মানব সেবায় এক প্রভাবশালী পথিকৃৎ, যাঁর অবদান বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য দিকনির্দেশনামূলক। গবেষণাকর্মে শাহ সাহেব (রঃ) এর সার্বিক কর্মকাণ্ড বা অবদানকে নির্ভরযোগ্য তথ্যের মাধ্যমে উপস্থাপনের প্রচেষ্টা

Dhaka University Institutional Repository

চালানো হয়েছে এবং একটি ভূমিকা, পাঁচটি অধ্যায়, চব্বিশটি পরিচ্ছেদ, উপসংহার, গ্রন্থপঞ্জি ও পরিশিষ্টে বিন্যাস করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে চট্টগ্রাম ও চুনতীর ভৌগোলিক পরিচয় দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে চট্টগ্রামে আরবী ভাষা ও সাহিত্যচর্চা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা রাসূলের যুগ থেকে বর্তমান পর্যন্ত পরিচয়, 'আরবী ও ইসলামী শিক্ষার' পরিচয় ও গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে মাওলানা হাফেজ আহমদ (র:)-এর জীবন পরিক্রমা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে অধ্যাত্মিকতার পরিচয়, উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয়তা, উপকারিতা, চট্টগ্রামে ১৯ দিনব্যাপী সিরাতুন্নবী (সা) মাহফিল প্রবর্তনও শিরক বিদ'আতমুক্ত সমাজ গঠন, নৈতিক আন্দোলনে সমর্থন প্রদান ও বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ আউলিয়ায়ে কেরামের পরিচয় এবং শাহ সাহেবের অনুসৃত আধ্যাতিকতা বর্ণনা করা হয়েছে। উপসংহারে শাহ সাহেব (রা) ও তাঁর অবদান সর্ম্পকে সার্বিক মূল্যায়ন করা হয়েছে। সর্বশেষ গ্রন্থপঞ্জি ও শাহ সাহেব সর্ম্পকীত বিভিন্ন ছবি, কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি সম্বলিত পরিশিষ্ট উল্লেখ্য করে একটি তথ্য বহুল অভিসন্দর্ভ প্রণয়নে চেষ্টা করা হয়েছে।

(মুহাম্মদ বদরুদ্দীন সাদী)
এম.ফিল গবেষক
রেজি. : ১১/২০১৮-২০১৯
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৮-২০১৯
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।